স্বর্গগতা জননী শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হল

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত (১ম ও ২য়)
বাংলার সাধক (১ম—৫ম)
সাধিকা নির্মলা মা
পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনকূলচন্দ্র

হবে মাকে।'

তারপর দু'হাত জোড় করে ভগবতীর উদ্দেশে প্রণাম করে বৃদ্ধা বল্লেন,—'মা ভগবতী জগদম্বা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

বিপিনবিহারী হাসিমুখে বল্লেন, কেন শুধু শুধু উপচারের কথাই ভাবছো মা? দেখো আমি ভক্তি দিয়েই মাকে কেমন খুশি রাখি।'

এমনই এক দিব্যভাবের পরিবেশ ছিল খেওড়া গ্রামের বিপিনবিহারীর গৃহ। গৃহ নয় তো, গৃহমন্দির। সকলেই ছিলেন দিব্যভাবের ভাবুক।

দেবী প্রসন্ন হয়েছেন।

দৈবকৃপায় অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের কুটিরে এক অসামান্য কন্যার আগমন হবে এই আশা মা ও ছেলের মনে দৃঢ় হলো। দিনে দিনে গৃহবধূ মোক্ষদা-সুন্দরীর দৈহিক পরিবর্তন হতে লাগলো। গর্ভে আবির্ভাব হলো দ্বিতীয় সন্তানের। শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা, তবুও অস্বস্তি নেই। আরও যেন আনন্দবিহ্বলা হয়ে উঠলেন। নানা দেবদেবীর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। একদিন স্বপ্ন দেখলেন, মহামায়ার শান্ত জগদ্ধাত্রী মূর্তি, দ্বিভূজা মানবীর রূপে। যতই ভাবেন সেই মূর্তির কথা এক অনির্বচনীয় আনন্দে অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠে। নিরানন্দ গৃহ আবার আনন্দে ভরে উঠলো, এক নবীন শিশুর আগমন প্রতীক্ষায়।

এমন ভগবদ্‌ভাবের গৃহ না হলে কি এমন মেয়ে জন্মায়?

বৈশাখের শেষ রাত্রি।

আপনভোলা অনাসক্ত বিপিনবিহারী গুন্ গুন্ করে গাইছেন:

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।......

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। মেঘে ঢাকা তারার আলো। যেন পুঞ্জীভূত পাপ তাপ অনাচার অত্যাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর আকাশ। অকস্মাৎ যেন অদৃশ্য কোন হাত আকাশের এক স্পর্শ করে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল সেই অন্ধকার আবরণ। ফুটে উঠলো জ্যোতির্ময় এক আলোর ছটা। দূরীভূত হলো জগতের অন্ধকার। সেই আলোর ছটায় আলোকিত হয়ে উঠলো সমগ্র ধরণী [illegible] খেওড়া গ্রাম। স্বর্গ যেন নেমে এসে ধরা দিল ধরাকে। বলে, 'দেখ [illegible] আমি এসেছি।'

[illegible] আলোর ছটা নয়, সত্য সত্যই জ্যোতির্ময়ী—ফুটফুটে এক স্বর্গীয় শিশু অ[illegible]র্ণা হলেন খেওড়া গ্রামে, পৃথিবীর মাটিতে, মানবলোকে—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে। দেবশিশুর আগমনী দিকে দিকে প্রচারিত হল।

বাংলা ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ, ইং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে। এই নবজাত শিশুই হলেন ভবিষ্যতের শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। পরমাপ্রকৃতি আনন্দময়ী মা।

প্রকৃতির নিয়মে শিশু দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। মা আদর করে নাম রাখলেন নির্মলা—নির্মলাসুন্দরী। পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই আদরের ধন এই নির্মল শিশু। পল্লীবাসীরাও ভালবেসে নাম রাখলেন—বিমলা, কমলা, গজগঙ্গা, দাক্ষায়ণী, তীর্থবাসিনী। আরো কত নামে যে তারা ডাকতো তার হিসাব নেই। আনন্দময়ী এই শিশুকে কোলে পাবার জন্য প্রতিবেশীদের কতই যে আকুলতা! একবার পেলে বুকে করে ঐ শিশুকে নিয়ে কোন্ মুহূর্তে যে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় জননী তা জানতেও পারেন না। কি করবেন তিনি? লোকেরাও তো বোঝে না। কোলভরা প্রাণভরা ঐ শিশুর চাঁদমুখখানি অনুক্ষণ দেখতে না পেলে সংসারের কাজেও তো তাদের মন বসে না।

অনেকক্ষণ পর জননীকে দেখতে পেয়ে আম্মা-আম্মা বলে মোক্ষদাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জননীও বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। স্নেহময়ী জননীর বুকের মধ্যে ডুবে যায় শিশু। সুধাপানে মগ্ন হয়। মাতৃস্নেহসুধা পান করে তার মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে বাণীহীন তৃপ্তির এক সুস্পষ্ট ছবি। জননী তৃষিত নয়নে সন্তানের রূপমাধুরী পান করেন আর ভাবেন এমন সাগর ছেচাঁ মানিক কবে কোন্ মায়ের বুক আলো করেছে?

পিতৃদেব পিতামহী সকলেরই মনের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে আজ। অন্নপূর্ণা মা ঘরে এসেছে, সকল অভাব দূর হবে যে।

নির্লোভ অনাসক্ত ভগবৎপরায়ণ জীবনচর্যার ফলশ্রুতিরূপে বিপিনবিহারী ও মোক্ষদাসুন্দর পেয়েছিলেন ভগবৎমহিমায় সমুজ্জ্বল মহাশক্তিরূপিণী এই কন্যারত্নটিকে।

দুই

শৈশবেই শুরু হয় নানা লীলাখেলা। পড়াশুনার মধ্য দিয়ে নির্মলার অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। অনেক দিন পর স্কুলে এসেছে। সেদিন আবার স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন স্কুল ইন্সপেক্টর। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো তাঁর ফুটফুটে অপরূপা ছোট্ট মেয়ে নির্মলার প্রতি। একটি পদ্য মুখস্ত বলতে বলেন। নির্ভুল কবিতা আবৃত্তি করলো সে। শিশুর সুমিষ্ট কণ্ঠের ক্রটিহীন কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন স্কুল ইন্সপেক্টর। গর্বিত হলেন গুরুমহাশয়। গুরুমহাশয় হলেন বিপিনবিহারীর দূরসম্পর্কীয় এক মামা। আশ্চর্য হলেন পিতামাতা। এমন সোজা বোকা বুদ্ধিহীন মেয়েটার এমন মেধা কি করে সম্ভব হলো? পড়াশুনায় তেমন মনও ত নেই। নির্মলার সবই আপ্‌সে আপ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, তাঁরই ভাষায়:—"একটা তামাসা এই যে, এই শরীর পড়িত না, কিন্তু মাষ্টারমহাশয়ের কাছে পড়া দিবার সময় সব ঠিক ঠিক হইয়া যাইত। অপরের কাছে আবার তেমন পারিতাম না। আর একবার একটা কাণ্ড হইল। একবার বই খুলিয়া একটু দেখিয়াই একটা পদ্য মুখস্ত হইয়া গেল। কি করিয়া কি হইত কিছুই বলিতে পারি না। ইন্সপেক্টর আসিয়াছেন স্কুল দেখিতে। বই খুলিয়া দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই পদ্যটাই এই শরীরকে বলিতে বলিলেন। এই শরীর ফট ফট করিয়া তাহা বলিয়া ফেলিল। স্কুলে খুব কম গিয়াছি, কারণ স্কুল খুব দূরে ছিল। তাহার উপর ছোট ভাই বোনদের কিছু দিন ধরিয়া অসুখও চলিয়াছে। এই সব নানা কারণেই এ শরীরের স্কুলে যাওয়া প্রায় হয় না। একবার গুরুমহাশয় এই শরীরকে 'অ'—'আ' পড়াইয়া দিলেন, আর কি জানি, কেমন করিয়া যেন তাহাতেই লিখিয়া ফেলিলাম। সেই দিনই ক, খ পড়া দিলেন। পরদিন তাহাও লিখিয়া ফেলিলাম। এই ভাবেই সব কেমন করিয়া হইয়া যাইত।

তোমাদের কাছে কি বলিব! যেমন আসনমুদ্রাগুলি আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে, তেমনি পড়াগুলি কি নামতাগুলি সবই এইভাবে আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে। যিনি শিক্ষক তিনি স্কুলের নামের জন্য আমাদের কয়েকজন মেয়েকে ক, খ ক্লাশ হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই নিম্ন প্রাইমারী ক্লাশে তুলিয়া দিলেন। এই শরীর তো স্কুলে প্রায়ই যাইত না। অনেকদিন

পর স্কুলে গিয়া দেখি মেয়েরা অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষকটি আমাকে সকলের সমান রাখিবার জন্য, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেখানে পড়িতেছে, আমাকেও সেই পড়া দিয়া দিলেন। ভগার ইচ্ছা দেখ, পড়াগুলি ঠিক ঠিক যেন কিভাবে হইয়া যাইত।"

মোক্ষদাসুন্দরী মেসেকে রিডিং পড়বার জন্য বলে দিলেন, দেখ কমা-দাঁড়ি যেখানে আছে সেখানে গিয়ে থামতে হয়। মেয়েও মাতৃ-আদেশ ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে লাগলো। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন—"মার আদেশ তাই এই শরীর এক নিঃশ্বাসে পড়িতে থাকিত। যদি মধ্যস্থানে শ্বাস একটু পড়িয়া যাইত, আবার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিতাম। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া অতি কষ্টে শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়ির কাছে নিঃশ্বাস ফেলিতাম। মার যে আদেশ।"

*　　*　　*

প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে কীর্তনে এসেছে ছোট্ট মেয়ে নির্মলা। কীর্তন শুরু হতেই ঘুমে ঢুলু ঢুলু সে। যেন ভাব হয়েছে। মহাশিশুর মহাভাব। মোক্ষদাসুন্দরী বললেন—ওরে ও নির্মলা ঘুমাস কেন? কীর্তন শোন। চোখের পাতা ছুটি খুলে মৃদু মৃদু হাসে নির্মলা, কিন্তু আবার ঐ ভাব। শেষ পর্যন্ত থাকা চাই। কীর্তন শেষ না হলে উঠবে না সে। কীর্তন শোনা নয়, এ যেন দেবতার পায়ের নূপুরধ্বনি শোনা।

দেবদেবীর সঙ্গেও নির্মলার লীলাখেলা শৈশব থেকেই। ঠাকুরঘরে প্রতিদিনই ঠাকুরের সঙ্গে চলতো স্পর্শলীলা। ভাবাবেশে প্রতিদিনই সে বিগ্রহকে ছুঁয়ে দিত, এবং গুপ্তভাবে ঠাকুরঘরে নানা লীলাখেলা চলতো।

বৃদ্ধা আত্মীয়ার সাথে চান্‌লাতে পাগলা শিব দেখতে এসেছে নির্মলা। বৃদ্ধা হলেন বিপিনবিহারীর দিদিমা। সঙ্গে গ্রামের লোকও কয়েকজন আছেন। চান্‌লার শিব খুবই জাগ্রত। দূর দূরান্তর থেকে গ্রামের মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে এখানে ভোলানাথের কৃপালাভের আশায়। সর্বদাই লোকসমাগম হয়। সেদিনও খুব ভিড় ছিল। ছোট্ট মেয়ে নির্মলাকে মন্দিরের বাইরে বসিয়ে রেখে সকলে গেছে মন্দিরের শিবকে দেখতে। কিন্তু মন্দিরের শিব কোথায়? শিব মন্দিরে নেই, গেলেন কোথায়? আর আর যাবেনই বা কিভাবে? নানা প্রশ্ন জাগে পুণ্যার্থীদের মনে।

অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ সকলের দৃষ্টি পড়লো ফুটফুটে একটি মেয়ের প্রতি। তারই পাশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন মন্দিরের শিব ঠাকুর। মেয়েটি মৃদু

মৃদু হাসছে পাগলা শিবের পাগলামী দেখে। মন্দিরের প্রস্তরীভূত শিব নয়, এ যেন জটা-জুটশোভিত ধবল রজতগিরি সদৃশ প্রশান্ত মনোহর মূর্তি ধারণ করে স্বয়ং উমাপতি উমার সন্নিকটে বিরাজিত হয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। পরমুহূর্তেই মন্দিরের শিব মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন। বৃদ্ধা ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন নাতনীকে। দাঁতহীন মুখ দিয়ে তার নবনীকোমল গাল স্পর্শ করে আদর করতে লাগলেন। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। পুরোহিত বিহ্বল কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। পুণ্যার্থী জনতা অভিভূত হয়ে এই অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে লাগলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন—এ মেয়ে সামান্যা নয় গো। এ নিশ্চয়ই ভগবতীর অংশ। এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন কন্যার পিতামাতা।

পিতৃদেব বিপিনবিহারী সর্বদাই কীর্তনে মেতে থাকেন। দিবারাত্র হরিনাম শুনতে শুনতে শিশুর মনে এক প্রশ্ন জাগে। পিতাকে জিজ্ঞেস করে সে, আচ্ছা বাবা! হরিনাম করলে কি হয়? সরল শিশুর সরল প্রশ্নে খুসী হয়ে বিপিনবিহারী বললেন—

—নাম করলে যে হরিকে দেখা যায়, মা!

—হরি খুব বড় নাকি বাবা?

—হ্যাঁগো খুব বড়।

এবারে ছোট্ট মেয়ে সামনের মাঠটি দেখিয়ে বলে এই মাঠের মত বড়?

প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে বিপিনবিহারী বললেন—এর চেয়েও অনেক বড়। তুই তাঁকে ডাক্ না তবেই জানতে পারবি, দেখতে পাবি তিনি কত বড়।

পাঁচ বছরের শিশু পিতার কথাকে সত্য মনে করে ডাকতে থাকে হরিকে, আধো আধো ভাষায়। সহসা নীরব হয়ে যায় শিশু। হরিনামের তরঙ্গ তখন তার দেহ মন আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই অপরূপ হরিনামের ধ্বনি-সঙ্গীত মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মত তার অন্তরকে যেন স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত করে দেয়। ফুলের মতো হেসে ওঠে অন্তর। মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে সে আবার প্রবেশ করে তার স্বপ্নলোকে।

ভগবৎবিশ্বাসী পিতা সেদিন নির্মল শিশুর অন্তরে যে হরিনামের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তাই একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

হরিচিন্তায় বিভোর নির্মলা। বাবা বলেছেন, হরিকে ডাকলে, হরির কথা ভাবলে তিনি স্বশরীরে এসে দেখা দেন। দশ বৎসরের বালিকা নির্মলা হরিদর্শনের জন্য ব্যাকুল হল। চোখের জলে বুক ভাসালো। সর্বদাই উদাস অনাসক্ত ভাব। প্রেমোৎসুকা কৃষ্ণবিহ্বলা গোপীদের যে ভাব হোত সেই ভাব। মহাভাব। শ্রীমতীর ভাব—রাধারাণীর ভাব। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে থাকে সে। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। পিতামাতা নিদ্রামগ্ন। ঘুমিয়ে পড়েছে সব গ্রাম। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। দূর গ্রাম থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে কীর্তনের সুমধুর সুর। সুরধ্বনি নয়, সুমধুর সঙ্গীতের সুরও নয়। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর। বাঁশের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর। যে সুর শুনে একদিন কুলবধূ আঁচলে চোখ মুছতো। পথ চলতে চলতে পথিক পথও যেত ভুলে। কলসীর জল ফেলে কুলবধূ আবার যেত জল আনতে। সেই সুরের মর্মান্তিক করুণ বিলাপ শুনে মায়ের কোলে ছোট শিশুও চাইত না ঘুমাতে। সেই সুর আজ শুনতে পেয়েছে বালিকা মেয়ে নির্মলা। আত্মাভিমুখে জীবের মনোবৃত্তি আকর্ষণ করা যার স্বভাবধর্ম, তাঁরই নাম তো কৃষ্ণ। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আজ আকর্ষণ করেছেন নির্মলা-সুন্দরীকে। তাইতো তার চোখেও আজ ঘুম নেই।

এইভাবে গভীর রাত্রিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বালিকা নির্মলা ভাবস্থ হয়ে থাকে, যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হয়।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীমা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "এই সব ভাব ধরা বড় মুস্কিল। এই মহান ভাবের খেলা যাহার মধ্যে আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে কখনো কখনো লৌকিক ভাবের আভাস পাওয়া যায়। কারণ লৌকিক অলৌকিক যুগপৎ দুই ভাবের খেলাই যে তাহার মধ্যে হইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক গতিতে এমন সুন্দর এই যে হাত পা সমস্ত লইয়া যেন মহাপ্রকৃতি খেলা করিতেছেন। সামান্য একটু এই ইচ্ছা থাকিলেও মহানুভবের খেলা তাহার মধ্যে হইতে পারে না। এই মহান ভাবের খেলা যাহার মধ্যে হইয়া যায় তাহার মধ্যে যুগপৎ সব ভাব সব সময়েই খেলিয়া যাইতে পারে। তাহাদের শরীর পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত বটে, আবার সবই অতীন্দ্রিয়ের লীলা হইয়া যাইতেছে। অতীন্দ্রিয় না হইলে দুইটি ভাব যুগপৎ

এক আধারে প্রকাশ পাইতে পারে না।"

বাপ মায়ের কিন্তু অন্য রকম ধারণা। তাঁরা বলেন, 'এটা একেবারেই সোজা। কিছুই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। এর উপায় হবে কি? বুদ্ধিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করে তাঁরা বালিকা কন্যার নূতন নূতন নামও রেখেছেন টেলি, বেদিশা, আঠেলা ইত্যাদি।

বাপ মায়ের মন্তব্য শুনে মৃদু মৃদু হাসে নির্মলা। একদিন এক কলসী জল পুকুর থেকে নিয়ে কাঁকে করে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে মাকে বলে, "তোমরা যে আমাকে সোজা বলো, এই তো বাঁকা হয়েছি।" সকলেই হেসে ওঠেন বোকা মেয়ের বোকামি দেখে।

আবার একদিন মোক্ষদাসুন্দরী মেয়েকে একটি পাথরের বাটি পুকুর থেকে ধুয়ে আনতে বলে কটাক্ষ করে বললেন,' 'পারিস তো বাটিটা ভেঙে নিয়ে আসিস। নির্মলা মৃদু হেসে বাটিটি নিয়ে পুকুরের দিকে চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আশপাশের গাছগুলির সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হাত থেকে বাটিটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। তখন মায়ের কথা মনে পড়ল—'ভাঙ্গা বাটিটা নিয়ে আসিস'। ভাবানন্দময়ী নির্মলা মনের আনন্দে ভাঙ্গা বাটির টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে মায়ের সামনে উপস্থিত হল। বিস্মিত মোক্ষদা-সুন্দরী বললেন—'এ কি এনেছিস রে?'—কেন মা? তুমি যে ভাঙ্গা বাটি আনতে বলেছিলে, তাই এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। সরল বিশ্বাসের সঙ্গে বলল নির্মলা। মেয়ের কথা শুনে মোক্ষদাসুন্দরী রাগ করবেন কি, অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখলেন।

খেতে বসেও নির্মলা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অতি ধীরে ধীরে খায় সে। কখনও মুখে ভাত নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। মা ধাক্কা দিয়ে বলেন,—খাইতে বইস্যা খাওয়ার দিকে লক্ষ্য নাই উপর দিকে চাইয়া আছে, এমন ধীর বোকা মাইয়্যাটার কি উপায় হইবো! প্রত্যুত্তরে নির্মলা কিছুই বলে না, ধীর শান্তভাবেই থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়—"এই শরীর তখন দেখিত কত দেবদেবীর মূর্তি আসিতেছে যাইতেছে।"

মোক্ষদাসুন্দরী একদিন ডেকে বললেন, "ওরে, ও নির্মলা, ঠাকুর প্রণাম করে যা। প্রণাম করে বল্—ঠাকুর, তুমি আমার মঙ্গল করো।" ঠাকুরের সামনে এসে নির্মলার ভাবাবেশ হল। সব কিছুই গুপ্তভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বিহ্বলকণ্ঠে বলে উঠল—'ঠাকুর, তোমার যাতে আনন্দ হয় তাই করো।' বিস্ময়ে অভিভূত হলেন মোক্ষদাসুন্দরী।

সংসারের অচল অবস্থা। শুধু কীর্তনে তো আর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে না। দিনে দিনে সংসারের গতি নিম্নগামীই হতে লাগল। তারপর তিনটি সন্তানের অকালমৃত্যুতে মোক্ষদাসুন্দরী শোকমগ্না। কিন্তু একদিনও প্রতিবেশীরা মোক্ষদাসুন্দরীর বেদনাদগ্ধ প্রাণের কান্নার ধ্বনি শুনতে পায় নি। তিনি কোনও দিন সন্তানশোকে কান্না শুরু করলে তার দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করে নির্মলা কান্না জুড়ে দিত। তখন বাধ্য হয়েই মা মেয়েকে শান্ত করতে গিয়ে নিজের কান্না থামাতো। এইভাবে কিশোরী মেয়ে নির্মলা জননীকে পুত্রশোক থেকে ভুলিয়ে রেখেছিল। আনন্দের আধার আনন্দময়ী জননীর মনোজগতেও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল। বয়সে কিশোরী হয়েও তাকে পূর্ণজ্ঞানী বলেই মনে হয়।

১৫

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠল নির্মলাসুন্দরীর জীবনে। তেরো বছর পূর্ণ হয়ে চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করবে সে। এমন সময়ে তার জীবনে স্বামীরূপে এলেন ভোলানাথ। ১৩১৫ সালের ২৫শে মাঘ ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীজগদ্বন্ধু চক্রবর্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর তৃতীয় পুত্র শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে শুভ বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হল কিশোরী মেয়ে নির্মলার। 'ভোলানাথ' নামটি অবশ্য শ্রীশ্রীমায়েরই দেওয়া।

এমন যে ধার্মিক পরিবার, তাদেরও জমি বিক্রয় করে বিয়ে দিতে হয়েছিল। একবার এক সাধু মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মা স্বয়ং যে ঘরে এলেন সে ঘরেও এত কষ্ট!' প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে মা বললেন—'কষ্টই তো তাদের কাছে কষ্ট পেয়েছে।'

এবারে শুরু হল নির্মলাসুন্দরীর গার্হস্থ্য জীবনে কুলবধূর ভূমিকা। বিয়ের পর শ্বশুর মাত্র বছর দুই জীবিত ছিলেন। শাশুড়ী পূর্বেই পরলোক গমন করেন। অকস্মাৎ স্বামীও কর্মচ্যুত হলেন। সুতরাং নির্মলার বধূজীবনের শিক্ষানবীসী চলতে লাগলো ভাসুর রেবতীমোহনের অন্তঃপুরে। রেবতীমোহন তখন ঢাকা জগন্নাথগঞ্জ লাইনে শ্রীপুর নরুন্দী প্রভৃতি স্থানে স্টেশনমাস্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রেবতীমোহনের সংসারে ভ্রাতৃজায়ারূপে দীর্ঘ চার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্মলাসুন্দরী ভবিষ্যতের 'আনন্দময়ী

মা' রইলেন লুকিয়ে। স্টেশন সংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টারে। বধূত্বের অভিনয় হত সর্বাঙ্গসুন্দর। কুলবধূর পালনীয় সকল নিয়ম আচার পালন করতো সে মহানন্দে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশের জন্য নববধূ ঢলে পড়তো উনানের পাশেই। উনানে চড়ান ডাল তরকারী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সকলে মনে করলো ঘুম। বউ ভীষণ ঘুমায়। পরে মাঝে মাঝেই যখন এরূপ ভাবের আবেশ হতে লাগল তখন সকলে মনে করলেন এ একরকমের রোগ। ওষুধেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু রোগের আসল মূলটি যেখানে, ততদূর পর্যন্ত কোনরকম ওষুধের ক্রিয়াই পৌছল না। ফলে রোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। সাধারণ মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ল না। এ যে সামান্যা কুলবধূ নয়, ভগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণা হয়েছেন। এ যে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

তাইতো একা ঘরে স্বামী নবপরিণীতা বধূর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন, তিনি অলৌকিকভাবে যোগাসনে বসে আছেন। যখনই নববধূর কাছে আসবার চেষ্টা করতেন তখনই বোধ করতেন কি একটা অস্পষ্ট অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যেন উভয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মত রয়েছে দণ্ডায়মান।

ভোলানাথের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের আচরণ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মা বলেছেন, "ভোলানাথের পারিবারিক জীবনে এই শরীরের প্রতি তাহার কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহা লইয়াও অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকে। বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া ভিতরের ভাব ধরা বড় শক্ত। তোমাদিগকে একদিনের ঘটনা বলিতেছি। একদিন কুশারী মহাশয়ের (ভোলানাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি) বাড়ীতে, কুশারী মহাশয়, ভোলানাথ এবং এই শরীরটা বসিয়া গল্প করিতেছে। এমন সময় এই শরীর ভোলানাথকে বলিল, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শুই। এই বলিয়া ভোলানাথের কোলে শুইতে গেলে, ভোলানাথ ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া দুই হাত দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু এই শরীর যেখানে শুইবে বলিয়াছিল সেইখানেই মাটির উপর শুইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া কুশারী মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ভোলানাথকে ঐরূপ ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোলানাথ বলিল, বিবাহের পর হইতে সমস্ত জীবনই এইরূপ চলিতেছে। আপনারা দেখিতেছেন এ আমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে আমার সেরূপ হয় নাই। আমি দেবীজ্ঞানেই ইহাকে দেখিয়া আসিতেছি এবং সেইরূপ ব্যবহার করিতেছি।"

দিন সপ্তাহ মাস, বছরের পর বছর চলে যায়। আবার আসে নতুন বছর, নূতন দিন। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল, তা যেন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে ওঠবার জন্য সচেষ্ট হয়। ক্রমশঃ চেতনার সুগভীর গহ্বর, হতে স্পষ্ট মূর্তি সব জেগে উঠতে থাকে। নির্মলা এখন ১৭ বছরের যুবতী, রূপবতী কুলবধূ। হঠাৎ ভাশুর মারা গেলেন, তাই চলে এলেন স্বামীর কর্মস্থল অষ্টগ্রামে (ইং ১৯১২ সালে)। নিজের সংসারে আবদ্ধ হতে নয়, এ যেন বিশ্বজননী এলেন বিশ্ববাসীর ঘরে। এই অষ্টগ্রামেই প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের ভাবসমাধি হয় লোকসম্মুখে।

কীর্তনে এসেছে নির্মলা। গগন রায়ের কীর্তন। নাম গান— কৃষ্ণকীর্তন। দূর গ্রামের মানুষেরাও এসেছে। কীর্তন শুরু হল।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।……

যোগীর মত চক্ষু মুদ্রিত করে কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন করে ভাবানন্দে বিভোর হল নির্মলা। তার মন যেন সেই অগাধ অনন্ত প্রশান্ত শ্যামসাগরের বিশাল বক্ষে পড়ে আত্মহারা হয়ে রইল। কুলবধূ নির্মলার ভাবসমাধি হল। অপরূপা মূর্তি ধারণ করে ভক্তজনতার হৃদয় ও মনকে আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত করে তুললেন। সে তো আর সাধারণ মানবীর রূপ নয়—দেবী রূপ। শ্রীরাধারাণীর রূপ ধারণ করল। শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ হেলায়িত করে চিন্ময় লাবণ্যলহরী আনন্দময়ী মা জগরাধ্যা রাধারাণী বুঝি শ্রীঅঙ্গের স্বপ্রকাশ সৌদামিনীছটায় ভক্তভুবনের অন্তরান্ধকার হরণ করলেন।

অষ্টগ্রামের ধনী মানুষ ক্ষেত্রবাবু ভাববিহ্বলা নির্মলার সেই অপ্রাকৃত রূপ নয়নগোচর করে 'দেবী' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। অষ্টগ্রামের মানুষেরাও নির্মলার ভাববিহ্বলা দেবীরূপ দেখে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হল। দিকে দিকে প্রচারিত হল কুলবধূ নির্মলার ভাবসমাধির কথা।

বিশ্বের জননী যিনি, তাঁকে অখ্যাত কুটিরের [illegible] কি লুকিয়ে রাখা যায়?

* *
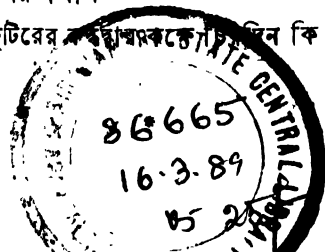
কীর্তন শুনলেই শ্রীশ্রীমা'র শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হতো। অষ্টগ্রামে মা'র গৃহে তুলসীতলায় একবার গগন রায়ের কীর্তনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কীর্তন শুনে মায়ের ভাবের আবেশ হয়। ভাবাবেশ হওয়ার জন্ম এক সমস্যার সৃষ্টি হয় এই ঘটনার কথা মা নিজেই বলেছেন: "গগন কীর্তনীয়া নামে একজন ভাল কীর্তনীয়া কীর্তন করিতে আসেন। তাহাদের জন্ম নানা রকম রান্না করিয়া রাখা হইল। কীর্তন আরম্ভ হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, কীর্তনের মধ্যে দুইটি অল্পবয়স্ক বালক নৃত্য করিতেছে। মজাও এমন, এই শরীরও একটি শিশু সাজিয়া শিশুর মত চঞ্চল ব্যবহার করিতে লাগিল। একবার ছুটিয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিতেছে যে খাবার জিনিস ঠিক আছে কিনা, আবার কীর্তনস্থানে আসিতেছে। এইরূপে এই শরীরের ছুটাছুটি চলিতেছে। যদিও এই ছুটাছুটির উদ্দেশ্য খাবার জিনিষ রক্ষা করা, কিন্তু উহা ঠিক ভালভাবে রক্ষা হইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য নাই। বসিবার জন্ম কীর্তনস্থানে একটি চৌকী পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একবার ঐ চৌকীতে বসা, আবার রান্নাঘরের দিকে ছোট শিশুর মতো ছুটিয়া যাওয়া। এইরূপ করিতে করিতে কখন যে চৌকির উপর দেহটা এলাইয়া পড়িল সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। এদিকে যখন কীর্তন শেষ হইল, তখন কীর্তনীয়াদিগকে খাওয়াইতে গিয়া দেখা গেল যে রান্নাঘরে কুকুর ঢুকিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভোলানাথের খুব রাগ হইল। সে তখন এই শরীরের খোঁজ করিয়া দেখে যে এই শরীর বেঁহুশভাবে পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া যখন দেখিল যে এই শরীর একেবারেই জ্ঞানশূন্য, তখন সে কাহাকে গালাগালি দিবে? এদিকে পাশের বাড়ীতে যাহারা ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি খিচুড়ী রান্না করিয়া কীর্তনীয়াদিগকে খাওইয়া দিল।

এই শরীর কিন্তু সারারাত্রি বেঁহুশভাবে পড়িয়া রইল। পরের দিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না, তখন ভোলানাথ ঐ কীর্তনীয়াদের ডাকিয়া আবার গান স্থরু করিতে বলিল। গান প্রায় বেলা ৩টা পর্যন্ত চলিলে এ শরীরের হুঁশ হইল। এই সময় হইতেই এই শরীরের এই ভাবকে লোকে 'হিষ্টিরিয়া' বলিতে লাগিল।'

অষ্টগ্রামের লীলাপ্রসঙ্গে মা বলছেন: "প্রকৃতভাবে নাম আরম্ভ হইল, যখন ভোলানাথ বিবাহের পর এই শরীরকে লইয়া অষ্টগ্রাম গেল। ছোটবেলায় তুলসীগাছের যত্ন করিতে শেখা হইয়াছিল। এই শরীরের মাই তাহা শিখাইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিয়াও একটি তুলসীমঞ্চ করা হইল। সেখানে

ফুল বাতি দিয়া এমন করিয়া রাখা হইত যে লোকে ঐখানে আসিয়া ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিত। এই তুলসীমঞ্চ দেখিয়াই এখানে কীর্তনের বন্দোবস্ত হয়। অন্য জায়গা হইতে কীর্তনের দল বাতি ও খোল করতাল লইয়া রাত্রি-বেলায় গান করিতে আসিত এবং আসিয়াই ঐ তুলসীতলায় কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিত।……যখন কীর্তন আরম্ভ হয় তখন এই শরীর এক রোগিণীর সেবায় ছিল। কিন্তু ঐ কীর্তন শুনিতে শুনিতে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেল। তখন আর লজ্জা সরমের প্রশ্নই নাই। ইহার পূর্বে এই শরীর লম্বা ঘোমটা দিয়া খুব সাবধানের সহিত চলিত। এই শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে ইহার ফিট হইয়াছে। তাহারা এই শরীরকে উঠাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।" এই ঘটনার পর থেকেই শ্রীশ্রীমা নিয়মিত ভাবে 'নাম' করতে আরম্ভ করেন।

এই প্রসঙ্গে মা আবার বলছেন : 'কীর্তনে এই ভাব হওয়ার পর হইতেই নিয়মমতো হরিনাম চলিতে লাগিল। ইহার পূর্বে যে নাম করা হইত তাহা মাঝে মাঝে হইত। প্রত্যহ নিয়মমতো করা হইত না।'

* * *

হরকুমার রায় হলেন অষ্টগ্রামের শ্রীজয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের শ্যালক। প্রবল প্রাণের মানুষ। ভগবৎভাবে উন্মাদ। সদানন্দময় হরকুমার ভাল কীর্তন গায়। নির্মলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তুলসীতলাটি দেখে হরকুমারই সর্ব-প্রথম কীর্তনের বন্দোবস্ত করে। ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে হরকুমার গেয়ে উঠে,

—না জানি কতেক মধু
শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।……

এই পাগল হরকুমারই প্রথম নির্মলার সুপ্ত মাতৃভাবকে তুলেছিল জাগিয়ে। 'মা' ডাকের মাধুর্য প্রথম উপলব্ধি করেছিল নির্মলা হরকুমারের 'মা' ডাকের মধ্য দিয়ে।

হরকুমারের সন্তানভাব। বাৎসল্যরস। সর্বদাই নির্মলাকে আকুল হয়ে 'মা' বলে ডাকে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 'মা' বলে গড় হয়ে প্রণাম করে। হরকুমার 'মা' বলে নির্মলার যত কাছে আসে লজ্জায় নির্মলা ততটা দূরে সরে যায়। কিন্তু হরকুমারও নাছোড়বান্দা। এ যেন মাতৃহারা শিশু আবার ফিরে পেয়েছে তার মা'কে।

মাঝে মাঝে নির্মলার আহারের সময়ও এসে উপস্থিত হয়। প্রসাদ পাবে বলে! প্রসাদ না নিয়ে সে মায়ের কাছটি থেকে উঠবে না। পাগল ছেলের পাল্লায় পড়েছে নির্মলা। লজ্জায় মাথার ঘোমটা আরও দেয় টেনে। গলা পর্যন্ত। এক গলা ঘোমটা দিয়ে খেতে বসে। কিন্তু খাওয়া আর হয় না। অবশেষে ভোলানাথই আদেশ করেন নির্মলাকে,—'ওর যখন এতটা আগ্রহ, তুমি একটু কিছু খাবার দিলেই পারো।'

এবারে যেন মায়ের স্নেহধারা বর্ষিত হলো সন্তানের উপর। নির্মলা মা প্রসাদ দেয় হরকুমারকে। হরকুমারও প্রসাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে ওঠে। আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'তোকে কেউ চিনলো না। তুই যে জগতের মা। একদিন সারা জগতের লোক তোকে 'মা' বলে ডাকবে। দেখবি।'

৪

তখন ইংরাজী ১৯১৭ সন। ভোলানাথের কর্মস্থান হলো বাজিতপুর। সেটেলমেণ্ট বিভাগে চাকুরী নিয়ে এলেন। পরে নবাব ষ্টেটে চাকুরী গ্রহণ করে এখানেই বসবাস করতে থাকেন।

নির্মলা এখন দিবানিশি মধুর নামের নেশায় বিভোর। মন প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয় গহন অন্তর্লোকের অবচেতন সত্তা নিবিড় নামানন্দে নিবিষ্ট। আত্ম-সমাহিত। কোথাও কৃষ্ণগুণগান হলেই হলো। শুনতে শুনতে নির্মলা গোপাঙ্গনাদের মত আনন্দ-বিহ্বল হয়ে যায়। কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ আকুল হয়।

শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বসু'র বাড়ীতে নামগান হবে। নির্মলা ভূদেববাবু'র স্ত্রী মৃণালিনীদেবীর খুবই প্রিয়। বাড়ীতে ছেলে মেয়েরাও নির্মলা ভিন্ন জানে না। নির্মলাও ওদের খুবই স্নেহ করে। ছোট মেয়ে সুজাতা অসুস্থ। তাই এই নামকীর্তনের আয়োজন হয়েছে। অসুস্থ মেয়ের বিছানায় বসে আছে নির্মলা। বাড়ীভরা লোকজন। কীর্তন শুরু হলো।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

কৃষ্ণ নামে মুখরিত চতুর্দিক। কৃষ্ণনামধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে

নির্মলার অন্তর। সেই সুমধুর নামধ্বনি তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভাবের আবেশ হয়। শরীরের অবস্থা হলো অস্বাভাবিক। হঠাৎ বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো সে। ছুটে এলো সকলে। সকলেই অভিভূত হলো নির্মলার অপ্রাকৃত দেবীমূর্তি নয়নগোচর করে। এ কি রূপ। এমন রূপ ত ভগবতীরই কল্পনা করা হয়। বলাবলি করে সকলে। আত্মা-নুভূতির শুভ্র আলোকচ্ছটায় তখন তার মানবী রূপ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হয়েছিল রূপান্তরিত। চিন্তিত হলেন ভোলানাথ এবং বাড়ীর সকলেই। কিন্তু কীর্তন বন্ধ করা হলো না। সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত নামধ্বনিই ধীরে ধীরে নির্মলাকে সুস্থ করে তুললো। সূক্ষ্ম বোধভূমি থেকে আবার স্থূলে এলেন। পরমাত্মা থেকে আত্মাতে। পরমব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মশক্তিতে। জীবজগতের লীলাভূমিতে। ধীরে ধীরে উন্মীলিত হলো চোখের পাতা দুটি। আশ্বস্ত হলেন সকলে।

কিন্তু এই ঘটনার কথা প্রচারিত হলো সমস্ত বাজিতপুরে। সাধারণ মানুষেরা নির্মলার এই অবস্থাকে বুঝতে পারলো না। ভূত প্রেত বা ক্ষুদ্র অশুভ দেবতার আবেশ বলে প্রচার করলো। প্রতিবেশিনীরা নির্মলার সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে দিল। ভয়ে, অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

পরবর্তী জীবনে মা বলেছিলেন :

"বাজিতপুরের এই অবস্থা হওয়ার পূর্বে এই শরীরটাকে প্রত্যেকেই খুব ভালবাসিত। সর্বদাই এই শরীরটার কাছে আসিত। কিন্তু এই অবস্থা আরম্ভ হইলে এই শরীরকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া সকলে নিকটে আসা বন্ধ করিল। ভালই হইল। একান্ত পাইয়া আপন মনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম। সবই যেন ঠিক ঠিক মত হইয়া গিয়াছে।"

ভাবোন্মাদনা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। বিপন্ন ভোলানাথ বাধ্য হয়ে দুই একজন ওঝাকে ডেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হলো। ওঝারাই মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখে, ভয় পেয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো।

তখন আবার ভোলানাথই মার কাছে প্রার্থনা জানালেন। 'ওগো যাতে এরা সুস্থ হয় তাই করো।' অবশেষে নির্মলার প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওরা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যায়।

সংবাদ পৌছালো নির্মলার পিত্রালয়ে বিত্তাকুটে। বিপিনবিহারী এতদিনে আবার ফিরে এসেছেন স্বগ্রামে। মোক্ষদাসুন্দরী বিচলিত হলেন। কোলে

তাঁর ছেলে মাখন, নির্মলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিপিনবিহারী বোঝালেন স্ত্রীকে, এসব সাধারণ মানুষের বুঝবার জিনিষ নয়। আমি আজই নামগানের ব্যবস্থা করছি, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন :

"ভোলানাথ এ শরীরের পিতামাতার নিকট চিঠি লিখিল। এই শরীরের মা কিন্তু দেখা করিতে আসিল না। সে ভাবিল, এই ভাব যদি ধর্মপথের সহায়ক হইয়া থাকে, তবে সে গিয়া ইহাতে বাধা দিয়া কি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিবে না? এই সব চিন্তা করিয়াই সে রোগের কথা শুনিয়াও এই শরীরকে দেখিতে আসিল না।"

সে সময় শ্রীশ্রীমায়ের শরীরকে আশ্রয় করে যে সব খেলা চলতো সেই সম্বন্ধে মা বলছেন :

"যে সব অবস্থা শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত তাহা বলা যায় না। কখনও বসিয়া আছি, চোখ দুইটি এমন হইয়া উঠিল যে লোকে দেখিলে ভয় পায়! মুখের ভাব সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন অন্য একরকম হইয়া গেল। হাতও নানাভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। কনুইটা এই স্থানে, মাথাটা এইভাবে থাকিবে, এইরকম ভিতর হইতেই আসিতেছে। আর শরীরও সেই রকম হইয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে এমন হয় কেন? ইহার কারণ হলো তোমরা ষট্‌চক্র ভেদ, মুদ্রা কত কি বল না। কিন্তু এই শরীর বলে, শরীরেই অনেক গ্রন্থি আছে। এই রকম ক্রিয়াদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক স্থানে গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেছে। তোমরা বলো চক্ষু দিয়া ত্রাটক করে। এই শরীর বলে, সর্ব শরীর দিয়াও এইভাবে ত্রাটকের ক্রিয়া হইয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায়, নানা অঙ্গ সংস্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে-সঙ্গেই শ্বাসের ক্রিয়াও সেইভাবেই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। সে এক চমৎকার অবস্থা। সবই আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। হঠযোগ রাজযোগ আরও কি সব তোমরা বলো না, সে সবই এই শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যে আছে ততক্ষণ স্তর বা সিঁড়িও আছে।"

এই সব ক্রিয়ার ক্রম সম্বন্ধে মা সহজ করে বলছেন :

"এর পরের অবস্থা কি রকম জানো? তোমরা লিফ্‌ট না কি বলো, তাইতে উপরে ওঠো। যেমন লিফ্‌টে উঠিয়া তুমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ। দেখিলে লিফ্‌ট উপরে উঠিয়া যাইতেছে। তখন তোমার আর কোনও ক্রিয়া নাই। উপর নীচ সব তখন তোমার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে। দরকার

মতোই স্বভাবতঃ যাতায়াত হয়, সেজন্য তোমার আর চেষ্টা করিতে হয় না। অথবা উপর নীচই তোমার কাছে আর থাকে না, ইহাও বলিতে পারো।

বেশ দেখিতাম ক্রিয়াগুলি আরম্ভ হইল, এক একটি করিয়া হইয়া গেল। আবার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'ব্যস এখন যাই'—ক্রিয়াও বন্ধ হইল। যেন ক্রিয়াগুলিই 'এখন যাই' বলিয়া ক্রিয়া বন্ধ করিয়া শরীরকে আবার সাংসারিক কাজে নিযুক্ত করিয়া দিল। অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য এই জাতীয় ক্রিয়া বন্ধ আর কি। এমন সুন্দর প্রকাশ।

সাধকের কি হয় জানো? যেন এক একটা অবস্থা হইয়া যাইতেছে। আবার নূতন একটা অবস্থা আসিতেছে। এইভাবে তাহাদের ক্রমোন্নতি হয়। কিন্তু এই শরীরটায় অন্য রকম। তাই ওলটপালট দেখা যায়। এসব ধারার কিছু ঠিক থাকে না। একবার হয়তো তোমাদের দৃষ্টিতে একটা উচ্চস্তরের ক্রিয়া শরীরের মধ্যে খেলিয়া গেল, আবার হয়তো একটা সাধারণ ভাবেই শরীরের মধ্যে খেলিতেছে। উপর নীচ বলিয়া তো এ শরীরে কিছু নাই। তোমাদের যখন যাহা দরকার তাহা এই শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া যাইতেছে।"

বাজিতপুরে আর একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। বাজিতপুরের তৎকালীন সাব-রেজিস্ট্রারের মায়ের গুরুদেব ছিলেন একজন শক্তির উপাসক। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের তখনকার অবস্থা সব কিছু শুনে বলেছিলেন, ইচ্ছা করলে তিনি শ্রীশ্রীমাকে ভগবৎ সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন। তিনি স্বয়ং বগলাসিদ্ধ। অবশেষে সেই গুরুদেবের ইচ্ছানুসারেই ভোলনাথ একদিন তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এলেন।

সেই ঘটনার কথা মা বর্ণনা করছেন। মায়েরই ভাষায়:

"তিনি কথা বলিতে বলিতে বলিলেন যে তাঁহার বগলাসিদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে এই শরীর অতি তেজের সহিত বলিল, কি বগলাসিদ্ধি হইয়াছে? এবং কখন ইনি কি কি কাজ করিতে গিয়া বিফল হইয়াছেন তাহা একটির পর একটি করিয়া জোরে জোরে এই মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সেই গুরুদেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভোলানাথও এই শরীরকে চুপ করিতে বলিল। কিন্তু এই দেহ হইতে যা প্রকাশ হইবার তাহা তো হইবেই। জোর করিয়া তো এ শরীর কিছু করেও না, বলেও না। অবশেষে সেই গুরুদেবই এই শরীরের কাছে বলিতে বাধ্য হইলেন, ওঁর বগলাসিদ্ধি হয় নাই। এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে তাহা এই

শরীরের কাছে জানিতে চাহিলেন। আবার মজাও এমন তাঁহার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই এই শরীর হইতে বগলাসিদ্ধি লাভের মন্ত্র ও পূজার বিধি সবই বলা হইয়া গেল।"

—ভাল করে একবার দেখুন তো ?

কালীকচ্ছের ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর কাছে নির্মলাকে নিয়ে এসেছেন ভোলানাথ।

'এ কি উন্মাদ, না স্নায়ুবিকার ? রাতে একফোঁটা ঘুম নেই। কখনও ঘরের মেঝেতে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনও আবার উপুড় হয়ে প্রণামের ভাবে থাকে আর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ওঁ ওঁ শব্দ। এইভাবে চলেছে দিনের পর দিন। লোকের কথায় তো অনেক কিছুই করলাম, কিন্তু কিছুই হলো না। এখন একবার আপনি দেখুন।'

মহেন্দ্র নন্দী দেখলেন। ডাক্তারের চোখ দিয়ে খুব ভাল করেই দেখলেন নির্মলাকে। দিব্যদ্রষ্টা ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী বুঝলেন রোগের মূল কোথায়। তারপর ভোলানাথকে বললেন—এ সব ব্যারাম নয়, সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা। যাকে তাকে দেখাবেন না। এরপর ভোলানাথ আর কাউকে দেখাতেন না।

স্বভাবশরণগতং প্রণবজাসনং
ভবানীভবং ভবভয়নাশনং হে,
হরশরণাগতং··· · তায়ং
বিভাবতঃ মমায়নং হে।
মন্তারণং তত্র দ্বংরূপং ময়া হি সবাণি স্বরূপময়ানি
ময়া হি সর্বঃ ময়া হি সর্বশরণং হে।
দাস নিত্যং····· প্রণবশ্রুতকারণং
মহামায়া মহাভাবময়ময় হে।
মম ভো ভক্তো তরণং মা
মম সর্বময়ং হে॥

সমুদ্রের তরঙ্গপ্রবাহের মত ছন্দায়িত দেবভাষায় অপরূপ মধুরতার সঙ্গে

কুলবধূ নির্মলার কণ্ঠ হতে অনর্গল নিঃসৃত হতে থাকে সূক্তসকল। তখন মনে হয় যেন মহাব্যোম হতে নানা রাগ-রাগিণীর অপূর্ব ঝঙ্কার নিয়ে সত্যের স্বরূপ বাণীরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করছে। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এমন সাবলীল ছন্দের প্রাণস্পর্শী প্রবাহ, তাঁর মুখের এমন নির্মল পাবন জ্যোতিঃ তপস্বীরা শত চেষ্টাতেও তপস্যায় আয়ত্ত করতে পারেন কিনা সন্দেহ জাগে। আবার কোন কোন দিন সূক্তাদি প্রকাশের সঙ্গে তাঁর অবিরল অশ্রুধারা, অপরূপ উজ্জ্বল হাস্যের দীপ্তি তাঁর করুণাময়ী মূর্তিকে স্বর্গীয় বিভূতি দ্বারা প্রদীপ্ত ও মধুর করে তোলে। এই সব বাণী প্রকাশের পর কখনো কখনো অনেকক্ষণ মৌনী থেকে তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থা হন। আবার কখনও নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে পড়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

তখন ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দ। বাজিতপুরেই অবস্থান করছেন। এই সময়েই ঝুলন পূর্ণিমার দিন, বাংলা ১৩২৯ সালে অলৌকিকভাবে নির্মলার দীক্ষা হয়ে গেল। ঠিক লোকাচার অনুযায়ী নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দৈবী প্রভাবের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে বাকশক্তিও রহিত হলো। মৌন হয়ে গেলেন। এক অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এ পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। কিসের এই দীক্ষা, কেন এই দীক্ষা? কেমন এই দীক্ষা? এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর নেই। তবে বাইরের দিক থেকে দেখা গেল নির্মলার আহার আচার আচরণে আমূল পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব নির্মলার দেহের মধ্য দিয়ে যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। যে কোন কথা যে কোন ভাবে তাঁর কাছে বলা আর সম্ভব হয়ে উঠতো না। রমণীমোহন চক্রবর্তীর কুলবধূ নির্মলা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে উঠতে লাগলেন সচ্চিদানন্দময়ী রূপে। সর্বময়ী নির্মলা মা রূপে। বিশ্বজননী যেন নির্মলার জীবদেহের মধ্য দিয়ে তাঁর মাতৃমহিমা প্রকাশের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষ তখনও মাতৃমহিমা বুঝতে সক্ষম হলো না। নির্মলা মার জীবনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে মায়েরই বয়োজ্যষ্ঠ মামাতো ভাই নিশিকান্ত ভট্টাচার্য ভোলানাথকে একদিন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এ সব কি হচ্ছে? তুমি কিছু বলতে পারো না? দীক্ষাদি হলো না, কিছু না।'

এই কথা শুনে অকস্মাৎ মায়ের ভাবের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়ে গেল। মা বলে উঠলেন—'কি বলবে রে? কি বলবে?'

নিশিবাবু শ্রীমায়ের ঐ ভয়ঙ্কর দিব্যরূপ দর্শন করে ভয়ে কয়েক হাত

পিছিয়ে গেলেন। ভুলে গেলেন নির্মলা তার ছোট বোন। সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কে?'

স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হলো—'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ!'

ভোলানাথও জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কে?'

মাতৃবাণী স্ফুরিত হলো—'মহাদেবী।'

অকস্মাৎ জানকীবাবু সেখানে এসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

স্বতঃস্ফূর্তভাবে তখনও মায়ের কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হলো –'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।'

এই প্রসঙ্গে মা বলছেন: "আত্মীয়দের স্ত্রীভাব, ভগিনীভাব, তাই তাঁহাদের নিকট স্ত্রীলিঙ্গ বাহির হইয়াছে। তাঁহাদেরই ভাব অনুযায়ী। বাস্তবিক কিন্তু 'নারায়ণ' শব্দই ঠিকভাবে বাহির হইয়াছিল। আর 'মহাদেবী' শব্দটা বাহির হওয়ার কারণ, যখনই কোন দেবী বা দেবতার পূজা হয়, পূজক তখন তদভাবাপন্ন হইয়া যায়। এ শরীর তখন মহাদেবীর পূজা করিতেছিল। তাই ঐরূপ শব্দ বাহির হইয়াছে। পূজা অর্থ বাহ্যিক পূজা নয়। দীক্ষার পর হইতে সেই ভাবের কতকগুলি ক্রিয়া হইয়া যাইত।"

দীক্ষার কথা বলতে গিয়ে মা আবার বলছেন:

"এই শরীরের দীক্ষা হয় ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলনযাত্রা দেখিতে ঐদিন খাওয়া দাওয়া সারিয়া অনেকেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথেরও খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শরীর যেভাবে ঘরের মেঝে লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়া আছে, উহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন, দীক্ষা লইতে যেরূপ যজ্ঞ পূজা করিতে হয় তাহা আপনা আপনিই এই শরীর হইতে হইয়া গেল। যজ্ঞস্থলী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ারী। ফুল ফল জল সবকিছুই প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান। যদিও ইহা কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু উহা যে সবই সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দীক্ষামন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থলীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং দীক্ষা-মন্ত্রের উপর পূজা ও আহুতি হইল। এইভাবে বিধিপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তাহার পর কর ঘুরাইয়া যখন দীক্ষামন্ত্র জপ আরম্ভ হইল তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে এই শরীর জপ করিতেছে। এ শরীর তো কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ

উহা এই শরীরকে দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনা আপনি কর ঘুরাইয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি সব ওলট পালট হইয়া যাইতেছে। পরে দেহের আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনা আপনি জপ হইয়া যাইত। এই ভাবেই এই শরীরের দীক্ষা হইয়া গেল।

সাধনার কথা যে বলা হয়, এ শরীর কাহার নিকট হইতে সাধন পাইল? কে ইহাকে পথ বলিয়া দিল? দীক্ষা তো নিজেই নিজেকে দিল। পূজা মন্ত্র জপ যাহা কিছু হইল, সবই তো নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া ইহাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। এই শরীরের সাধন সম্বন্ধে তো অনেকবার বলা হইয়াছে যে ইহা খেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সবই তো জানা আছে।"

আবার বলছেন, "এ সব কথা বলাটা এসে গেল। এ সব কথা যে কত সত্য, প্রত্যক্ষ ও গভীর তা সাধারণের পক্ষে বুঝা মুশকিল। এই সব নিয়া হাসি-ঠাট্টা হওয়াটা তো স্বাভাবিক। কারণ সকলের পক্ষে বুঝা এবং জানা সম্ভব নয়। যার ভিতর যতটুকু শক্তি তিনি তো সেইরূপেই প্রকাশ আছেন কিনা। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইটাই যে স্বাভাবিক। সর্বরূপে ও ভাবে এ যে সেই।"

গুরু প্রসঙ্গে বলছেন, "এই শরীর তো সর্বদাই বলে ছোটবেলায় এ শরীরের গুরু ছিলেন বাপ মা। পরে যখন বিবাহ হইল তখন বাপ-মাই বলিয়া দিলেন যে স্বামী গুরু। কাজেই বিবাহের পর স্বামীই গুরু হইলেন। তাহার পর জগতে যা কিছু সকলেই এ শরীরের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পারি যে 'আত্মাই' গুরু অথবা এই শরীরই এই শরীরের গুরু।"

* * *

বাংলা ১৩২৯ সন। ১৫ই অগ্রহায়ণ। ভোলানাথ দীক্ষা গ্রহণ করলেন; স্ত্রী নির্মলা মার নিকট থেকে। দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র মনে মনে সব কিছুই স্থির করে রেখেছিলেন নির্মলা মা। ঐ তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করবার জন্য তিনি ভোলানাথকে বলেও রেখেছিলেন। কিন্তু ভোলানাথের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ; তাই তিনি ঐ দিনটিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাছারীতে উপস্থিত হয়ে কর্ম কোলাহলের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত করতে লাগলেন।

কিন্তু যিনি সকল ইচ্ছার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী, অতিমানসী চিন্ময়ী মহাশক্তি, যিনি রহস্যরূপা, সেই মহামায়া বিশ্বজননীর ইচ্ছাই হোল পূর্ণ।

নির্দিষ্ট সময়ে নির্মলা ডেকে পাঠালেন ভোলানাথকে। ভোলানাথের কোন আপত্তিই তিনি শুনলেন না। পরমা-প্রকৃতি যোগমায়ার অপ্রতিহত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভোলানাথ মোহাচ্ছন্নের মত কাছারী থেকে চলে এলেন গৃহে। সেই সময় শ্রীমায়ের ভাবোন্মাদনায় বিহ্বলতার অনির্বচনীয় এক দিব্যমূর্তি নয়নগোচর করে ভোলানাথ অভিভূত হলেন। ভাবাতীতা মহাভাবরূপিনী মহামায়া শ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে বীজমন্ত্র উচ্চারিত হলো। ভোলানাথ সেই বীজমন্ত্র গ্রহণ করলেন শ্রীমায়ের নিকট হতে এবং দীক্ষা গ্রহণের পর্ব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হলো। সে সময় ভোলানাথ ভুলে গেলেন নির্মলা তাঁর স্ত্রী। অপরূপ করুণাস্নিগ্ধ বিশ্বজননীরূপে নয়নগোচর করলেন নির্মলাকে। ভোলানাথের জ্ঞানচক্ষু হোল উন্মীলিত। জানলেন চিনলেন তাঁর বিদ্যারূপিনী স্ত্রী নির্মলাকে। এবং 'দেবী'রূপে গ্রহণ করলেন নিজ স্ত্রীকে।

নির্মলা-মাও ভোলানাথকে দেখলেন বালগোপালরূপে। পরস্পরের প্রতি দেবতা-ভাব ছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বিশেষত্ব।

১৯২৪ সাল। নির্মলা এখন ঢাকায়। শাহবাগে। আর সেই লজ্জাশীলা কুলবধূ নির্মলা নয়। ভাবাবিষ্টা মাতৃমূর্তি। প্রেমাবেশে যেন উন্মাদিনী রাধারাণী। এই সময়েই দৈবীভাবের স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁর দেহসীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত হতে থাকে। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন সকল বিভূতির উর্দ্ধে নিঃসঙ্গ অবস্থিতা। বহির্জগতের ভাবলুপ্ত পরম আনন্দঘন অবস্থা। আর ভাবোন্মাদনা' যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর শরীরের ভিতর হতে আপনা হতেই ফুটে উঠছে। এখন আর সে শুধুমাত্র কুলবধূ নির্মলা নয়। নির্মলা মা, শাহবাগের মা, ঢাকার মা।

ভোলানাথ চাকুরীর সন্ধানে এসেছেন ঢাকায়। সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে এসেছেন। অনেক চেষ্টার পর চাকুরীর সন্ধান যখন মিললো না, তখন ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু স্ত্রী বাধা দিলেন। বললেন, "আর তিন দিন অপেক্ষা কর"। অগত্যা ভোলানাথ রইলেন আরো তিন দিন ঢাকা শহরে। অলৌকিক ঘটনা। ঠিক তিন দিনের দিন ১৩৩১ সালের ৩রা বৈশাখ,

শাহবাগে নবাবদের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজে নিযুক্ত হলেন ভোলানাথ। রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষ, মৃণালিনী দেবী ও প্রফুল্ল ঘোষের একান্ত চেষ্টায় এই চাকরী জুটলো ভোলানাথের। শাহবাগের প্রকাণ্ড বাগানের এক অংশে থাকবার ব্যবস্থা হল। নির্মলার মনের মতন স্থান হল এই শাহবাগের বাগানবাড়ী। নামগান কীর্তন হতে লাগল মাকে ঘিরে, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হল। ধীরে ধীরে এইখানেই গড়ে উঠলো মাতৃমণ্ডলী। আর এই শাহবাগে অবস্থান কালেই শ্রীমায়ের বিভূতির নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। 'নির্মলা মা' নাম ঢাকার ঘরে ঘরে প্রচারিত হল। গৃহস্থবধূরূপে আর প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারলেন না। মূর্তিমতী আনন্দরূপিনী-রূপে প্রকাশিতা হলেন। শাহবাগের মা ধীরে ধীরে বিশ্বজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন।

রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের স্ত্রী শ্রীযুক্তা হিরণবালা ঘোষ মাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন—"ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি। প্রায় প্রতিদিন বাগানে সেই বউটিকে দেখতে যেতাম। বৈকাল ৩টা হতে ৪টার মধ্যে কতক্ষণে সেই সময়টা আসবে তাই আমি অস্থির হতাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলতেন, বাড়ীতে থেকে কি ধর্ম হয় না? রোজই সেখানে কি? ধর্ম মনে করে যেতাম তা মনে হয় না। কিন্তু একদিন সেই বউটিকে না দেখলে প্রাণ অস্থির হতো। বাগানে যাবার জন্য ব্যাকুল হতাম। কেবলই মনে হতো, ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি। আমার ভালবাসাও যেন ক্রমশঃ সেই বউটির দিকেই যেতে লাগলো।"

বিশ্বজননীর দরবারে অর্থী, প্রার্থী, আর্ত, পীড়িত সকল রকমের ভক্তই আসতে লাগলেন। যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই নিয়ে যেতেন। এখানেই অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জন ডাক্তার শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা 'খুকুনী' —আদরিণী দেবী, মাকে প্রথম দর্শন করেই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে ফেললেন। বিনা সর্তে নিজেকে এমন করে সমর্পণ করেছিলেন যে পৃথক অস্তিত্বের বোধটুকুও আর ছিল না। মায়ের জন্য স্বামী সংসারও ছাড়লেন। মায়ের সঙ্গিনী শিষ্যা, জীবনাদর্শের ভাষ্যকার জীবনীকার ও ভক্তিমতী সেবিকারূপে জীবন উৎসর্গ করলেন। ইনিই হলেন ভবিষ্যতের শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী।

মা খুকুনী দিদিকে পেয়ে আনন্দিতা হয়ে বললেন—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? ভগা তোমাকে এনে দিয়েছেন। এখন এই শরীর দিয়ে ত আর সব

কাজ ঠিকমত হয় না, সেইজন্যই এই শরীরের কাজে সাহায্যের জন্য ভগা এনেছেন।"—বলেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

আদরিণী দেবীর পিতা ডাঃ শশাঙ্কমোহনই হলেন ভবিষ্যতের স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম পার্ষদ। মরমী ভক্ত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মায়ের সেবায় ছিলেন ব্যাপৃত।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর শ্রীগুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, "নেশা লাগিয়াছে। পরদিন আবার গেলাম। দেখিলাম। কথা শুনিলাম। চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আর প্রাণ টিঁকে না। রোজই যখনই সময় হয় একবার করিয়া মার কাছে যাই। সেই সময়টুকুর প্রতীক্ষায় সারা দিন রাত বসিয়া থাকি। এক এক দিন মাকে দেখিবার জন্য মন হঠাৎ এত চঞ্চল হইয়া উঠিত যে সেদিনের মধ্যে দুইবারও গিয়া উপস্থিত হইতাম। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইল। মধ্যে মধ্যে গিয়া মার কাজে সাহায্য করি। আমাকে পাইয়া মার খুব আনন্দ।

নিজের অবস্থার কথাও আমার কাছে অনেক বলিতেন। আমার মত প্রায় সর্বদার সঙ্গী ও কথা শুনিবার মত লোক এখন জোটে নাই। তাই যেন মহা আনন্দে প্রাণ খুলিয়া কত কথাই বলিতেন। আমিও মুগ্ধ হইতাম। প্রত্যহ কোন প্রকারে বাসায় গিয়া কিছুক্ষণ কাটাইবার পর চলিয়া আসিতাম।"

নির্মলা-মার সেই শান্ত যোগাবস্থা অথচ কুলবধূর ভাব। দুটি ভাব যুগপৎ অবলোকন করে মুগ্ধ হলেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়। আপনা হতেই তাঁর মাথা অবনত হল। মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন।

জ্যোতিষচন্দ্রের ছিল সন্তানভাব। বাৎসল্যরস। মায়ের উপর শিশুর মত একান্ত নির্ভরতা। মায়ের নামে আত্মহারা, তন্ময়তা। মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস। একদিকে ছিল কর্মজীবনের বন্ধন, ব্রিটিশ সরকারে উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন, অপর দিকে স্ত্রীর সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। শ্রীমায়ের চরণে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ। মা'ও তাঁকে ধর্মপুত্র-রূপে গ্রহণ করলেন।

শুরু হল মাতৃলীলা। সন্তানদের ঘিরে। জ্যোতিষচন্দ্রের প্রতি ছিল মায়ের বিশেষ দৃষ্টি।

শাহবাগে ভক্তদের ভিড়। মাকে একান্তে পাওয়া খুবই কঠিন। জ্যোতিষচন্দ্রের মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ওই বিমর্ষ মন নিয়েই সারাদিন কাটল। রাত্রিতে শুলেন, কিন্তু ঘুম হল না। হঠাৎ মধ্য রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে

গেল। মাতৃদর্শনের জন্য হৃদয়ভেদী অস্থিরতা উঠলো জেগে। ঘরের খোলা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সম্মুখে দেখতে পেলেন শ্রীমায়ের ছায়াশরীর। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। যাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল তিনি স্বয়ং এসে দর্শন দিলেন। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগল। নির্মলা-মা শাহবাগের মা যে জগন্মাতা এ বিশ্বাস জ্যোতিষচন্দ্রের মনে সুদৃঢ় হল।

পরের দিন এ ঘটনার কথা শুনে মা বললেন, 'এ শরীরটা দেখতে গিয়েছিল তুই কি করছিস্।' এই জ্যোতিষচন্দ্রই মাতৃভক্ত শিষ্য ও সন্তানগণের নিকট 'ভাইজী' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমায়ের লৌকিক লীলার অন্যতম পার্ষদ। জীবনাদর্শের ভাষ্যকার। মাতৃসন্তানগণের প্রাতঃস্মরণীয় ভাস্বর পথপ্রদর্শক। পিতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা শ্রাবণ শুক্লাদশমীতে চট্টগ্রামের বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতিষচন্দ্র।

দিনে দিনে মায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলা রহস্যের পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে শ্রদ্ধার সাহচর্যে 'ভাইজী' হয়ে উঠলেন মাতৃময়। মায়ের চরণ স্পর্শ করবার জন্য ভাইজীর আকুল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না, কারণ মা তখনও মাথায় ঘোমটা টেনে কথা বলেন, সহজে কাউকে চরণ স্পর্শ করতে দেন না। অব্যক্ত আবেগ বুকে নিয়ে তিনি চলে এলেন শাহবাগ থেকে। মনে মনে তীব্র অভিমান—সন্তানের কাছেও মায়ের অবগুণ্ঠন? দুঃখে অভিমানে কয়েক মাস আর মায়ের কাছে গেলেন না। ঘরে বসে রচনা করলেন 'সাধনা' গ্রন্থখানি। লোকমারফৎ পাঠিয়ে দিলেন মায়ের কাছে। মা মৃদু হেসে পুস্তক-বাহককে বললেন—"বই-এর লেখককে আসিতে বলিও।" লেখক কৃতার্থ হলেন, অভিমান দূর হল। ছুটে এলেন মায়ের কাছে। মা বললেন—"বইখানি সুন্দর হয়েছে, শুদ্ধ ভাবের বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করো।"

এই সময়ের মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে ভাইজী বলছেন—"আমার মন প্রাণ তাঁহার (মায়ের) চরণযুগল আশ্রয় করিয়া দিবানিশি পড়িয়া থাকে। এক এক সময় বোধ হয় - তাঁহার চিন্তা স্থগিত হইলে আমার জীবনের ধারাও শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহার বিশ্বতোমুখী বাৎসল্য স্বতঃস্ফূরিত হইয়া আমাকে যেন অসহায় শিশুর মতো সকল রকমে জড়াইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার স্নেহবেষ্টন হইতে দূরে যাইবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।"

'আমার পারমার্থিক উন্নতির কোন আশা আছে কি?' ভাইজী জিজ্ঞাসা করছেন মাকে।

"ক্ষিদে তো এখনও পায় নি। ক্ষুধা, ক্ষুধা চাই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তা হলে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না। একবার হাতটি ধরলেই তিনি কৃতার্থ। বিষয়-বাসনায় উদ্বেলিত জীবের সে ক্ষুধা হওয়া বড়ই কঠিন।" প্রত্যুত্তরে বললেন শ্রীমা।

মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করলেন ভাইজী মাতৃবাণী। মনে মনে বললেন—মা, ক্ষুধারূপিনী ত তুমি। তুমিই ক্ষুধা দাও।

মা জ্যোতিষচন্দ্রের পারমার্থিক ক্ষুধাই শুধু জাগ্রত করেন নি, আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকময় করে তুলেছিলেন তাঁর অন্তররাজ্য। ভাইজীর জীবনে মাতৃসঙ্গের অধ্যায় ছিল সংক্ষিপ্ত, মাত্র ১২।১৩ বছর। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন অতি নিকটে, নিবিড়ভাবে। আর তারই ফলশ্রুতি-স্বরূপ তিনি রচনা করলেন 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থ। শ্রীমার লোকপাবন লীলা ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সর্বপ্রথমে তিনিই গ্রন্থমাধ্যমে লোকসমাজে প্রচার করেন এবং মাতৃ-ভাবে বিভোর হয়ে অসংখ্য সংগীতও রচনা করেন। শ্রীমায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তিনিই প্রথম করেছিলেন।

ভাইজীর প্রতি অলৌকিকভাবে মাতৃকৃপাবর্ষণের আর একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েও ভাইজী রোগমুক্ত হলেন। ভাইজীর বিশ্বাস মা-ই তাঁকে রোগমুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাইজী বলেছেন, "একদিন আমার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল। ডাক্তাররা বলিল আমার জীবনের আশা কম। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামিয়াছে, চারিদিকে কুকুরগুলি চিৎকার করিতেছে। ভীষণ বিভীষিকাময় পরিবেশ। আমার চোখে ঘুম নাই, রোগযন্ত্রণায় অস্থির। অস্বাভাবিক পরিবেশ ও দুর্বলতার জন্য ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। অকস্মাৎ দেখিলাম মা যেন আমার শিয়রে ডান দিকে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি বিস্মিত হইয়া অনুভব করিলাম মা যেন আমার মাথায় হাত রাখিলেন। তখন হইতে আট দশ মাস পর্যন্ত যতদিন আমি শয্যাগত ছিলাম সর্বক্ষণই বোধ করিয়াছি যে, মা আমার শিয়রে স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি আমাকে মৃত্যুর হাতে ছাড়িয়া দিবেন না। আবার কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাশির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম তখন মা-র নাম জপ করিতে করিতেই রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতাম।

ভাইজী মাতৃকৃপায় রোগমুক্ত হয়ে অফিসে যোগদান করলে, একদিন মা

বলেছিলেন, "দেখলি, কেমন করে তোর পুনর্জন্ম হল।" আবার একদিন একটি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মা বললেন, "তোর তো অনেক ভাব ঝরিয়া গিয়াছে, আরো অনেক বাকী আছে। সব গেলে এই পুষ্পদণ্ডটির মত কেবল সূক্ষ্ম শক্তিরূপে এ শরীরটা তোর ভিতরে থাকবে, বুঝলি।"

শ্রীমার শাহবাগে থাকাকালীন অল্প সংখ্যক ভক্ত মাকে কেন্দ্র করে যে আধ্যাত্মিক আনন্দচক্র রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষের পরিবার, শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় ছাড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন—শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল ও দেওঘর বালানন্দ আশ্রমের স্বনামধন্য পুরুষ এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ কুমার বসু, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র, শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাউলচন্দ্র বসাক প্রভৃতি।

আরো কয়েকজন যুবক আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্তিমান সেবকরূপে শ্রীমায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা হলেন আজকের যোগেশ ব্রহ্মচারী, অতুল ব্রহ্মচারী, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও জটুভাই (শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী)। আরো কয়েক বৎসর পর ছাত্রাবস্থায় শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও মাকে দর্শন করে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেন। এবং পরবর্তী জীবনে যোগী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এঁরই পিতৃদেব মায়ের স্নেহধন্য সন্যাসী স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি। স্বামী দেবীগিরি মহারাজের শিষ্য। মায়ের আদেশেই উত্তর কাশীতে সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরাজী ১৯২৬ সন। শ্রীমায়ের দরবারে শাহবাগে প্রথম প্রকাশ্য কীর্তন। বহু লোকসমাগম হয়েছে। কীর্তন শুরু হোল। কৃষ্ণ কীর্তন।

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না
শুনেছি পুরাণে সাধু গুরু স্থানে,
হরি নামের নাইকো তুলনা॥

বেলা দশটা। মা বসে প্রথমে মেয়েদের সিঁদুর দিচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে কৌটাটি পড়ে গেল। সর্বাঙ্গ মাটিতে ঢলে পড়লো। কিছুক্ষণ

মাটিতে গড়িয়ে শরীরটা উঠলো। এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর খাড়া হয়ে দু'হাত উপর দিকে তুলে, মাথাটি পিছনে পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে পলকবিহীন স্থির ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন এক অলৌকিক ভাবে পরিপূর্ণ। মাথায় গায়ে বস্ত্রাদির প্রতি কোন খেয়াল নেই। তাঁকে ধরে রাখাও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কীর্তনের তালে তালে শরীর নৃত্য করতে করতে কীর্তনের স্থানের দিকে অগ্রসর হলো। যেন স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহাভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণ কীর্তনে মেতে উঠেছেন। দু'বাহু তুলে যেন হরে কৃষ্ণ নাম প্রেম বিলিয়ে চলেছেন।

আবার মধুর কীর্তনের রোল উঠলো—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

কীর্তনের স্থানে এসে মা পড়ে গেলেন। মাটিতে পড়েই শরীর ৩০।৪০ হাত স্থানের উপর দিয়ে বায়ুবেগে শুষ্ক পাতার মত গড়াগড়ি দিতে লাগলো। তখন তাঁর মুখশ্রী দৈবীভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ভাবে ঢুলু ঢুলু চাহনি হলো মধুর হতে মধুরতর। শোয়া অবস্থাতেই শ্রীমুখ হতে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'-ধ্বনি সুমধুর স্বরে বের হতে লাগলো। নেশার মত ঢুলু ঢুলু ভাবে শরীরটা উঠে বসলো। আর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। অনেক সময় পর প্রকৃতিস্থা হলেন। সে সময়ের মধুর চাহনি ও গদ গদ ভাব দেখে অনেকেই মন্তব্য করলেন, 'আমরা গ্রন্থাদিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার ভাবের আবেশের কথা পড়েছি তাই আজ মায়ের অঙ্গে প্রত্যক্ষ করলাম।'

সন্ধ্যার সময় মা কীর্তনমণ্ডপে প্রবেশ করতে মধ্যাহ্নের মতই আবার ভাবাবেশ হোল। কীর্তনীয়াদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন। কীর্তনের তালে তালে নৃত্য করতে করতে চলতে লাগলেন। কি অপূর্ব সে ভাবাবেশ! কী মধুর সে নৃত্যের ছন্দ! তখন মনে হচ্ছে গৌরসুন্দর যেন প্রেম-হিল্লোলে হেলে দুলে নেচে নেচে চলেছেন। ঐ রূপমাধুরী পান করবার জন্যই বুঝি ভকত ভ্রমর উড়ে উড়ে মধুপান করবার জন্য ছুটে আসছে। মায়ের সেই কীর্তনে ভক্তবৃন্দ দেহস্মৃতিও যেন ভুলে গেছে। মায়ের অপরূপ নৃত্যভঙ্গী! তাতে আবার অপরূপ মৃদঙ্গধ্বনি! এক অভিনব কীর্তন নর্তন। ছেলেরা মেয়েরা ভদ্রঘরের বধূরা সকলেরই অন্তর যেন নৃত্যেরই তালে তালে নেচে উঠছে। কেউ কেউ চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। তখন মনে হচ্ছে

ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরকিশোরকে কীর্তনের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। নির্মলা-মাকে নয়, নির্মলা-মার মধ্য দিয়ে তাঁরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেই নয়ন-গোচর করে ধন্য হচ্ছেন।

হ্যাঁ এমনই হয়। সঙ্কীর্তন রাসমণ্ডল। শ্রীবৃন্দাবনে যেমন শ্রীরাধাগোবিন্দ রাসে নৃত্য করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণের দুই তনু একীভূত হয়ে আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন, গৌরাঙ্গরূপে নদীয়াধামে। সেই নন্দনন্দন শচীনন্দন আবার এসেছেন। নদীয়া ধামে নয়, ঢাকা শহরে। শাহবাগের বাগানে। কুলবধূ নির্মলা-মা রূপে। ভাবময়ী 'শাহবাগের মা', 'ঢাকার মা' রূপে। নির্মলা মা তাইতো আবার নিয়ে এসেছেন কীর্তনে উন্মাদনা। শ্রীশ্রীমার অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাব—অশ্রু কম্প স্বেদ পুলকাদী আবির্ভূত হয়েছে। ভক্তরা অনিমিখ সেই দিকে তাকিয়ে সেই ভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে ধন্য হচ্ছেন।

আবার কীর্তনের ধ্বনি উঠলো। "দেখরে নয়ন ভরি গৌরসুন্দর রে। গৌরাঙ্গ প্রণয় রসময় পুরন্দর রে!··· আমি এনেছি রে প্রেমের তরী। আমি লয়ে ফিরি প্রেমের তরী। এই ভবপারের ঘাটে ঘাটে লয়ে ফিরি নামের তরী। আমি পার করে দেই ভববারি। শুধু মুখে বললে গৌরহরি পার করে দেই ভববারি।"

কী অপূর্ব সে নামধ্বনি! কি অপূর্ব নটন ভঙ্গী, কি অপূর্ব হেলন দোলন! অপূর্ব মৃদঙ্গ বাজছে। কী মধুর সে মৃদঙ্গের বোল। আর শ্রীশ্রীমায়ের চোখ মুখের ঢুলু ঢুলু ভাব!

আবার একদিন কীর্তনের বন্দোবস্ত হলো জ্যোতিষচন্দ্রের বন্ধু ইন্‌কাম টেক্‌স বিভাগের এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার শ্রীনিরঞ্জন রায়ের বাড়ীতে। ঢাকা শহরে। নিরঞ্জনবাবুর বৃদ্ধা মাতা শ্রীশ্রীমার মহাভাব দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন মনে মনে শ্রীশ্রীমার কাছে কৃপা প্রার্থনা করলেন, ভাবাবিষ্টা মাতৃমূর্তি দর্শনের জন্য। মধুর মধুর কৃষ্ণনাম গৌরনাম শুরু হোল।—

আমার গৌরসুন্দর নেচে যায়!
তোরা দেখবি যদি আয় নাগরি,
নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি,
দেখবি যদি আয় নাগরি,
গৃহ কাজ তো সদাই আছে।
গৌর নটন দেখবি আয়,

গৃহ কাজে পড়ুক বাজ,

দেখবি গোরা রসরাজ ॥

যে ঘরে কীর্তন হচ্ছিল, তারই সংলগ্ন একটি ঘরে মা ভাবাবেশে শুয়ে আছেন। নামধ্বনিতে তাঁর প্রেমের আবেশ হলো। সেই অপ্রাকৃত প্রেম! সেই প্রেমসেবা প্রাপ্তির জন্য তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য, তৃষ্ণা উৎকণ্ঠা প্রবল হোল। দেহ মন প্রেমঘন হয়ে উঠলো। হঠাৎ উর্দ্ধবাহু হয়ে প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্য করতে করতে মেঝের উপর পড়ে গেলেন। তখন মনে হোল এ দেহ যেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবদেহ নয়। দৈবীভাবের স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁর জীবদেহে প্রকাশিত হলো। তিনি যেন তখন সকল বিভূতির উর্দ্ধে অবস্থিতা রয়েছেন। এবং ভাবাবস্থাও যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর দেহ মনের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি মৌন হয়ে গেলেন। তখন তাঁর সেই মহামৌন স্তব্ধ প্রশান্তি সমবেত ভক্তজনের প্রাণে অপরূপ এক আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তুললো। নিরঞ্জনবাবুর বৃদ্ধা মাতা শ্রীমায়ের এই মহাভাবের মহামৌন ভাবাবিষ্টা মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন। এই প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, 'নামে তন্ময়তা আনিতে পারিলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামী অভেদ বলিয়া সে সময়ের জন্য বহির্জগতের ভাব লুপ্ত হয়। এবং নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তাহা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে।'

কীর্তনে নির্মলা-মার লোকাতীত অবস্থার কথা ঢাকার ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো।

শাহবাগে অবস্থানকালে মায়ের অলৌকিক শক্তির যে বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল, সিদ্ধেশ্বরী স্থানলীলা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজিতপুরেই মা স্বপ্নে 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ' দেখেছিলেন। ভোলানাথের বন্ধু স্কুলের শিক্ষক বাউলচন্দ্র বসাকই প্রথম শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথকে সিদ্ধেশ্বরী নিয়ে যান। সেখানে একটি প্রাচীন কালীমন্দির ও একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ থেকে কোন সময়ে একটি জ্যোতি বেরিয়ে কালীমূর্তির সঙ্গে

মিলিয়ে গিয়েছিল। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোলানাথ ও মা আটদিন সিদ্ধেশ্বরী স্থানে বাস করেন। সে সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

মা বলছেন: 'আটদিনের দিন ভোরে ভয়ানক বৃষ্টি। এই শরীর ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া বাহিরে গেল। কোথায় কি রাস্তা কিছুই জানি না। একেবারে উত্তর দিকে চলিলাম। শেষে নির্দিষ্ট স্থানে শরীরটা দাঁড়াইল। তিনবার প্রদক্ষিণের মতো হইল। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া, কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং মুখ হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। বসিয়াই মাটিতে হাতখানি চাপিয়া রাখিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এক একটা মাটির পর্দা সরিয়া যাইতেছে, আর হাতটা অবাধে ঢুকিয়া যাইতেছে। এইভাবে যখন বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকিয়া গিয়াছে তখন ভোলানাথ এই শরীরটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এবং হাতখানি বাহির করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অল্প-অল্প গরম জল লাল রঙের উঠিতে লাগিল। মায়ের ইঙ্গিতে ভোলানাথও সেইখানে হাত দিলেন এবং তিনিও বোধ করলেন সেই স্থানটি ফাঁকা এবং গরম গরম।

পরে মায়ের নির্দেশে ঐ স্থানে একটি বাঁশ দিয়ে ঘেরা ইটের বেদী তৈরী করা হয়। এইভাবে সিদ্ধেশ্বরীর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটিকে কেন্দ্র করে রহস্যময়ী মায়ের নানা রহস্যের খেলা শুরু হোল। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমা প্রকাশ করেছিলেন ভোলানাথ পূর্বের কোন জন্মে ঐ স্থানে সাধন করেছিলেন।

এই সিদ্ধেশ্বরীর পবিত্র ভূমি ও কালীমন্দিরকে ঘিরে মায়ের এখন চললো নানা লীলাখেলা। আবার একদিন ভাইজী মা ও ভোলানাথ এসেছেন সিদ্ধেশ্বরীতে। ভাবানন্দময়ী শ্রীশ্রীমা শান্তভাবে এসে বসলেন মন্দিরের নিকটস্থ কুণ্ডের মধ্যে। দিব্যজ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দিব্য-ভাবের ভাবোন্মাদনায় নির্মলা-মা, শাহবাগের মা, ধারণ করলেন আনন্দময়ী মূর্তি। সেই অনির্বচনীয় প্রসন্নতার মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভাইজী। দেহ মনে এক অপূর্ব আনন্দময় স্পন্দন অনুভব করলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হলো 'আনন্দময়ী মা'। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। আনন্দই যাঁর ভাব। আনন্দই যাঁর উপাদান। আনন্দেই যিনি অবস্থিতা। যিনি জগতে আনন্দলীলা করবার জন্য আনন্দঘন মূর্তি ধারণ করেছেন, তিনিই তো আনন্দময়ী। আনন্দরূপেই তাঁকে আমরা খুঁজবো। উপাসনা করবো। আনন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দই সৃষ্টির রহস্য। আনন্দই জন্মের মূল। আনন্দ আছে বলেই

তো সব কিছু বর্তমান। আনন্দই জন্মের অন্ত। সৃষ্টির বিলয়। তাইতো মা আমাদের আনন্দময়ী। ভাইজী তখনই বাবা ভোলানাথকে বললেন, আজ হতে আমরা শুধু 'মা' বলে ডাকবো না। বলবো 'আনন্দময়ী মা'। 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।' ভোলানাথ হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি জানালেন। মা স্থির দৃষ্টিতে, ভাইজীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সমাধিস্থ হলেন। পরে হাসতে হাসতে মা বলেছিলেন ভাইজীকে,'সিদ্ধেশ্বরী না গেলে এই শরীরের নামকরণই বা কি করে হতো ?

সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনির মত আনন্দময়ী মা নাম ঢাকার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হতে লাগলো।

* * *

ঢাকায় দার্শনিক সম্মেলন। বড় বড় দার্শনিক ও অধ্যাপকরা সমবেত হয়েছেন। সম্মেলন শেষে দার্শনিকবৃন্দ ও অধ্যাপকমণ্ডলী এসে উপস্থিত হলেন শাহবাগের বাগানবাড়ীতে। আনন্দময়ী মাকে দর্শন করবেন আর শ্রীমুখের কথা শুনবেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন দার্শনিক ও অধ্যাপকরা। লেখাপড়া না-জানা শাহবাগের সেই বউটি—অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ নির্মলা—ঢাকার মা, আনন্দময়ী মা প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে চলেছেন। দার্শনিক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার জিজ্ঞেস করলেন,

—'মা আপনি দর্শন পড়েছেন ?'

—'কেন বাবা ?' মৃদু কণ্ঠে মা বললেন।

—'আপনাকে আমরা যে সব প্রশ্ন করছি তার যে সব উত্তর আপনি দিচ্ছেন সেগুলি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এটা কি করে হয় ?' বললেন ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার।

মা তো নিজেও অবাক। কি করে জুটছে এতো কথা। বেদ বেদান্ত পুরাণ কিছুই তো পড়া হয় নি। তবে ? মা তো আর শাস্ত্রপড়া পণ্ডিত নন। এ তো আত্মোপলব্ধির সত্যজ্যোতিপ্রকাশ। পাণ্ডিত্য নয়, স্বচ্ছ অনুভবজাত সিদ্ধান্ত।

এবারে ধীর কণ্ঠে মা বললেন—'বাবা, একটা বিরাট গ্রন্থ আছে। সব রকম জ্ঞানই তার অন্তর্গত। সেই গ্রন্থের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তাঁর কাছে তোমাদের বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কিছুই অজানা থাকে না।'

এবারে অধ্যাপক দার্শনিকবৃন্দ ও মহেন্দ্রনাথ সরকার উপলব্ধি করলেন আনন্দময়ী মার কথার মর্মার্থ। আর তাঁকে বাজাতে ইচ্ছা হলো না।

পরীক্ষা নয়, জানবার ইচ্ছা নিয়েই জিজ্ঞেস করলেন। শুধু জিজ্ঞাসা নয়, ধরে বসলেন।

বাজিতপুরে অবস্থানকালে একদিন ভাবাবস্থায় যে আত্মপরি.. দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন রাখলেন, 'আপনার মুখ থেকে সেদিন ... বের হয়েছিল ?'

মা কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বললেন—'এ শরীরের বলিতে কি, শরীর তো নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু বলে নাই। যা বাহির হইবার ত বাহির হইয়া গিয়াছে।'

কিন্তু ডক্টর সরকারও নাছোড়বান্দা। অকস্মাৎ মায়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর .. রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। ধীর কণ্ঠে বললেন—'এই শরীরের মুখ দিয়া ত.. বাহির হইয়াছিল—"পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। পরমুহূর্তেই মায়ের শরীরে ভাবা.. ঘটলো। মা শয্যাগ্রহণ করলেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভোলানাথ বললেন—'কেন বলিলে ? তুমি তো নিষেধ করি রাখিয়াছিলে ?'

মা বললেন—'এ শরীর তো নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না। বো.. হয় সময় হইয়াছে, তাই এইভাবে প্রকাশ হইল।'

শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার অবস্থানে শাহবাগ এখন আনন্দধামে রূপান্তরিত হয়েছে। নাম গান কীর্তন সৎসঙ্গ ধর্মালোচনা দিবারাত্র যেন আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে শাহবাগের বাগানবাড়ীতে। শ্রীশ্রীমার মুখনিঃসৃ.. কথামৃত পান করতে প্রতিদিনই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন হচ্ছে। তাঁর শুধু মাকে মাতৃজ্ঞানে প্রণামই করেন না। মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতসুধ পান না করে ক্ষান্ত হন না। মায়েরও এখন বধূত্বের সঙ্কোচ অনেকখানি অপসারিত হয়েছে।

১৫

"জীব-ভাবটা কি রকম, না মাঠের মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘর করার মত। মাঠ তো পড়ে আছেই। বেড়া দিয়ে ঘর করলেও ঐ ঘরের মধ্যেও মাঠ। বাইরেও মাঠ। আবার বেড়া ভেঙ্গে দিলে যে মাঠ সেই মাঠই। তাই বলি লাভালাভ বলে কিছু নেই। জীবও স্বরূপতঃ ভগবান। শুধু বন্ধনের জন্য তাকে জীব বলা হয়। বন্ধনটি খুলে গেলে সে যে ভগবান সেই ভগবানই থাকে। সেইজন্য আবার বলা হয় যে, যত জীব তত শিব।

এই জীব-ভাবকে নদীর তরঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। নদীর জলে ওঠে ঢেউ। এই ঢেউগুলি জীব। আর জল হলো ভগবান। ঢেউ কিন্তু জলে ওঠে এবং প্রকৃতপক্ষে তা জল ছাড়া কিছুই নয়। সেই রকম জীবের স্থিতি ভগবানে এবং প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানই। তবে আমাদের ভেদবুদ্ধি আছে বলে আমরা ঢেউকে জল থেকে আলাদা ভাবি। তা না হলে ঢেউ ও জলের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। এই প্রভেদ উপরে উপরে দেখা যায়। বস্তুর অন্তস্থলে সেই একত্ব বিরাজমান। জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই। অজ্ঞানতাই সৃষ্টি করেছে প্রভেদ।

'আমি সব', 'আমিই সব', 'তুমি সব' 'তুমিই সব', এই রকম একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এই ভাবে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে তখন আর দুটি নেই। 'আমি' আছে অথবা 'তুমি' আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তখন সব কিছু লয় হয়ে যায়। ইহাই ব্রহ্মের অনুভূতি। ইহাই ভগবান লাভ করা। কথায় প্রকাশ করা যায় না। কথার মধ্যে আসলেই খণ্ড হয়ে যায়। ভাষা তো ভাষাই। সেই জন্যই বলা হয় জীব হলে শিব হওয়া যায় না।

শুদ্ধ ও অনন্য ভাবের বলে সবই সম্ভব হয়। এই শুদ্ধ ভাব জাগাতে হলে চেষ্টা অভ্যাস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। চেষ্টা করতে করতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং শুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। এই শুদ্ধ ভাবটা যে কি তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যখন মনে ঐ ভাবের উদয় হয় তখনই বুঝা যায়। আবার এই বিশুদ্ধ ভাব জাগলেই মানুষ বুঝতে পারে চেষ্টা বা কর্মের মধ্যে কোনও সার নেই। সে উপলব্ধি করে যে, সে ভগবানের হাতের পুতুল মাত্র। তিনি যেভাবে

নাচান সেইভাবে সে তখন নাচে।"

'এই বিশুদ্ধ ভাব জাগাতে হলে একটা পথ অবলম্বন করে থাকতে হয়। সে ভাবটা দ্বৈতভাবেরই হোক কি অদ্বৈতভাবের হোক তাতে কিছু যায় আসে না।'

হেসে হেসে গভীর তত্ত্বকথা মা বলছেন ঢাকায় শাহবাগে ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে। সেখানে বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু, রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষের পরিবারের অনেকেই ও অন্যান্যরা।

আবার বলছেন, 'জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তার ভিতরে এই আনন্দ আছে বলেই ত চায়। তা না হলে চাইতো না। সে যে আনন্দ না চেয়ে থাকতে পারে না। লক্ষ্য করলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যেতে চায় না। তারাও চায় শান্তি, আরাম। মানুষও তাই ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত হয়ে শান্তির স্থল খোঁজে।সেই শান্তির স্থান কোথায়? বিনা পরিশ্রমে বিনা তপস্যায় কি সেখানে যাওয়া যায়? তিনিই তো ভগবান। সেই ভগবানের আশ্রয়ই শান্তির স্থল। ত্রিতাপ হতে রক্ষা পেতে হলে অন্য তাপের সাহায্য নিতে হয়। তাপ দিয়েই তাপকে জয় করতে হয়। একেই বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকেই এ শরীর বলে তপস্যা। সংসার-তাপ সহ্য করতে যে রকম কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নিতেও সে রকম কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েও ত্রিতাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের নাম নিতে নিতে ধীরে ধীরে কষ্টবোধ আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কাজেই চাই চেষ্টা, চাই অভ্যাস, চাই কর্ম।

পশুপক্ষীর মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোনও গরজ নেই। এই শুভ ইচ্ছা একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। জীবকে ভগবান অজ্ঞানের পরদা দিয়ে ঢাকলেও আবার জ্ঞানের দরজাও রেখে দিয়েছেন। সে ঐ দরজা দিয়েই মুক্ত হতে পারে। তবে পরম বস্তু পেতে হলে, ভগবানকে লাভ করতে হলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের উপরে উঠতে হবে। যতক্ষণ জ্ঞান ও অজ্ঞান আছে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে। ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন ব্রহ্মানুভূতি হয় তখন সমস্ত ভেদজ্ঞান লয় হয়ে যায়।'

এবারে মা আনন্দময়ী জ্ঞানরাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করে বেদান্তের

কঠিন তত্ত্বকে সরল ভাষায় সহজ করে ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করতে লাগলেন।

ব্রহ্মের স্বরূপটি কি ?

"ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই অভাব এসে পড়ে। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন খণ্ড। তবে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে সৎ-চিৎ-আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন, তাই সৎ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাই চিৎ। আর এই সৎ এর জ্ঞান হলেই আনন্দ। তাই তো বলা হয় সৎ-চিৎ-আনন্দ, সচ্চিদানন্দ। সত্য জ্ঞান আনন্দ এই তিনের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। এরা অভিন্ন। সত্য জ্ঞান হতে ভিন্ন হলে, উহা জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় হয়ে পড়ে। জ্ঞেয় পদার্থ যেমন প্রপঞ্চ মিথ্যা, অতএব সত্য মিথ্যা হয়ে পড়ে। আনন্দ জ্ঞান হতে ভিন্ন হলে, উহা জ্ঞানের বিষয় হযে পড়ে। জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হলে উহা মিথ্যা হয়ে পড়ে। অতএব সত্য জ্ঞান ও আনন্দ অভিন্ন। আবার তিনিই এই আনন্দ নিরানন্দের উর্ধে। তাই তো বলা হয় বই পড়ে কি আর ভগবানকে লাভ করা যায় ? শাস্ত্রে বলেছে কতটুকু ? শাস্ত্র কি রকম—না ছাদে উঠবার সিঁড়ির মত। শাস্ত্র কেবল উঠবার সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠলে যা প্রত্যক্ষ করা হয় তার বর্ণনা শাস্ত্রে নেই। কারণ যে একবার ছাদে উঠেছে সে তো নিজেই সমস্ত দেখেছে। সুতরাং সেইখানে একবার পৌঁছানো দরকার। তাই শাস্ত্রে সেই পথেরই বর্ণনা আছে।

প্রকৃতপক্ষে তিনি উহা বটেন, আবার তিনি উহারও উর্ধে। 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নাস্তি'ও বলা যায় না। তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। দেবদেবীর মূর্তি যে দেখা যায়, তা সত্যও বটে আবার মিথ্যাও বটে। সবই সত্য, আবার সবই মিথ্যা। এগুলি হলো সিঁড়ির ধাপ। এগুলি জীবের উপলব্ধির নানা অবস্থা, নানা ভাব। যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, সেই অবস্থায় উহা সত্য। পরে ঐ অবস্থার উর্ধে উঠলে ঐ ভাবেরও লয় হয়। সম্পূর্ণরূপে লয় হয় না। যেমন নীচের সিঁড়ি থেকে উপরের সিঁড়িতে উঠলে নীচের সিঁড়ি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু যে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে উহা না থাকারই মত। এ সব ভাবও ঐরূপ। মানুষ যখন ভাবের রাজ্যে থাকে তখন সব দেবদেবী তার কাছে সত্য। আবার এই ভাবের রাজ্য ছেড়ে সে যখন সত্যের রাজ্যে যায়, তখন ঐ ভাব তার মধ্যে লয় পায়। তখন উহা তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। আবার সকলের কাছেই হয় না। এই

অর্থে দেবদেবী সত্য। সুতরাং ব্রহ্ম খণ্ড অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। আবার অখণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। যেমন এই শরীরের আঙুল স্পর্শ করলেও এই শরীরকেই স্পর্শ করা হয়, অথচ এই শরীরটা আঙুল নয়। এই শরীরের কাপড় স্পর্শ করলেও এই শরীরকেই স্পর্শ করা হলো, অথচ এই শরীরটা কাপড় নয়। এই শরীরের অংশও যেমন আমি, আমার সমগ্র আমিও আমি অর্থাৎ এই শরীরটা। এক হয়েও তিনি বহু, বহু হয়েও তিনি এক। এই তাঁর লীলা।

একটু বালুকণাতেও তিনি যেভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেইভাবে পূর্ণ। আবার অখণ্ডতেও সেইভাবে পূর্ণ। তবে ইতর জন্তু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে আছে এক বিশেষ শক্তি—যা দ্বারা সে পারে পূর্ণতা লাভ করতে। মানুষ বলতে এই শরীরটা বলে, মনের হুঁশ যার হয়েছে সেই মানুষ। যার মনের হুঁশ হয়নি, যে বিষয় বাসনায় তন্ময়, তাকে মানুষ বলা যায় না। সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীও নয়।'

আবার বলছেন অবতারবাদের কথা। ভগবান মৎস্যরূপে, কূর্মরূপে বরাহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এর অর্থ কি ? 'এর অর্থ হলো মৎস্য কূর্ম বরাহ ইত্যাদি জীবজন্তুর মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকট করে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছেন। এই হলো অবতারবাদের রহস্য। তাইতো এই শরীর বলে খণ্ডতেও তিনি অখণ্ডতেও তিনি। উভয়েই তিনি যুগপৎ আছেন। তিনি আছেন ইহাই সত্য।'

একজন বিশিষ্ট ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন—'আচ্ছা মা, সাধনে পতন হলে আবার উঠা যায় কি ?'

মা বললেন—'পড়া থাকলেই উঠা আছে বাবা।' এবারে মা বলছেন—রায় বাহাদুর যোগেশ ঘোষের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে। 'বয়স বেড়েছে ভাল কথা। দীর্ঘজীবন লাভ পুণ্যের ফল। যত বেশী বেঁচে থাকা যায় তত ভোগ কেটে যায়। মৃত্যু চিন্তা করতে নেই। বরং ভাবতে হয় আমার ভোগ কেটে যাচ্ছে।' তারপর মৃদু হেসে যোগেশবাবুকে দেখিয়ে বলছেন—'তুমি ওঁকেই তোমার গোপাল মনে করিও। মনে শান্তি পাইবে।'

আবার বলছেন—যোগেশবাবুর কন্যা মৃণালিনীদেবীকে। মৃণালিনীদেবী হলেন শ্রীভূদেব বসুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং লেখক অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুর সৎ-মা। 'পিতা মাতার সেবা করাই তো মেয়েদের ধর্ম। নিজের সুখের জন্য

তো মেয়েদের জন্ম হয় নি। দেখ না ব্রজাঙ্গনাদের নিজ সুখবাঞ্ছা কিছুই ছিল না। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই কাজ করতেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করতেন। সংসারে শান্তি পেতে হলে চাই ত্যাগ আর সেবা।'

এইভাবে দিনের পর দিন আনন্দময়ী মা অপূর্ব কথামৃত পান করাচ্ছেন ভক্তদের। ঢাকায় শাহবাগের বাগানবাড়ীতে। যেন ভক্তের মেলা বসেছে। এক একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন, মাও উত্তর দিচ্ছেন প্রসন্ন কণ্ঠে। ক্লান্তি নেই। নেই অবসাদ। উদাস বিহ্বল দৃষ্টি। দিব্যজ্যোতিতে সারাটি অঙ্গ সমুজ্জ্বল। তিনি যে আনন্দময়ী মা! শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী!

ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। ঝির ঝির করে বইতে লাগলো স্নিগ্ধ বাতাস। আর সেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ফুলের সুমধুর গন্ধ। শুরু হোল নাম গান। কৃষ্ণগুণ গান।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন।
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।

আনন্দময়ী মা করবেন কালীপূজা। ঢাকায় শাহবাগে। ঢাকায় শ্রীমা তখন 'মানুষ কালী' বলে প্রচারিত। গ্রামের মানুষেরা আনন্দময়ী মাকে জীবন্ত কালী বলেই মনে করেন। ভক্তরাও বলেন, সিদ্ধেশ্বরীর কালী ও মা এক। সত্যসত্যই সিদ্ধেশ্বরীর কালীর সঙ্গে যেন মায়ের আত্মিক যোগ রয়েছে। ভক্তবৃন্দেরা মাকে ধরেছে কালীপূজা করবার জন্য। শ্রীমা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। ভোলানাথকে বললেন, 'তুমিও আর এ সব কাজে অনুরোধ করো না 'এ শরীরটা কোন কাজই করে উঠতে পারছে না।'

কিন্তু ভক্তবৃন্দের অনুরোধ আর আকাঙ্ক্ষাকে ঠেলে ফেলতে পারলেন না শ্রীমা। অবশেষে পূজার একদিন পূর্বে স্থির হলো পূজা হবে। একদিনের মধ্যে প্রতিমারও ব্যবস্থা হলো। ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা শহর থেকে ঠিক মাপের প্রতিমা নিয়ে এলেন। পূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। ভক্তবৃন্দের আকুল প্রাণের প্রার্থনায় আনন্দময়ী মা পূজায় বসলেন।

দৈবীভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডল। কিছুক্ষণ পর মা ভোলানাথকে বললেন, 'এ শরীরটা নিজের আসনে যাইতেছে, তুমি এখন পূজা কর।' নিমেষের মধ্যে শ্রীমা কালীমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করতে করতে মাটির উপর বসে পড়লেন। তখন পূজার ঘরটি অনির্বচনীয় ভাবস্পন্দনে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করলো, এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখলেন কালীমূর্তি ও আনন্দময়ী মা এক ও অভিন্ন। কালী-মহাকালী ভদ্রকালীর মূর্তি ধারণ করেছেন স্বয়ং মা। অভিভূত ভোলানাথ মা-মা বলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠলেন। তারপর দু'হাত ভরে অঞ্জলি দিলেন। শেষে ভোলানাথই কালী প্রতিমা ও মাকে একই সঙ্গে পূজা করলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অনির্বচনীয় আনন্দসাগরে অবগাহন করতে লাগলেন। রাত্রি শেষ প্রহরে পূজা সমাপ্ত হলো। পূজায় বলির ব্যবস্থা ছিল না। পূর্ণাহুতি দেবার সময় মা বললেন, 'পূর্ণাহুতি দেওয়া হইবে না। যজ্ঞের অগ্নি রাখিয়া দেও।' সে অগ্নি পরে রমণার আশ্রমে রক্ষিত হয়। সেই মূর্তিও বিসর্জন দেওয়া হলো না। হঠাৎ সকলের লক্ষ্য পড়লো ভক্ত উকীল বৃন্দাবনচন্দ্র বসাকের প্রতি। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। জ্ঞান হলে তিনি বললেন, 'মার মুখমণ্ডলে এক উজ্জ্বল জ্যোতি দেখে আমি চমকিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

আর এই মৃন্ময়ী কালী মূর্তির সঙ্গে আনন্দময়ী মার যে রহস্যময় সম্বন্ধ ছিল সেই প্রসঙ্গে ভাইজী বলছেন, "আমি মার সঙ্গে কক্সবাজারে ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার হাতখানা ভাঙ্গা নাকি? ভাঙ্গা নাকি? তোমরা দেখ উহা ভাঙতেও পারে।' পরে জানা গেল, ঠিক সেই রাত্রিতে কালীমূর্তির হাত ভেঙ্গে চোরে গয়না অপহরণ করেছে।"

সিদ্ধেশ্বরীর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটিকে কেন্দ্র করে রহস্যময়ী মায়ের আর একটি রহস্যের খেলা শুরু হলো। সিদ্ধেশ্বরীতে ঘর উঠবার পর মহাসমারোহে বাসন্তী পূজার অনুষ্ঠান হলো। সেও এক অলৌকিক ঘটনা। পূজার দিন মূর্তিগুলির প্রতি মা অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন। অকস্মাৎ ভক্তবৃন্দ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখলেন মৃন্ময়ী প্রতিমাগুলির চোখ জীবন্ত মানুষের চোখের মত দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে। পরমুহূর্তে মা আনন্দময়ীও ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। পূজা সমাপন হলে ভক্তরা ধরে বসলেন মাকে এই রহস্যের ইতিবৃত্ত জানবার জন্য। মৃদু হেসে মা বললেন, 'দেবদেবীর সত্তা আমার তোমার দেহের মত সত্য এবং ভাবের চোখে তাঁদের দর্শন লাভ হয়।'

ইংরাজী ১৯২৬ সাল। হঠাৎ একদিন মা চলে এলেন বৈদ্যনাথধামে। বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে। ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য। তাইতো মাকে নিয়ে এসেছেন। বালানন্দজীও মাকে তাঁর আশ্রমে পেয়ে খুবই আনন্দিত। শুরু হলো আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা। ধ্যানমন্দিরে মায়ের সাথে কথা হচ্ছে ব্রহ্মচারীজীর।

হাসতে হাসতে ব্রহ্মচারীজী বললেন—'মা, তোমার গাঁটরি খোল।'

মা প্রত্যুত্তরে হেসে হেসে বললেন—'বাবা, গাঁটরি তো খোলাই রয়েছে।'

আবার বলছেন—'এক ছাড়া কিছুই নাই।'

ব্রহ্মচারীজী মানছেন না। বললেন—'দুই তিনও তাঁরই মায়া।'

মা কিছুতেই দুই স্বীকার করছেন না। অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক চললো। অবশেষে ব্রহ্মচারীজী আনন্দময়ী মার যুক্তি মেনে নিলেন। বালানন্দজী খুসী হয়ে মাকে কোলের কাছে বসিয়ে ফল খাওয়ালেন।

আবার একদিন ব্রহ্মচারী বালানন্দজীর ধ্যানমন্দিরে মায়ের ভাবাবেশ হলো। ভাবসমাধি। আনন্দময়ী-মার আধারে বিশ্বজননীকে নয়নগোচর করে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী মহারাজ আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন—'ইনি সাধিকা নন। ইনি নিত্য সিদ্ধা। এঁর কোন প্রকার সাধন ভজন করতে হয় না।'

এক সপ্তাহ পরে মা আবার ফিরে এলেন ঢাকায় শাহবাগে। নামগান কীর্তনানন্দে শাহবাগের বাগানবাড়ী আবার মেতে উঠল। মা আজকাল অধিকাংশ সময় ভাবানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। সর্বদাই অন্যমনস্ক ভাব। মৌনী থাকবার ইচ্ছা। কিন্তু ভক্তবৃন্দ নাছোড়বান্দা। রাজশাহীর অধ্যাপক শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য সস্ত্রীক এসেছেন। ঢাকা জিন্দাবাহারের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুশারীও সস্ত্রীক এসেছেন। আছেন শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, উমেশ দত্ত, যতীন কবিরাজ, শ্রীকালীপ্রসন্ন কুশারী, শ্রীনিরঞ্জন রায়, সত্য রায়, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, জটুভাই, অতুল ব্রহ্মচারী, যোগেশ ব্রহ্মচারী, গুরুপ্রিয়া দেবী ও অন্যান্য অনেকে।

প্রশ্ন উঠেছে অবতার ও সাধকে প্রভেদ কি? প্রত্যুত্তরে মা বললেন, 'যিনি সাধক তিনি কোন একটা নিয়মে, কি কতকগুলি নিয়মে নিজেকে আজীবন বেঁধে রাখেন। কিন্তু যিনি অবতার তিনি কোন নিয়মেরই অধীন হন না। যদিও সবই তাঁর ভিতর দিয়েই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি কোনটাতেই বদ্ধ থাকেন না। লক্ষ্য করলে ধরা যায়। অবশ্য সাধারণের পক্ষে ধরা মুস্কিল।'

শ্রীকালীপ্রসন্ন কুশারী বললেন—'দেখুন আপনি কথা বলতে বলতে কোথায় চলে যান বলতে পারেন? পরিষ্কার বোঝা যায় আপনি এখানে ছিলেন না। কি রকম ভাব হয় বলুন তো?'

মৃদু হেসে মা বললেন, 'যে চিনি না খেয়েছে তাকে ঠিক বোঝানো যায় না, চিনি কেমন মিষ্টি।' মা যতই চেষ্টা করেন চুপচাপ থাকতে, ভক্তজনেরা ততই ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। মাও হেসে হেসে বলেন, 'মেশিন আর কি! তোমরা যতটুকু চালাইয়া নেও চলে, আবার বন্ধ হইয়া যায়।'

শাহবাগের নিকটেই শিখদের আখড়ায় এসেছেন শ্রীমা, ভাব-সমাধি হলো সেখানে। আবার একদিন এক মুসলমান বেগমের অনুরোধে কবরভূমিতে এসে নামাজ পড়লেন। মা ভক্তদের বললেন, 'হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য জাতি সবাই তো এক। একজনাকেই তো সবাই চায়। সকলে তাঁকেই তো ডাকে। নামাজও যা কীর্তনও তো তাই।' আবার বলছেন, 'আমি দেখছি জগৎময় একটি বাগান, তোরা এই বাগানের ফুলের মতো চারিদিকে ফুটে রয়েছিস। আমি এই একই বাগানের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাত্র।'

আবার একদিন শাহবাগের বাগান-বাড়ীতে সংসারী ভক্তদের সঙ্গে গল্প করছেন। তাদের ছোট ছোট নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে মা বলছেন, 'বদ্ধ জীব সংসারে মত্ত। তারা ভগবানকে চায় না, পেলেও সহ্য করতে পারে না। তাদের রুচিতে বিষয়সুখই প্রিয়তর। বিষয় ছাড়তে হলে তারা অসন্তুষ্ট।' একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝাচ্ছেন।

"শ্রীভগবানের আদেশে একদিন নারদ মর্ত্যধামে অবতরণ করে এক শূকরীকে বৈকুণ্ঠবাসের নিমন্ত্রণ করলেন। শূকরী তার স্বামীকে এই সমাচার জানিয়ে বললো, 'চলো না দিন কতক চেঞ্জে ঘুরে আসি।' তার স্বামী বললো, 'বৈকুণ্ঠে খাদ্যদ্রব্য কি রকম পাওয়া যাবে সেটা তো নিশ্চিত করে জানা দরকার প্রথমে।'

তখন তারা নারদকে খাদ্যদ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে নারদ বললেন, 'বৈকুণ্ঠে কারও কোনো চিন্তা নেই। তোমরা স্বয়ং যে নারায়ণের অতিথি। তোমাদের অন্নচিন্তা থাকবে এ একটা কথা! চলো আমার সঙ্গে। তোমরা মহানন্দে থাকবে বৈকুণ্ঠে। সেখানে সব কিছু সুন্দর। সব কিছু পবিত্র।' তখন বরাহপ্রবর জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাদের প্রিয় খাদ্য বিষ্ঠা নিত্য পাবো তো?' নারদকে স্বীকার করতে হলো উক্ত বস্তু বৈকুণ্ঠে দুর্লভ।

তৎক্ষণাৎ বরাহদম্পতি নারায়ণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো।”

গল্পটি শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। মাও হাসতে লাগলেন।

আবার একদিন মায়ের কাছে অভিযোগ এসেছে, সর্বদাই ভীড় গোলমাল, মাকে নির্জনে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তরে মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

‘এক ভদ্রলোকের হাট থেকে কিছু জিনিষপত্র কেনা দরকার। হাটের কাছাকাছি গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন ভীষণ গোলমাল। ভাবলেন এত ভীড়ের ভিতর যাওয়ার দরকার নেই। গোলমাল চুকে যাক তারপর যাবো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গোলমাল থামলো। ভদ্রলোক হাটে ঢুকলেন এবং দেখলেন গোলও নেই, মালও সব উঠে গেছে।’

গল্প শেষ করেই মা আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

‘ধৈর্য ধরে সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সময় হলে শুকনো পাতাগুলি আপনা হতে ঝরে গিয়ে নূতন পাতা দেখা দেবে।’

শ্রীমা বলছেন—ভক্তদের ঢাকায়, শাহবাগে। আবার সাধনার চরম অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন ভক্তপ্রবর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী)কে।

“চিত্ত-সমাধান কতকটা শুষ্ক কাষ্ঠে আগুন জ্বালানোর মত। ভিজা কাঠ হতে জল শুকিয়ে গেলে যেমন ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলতে থাকে, সেই রকম উপাসনার ঐকান্তিতায় বাসনা কামনার রস যখন চিত্ত হতে কমে যায়, তখন চিত্ত হালকা হয়ে পড়ে। সেই অবস্থাকে বলে ভাবশুদ্ধি। এই অবস্থায়ই ভাবোন্মাদনা জন্মে।

এর পরের ভূমি হলো ভাব-সমাধান। যেমন পোড়ানো কাঠকয়লা। একই সত্তার এক অখণ্ড ভাবের তন্ময়তায় শরীর অবশ হয়ে পড়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধক জড়ভাবে কাটিয়ে দেয়, অথচ অন্তরের গুহায় ভাব-প্রবাহ চলতে থাকে অক্ষুণ্ন। যেমন একটি আধারে আয়তনের অধিক জল ঢালতে গেলে তা পূর্ণ হয়ে অতিরিক্ত জল উপচে পড়ে যায়, তেমনি অখণ্ড ভাবের দ্যোতনায় চিত্ত ছাপিয়ে তার ভাবাবেগ বিশ্বময় বিরাট স্বরূপ বিগলিত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ভূমির নাম ব্যক্ত সমাধান। যেমন জ্বলন্ত কয়লা। ভিতরে বাইরে একেবারে অগ্নিদীপ্তি। জীব এই অবস্থায় এক সত্তাতে স্থিরভাবে বিরাজ করে।

আর পূর্ণ-সমাধান অবস্থায় সাধকের সগুণ নিগু‍র্ণের দ্বন্দ্ব চলে যায়। যেমন জ্বলন্ত কয়লার ভস্মের আগুন। সাধক এই অবস্থায় এক অনির্বচনীয় ভাবে স্থির হয়ে যায়। অন্তরে বাইরে কোন ভেদাভেদ থাকে না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' অবস্থা। সকল ভাবের স্পন্দন এই অবস্থায় অস্তমিত হয়ে পড়ে।"

আবার মা বলতে লাগলেন সাধকের লক্ষণাদি সম্বন্ধে ভাইজীকে। সহজ করে সরল ভাষায়। 'যখন সাধক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কতকটা উন্নত হয় তখন সে সাময়িক ভাবে কখনো বালকবৎ, পিশাচ বা জড়বৎ হয়ে পড়ে। কখনো সে সাধারণ লৌকিক ভাবের উচ্ছ্বাসের ভিতর থাকে। কিন্তু এই সকল সাময়িক পরিবর্তনের ভিতরও, তার চিত্তের একমুখী গতি লক্ষ্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকে।

কর্মবলে যে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে, তার সকল ব্যবহার ঐ এক লক্ষ্য আশ্রয়েই প্রকাশ পায়। প্রায়ই দেখা যায় যে জড়বৎ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে পড়ে রয়েছে। কি জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় সকল ভাবেই সে যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি। ক্রমশঃ আরও একটি সময় আসে যখন চলাফেরা, শোওয়া বসা, সকল লোক-ব্যবহারে সে যেন এক মহা-আনন্দের পুতুল। তখন ভিতরে বাইরে এক অপূর্ব আনন্দসত্তায় পরিণত হয়ে যায়।

এরপর তার এমন একটা অবস্থা আসে যখন আর তাকে লৌকিক বুদ্ধি-বিচার দ্বারা ধরা যায় না। এইরূপ অবস্থায় তার দেহের সকল স্পন্দন হয়ে পড়ে স্থগিত। সর্বাবস্থায় তখন সে অপরিবর্তিত থাকে। দেহধারী বলে আমরা তাকে দেহীর মত পরিবর্তনশীল মনে করি মাত্র।

আর যোগবলে যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁদের সঙ্গে সাধারণ সাধকের তফাৎ হলো, যোগীদের ইচ্ছায়ই প্রাণবায়ুর অবসান হয়ে থাকে। যাঁদের মহাযোগ বা নির্বিকল্প সমাধিতে দেহপাত হয়, তাদের স্বকৃত কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব পূর্ব সাধন সঞ্চিত কর্মযোগের অবসানে তাঁদের দেহপাত আপনা আপনিই ঘটে যায়। তাঁদের জন্ম মৃত্যুর কোন সংস্কারও থাকে না।'

তত্ত্বকথা বলতে বলতেই মা ভাবস্থ হলেন।

*　　　*　　　*

প্রকৃতিই মায়ারূপে জগৎ সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে। সংসারবন্ধনই মায়ার বন্ধন। মায়া মানুষের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। আবার এই মায়ার বন্ধনের মধ্যে থেকে মানুষ সুখের অন্বেষণ করছে। অথও শান্তির কামনা করছে। জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক মানুষ তো জানেই যে সে বন্দী। তবে কেমন করে সে অতিক্রম করবে এই মায়ার বন্ধন? মা বলছেন, 'বন্ধন জ্বালা অসহ্য হলেই মুক্তির পথ পাওয়া যায়। মায়ার বন্ধন টুটে যায়।' এই প্রসঙ্গে শ্রীমা একটি গল্প বললেন ভক্তদের।

"এক ছিল রাজা। সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। দেশ জুড়ে ছিল তার সুনাম। আর ক্রোশ জুড়ে ছিল তার সোনার রাজপুরী। তবুও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। মানসিক অশান্তি নিয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। লোকমুখে শুনলেন গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায়। তাই তিনি খোঁজ করতে লাগলেন কুলগুরুর। এতদিন কুল-গুরুর কোন খোঁজ ছিল না, গুরু অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। রাজা স্মরণ করেছেন জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। গুরু এসে রাজাকে আশ্বাস দিলেন মন্ত্র নিয়ে জপ তপ করলেই শান্তি পাওয়া যাবে। তারপর এক শুভদিনে রাজাকে মন্ত্র দিলেন। রাজার আশ্রয়ে থেকে গুরুর আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হলো।

দিন মাস বছরও ঘুরে এলো। রাজা নিয়মিত জপ তপ করছেন। কিন্তু কোথায় শান্তি? শান্তি পাচ্ছেন না রাজা। আবার ডাক পড়লো গুরুর। রাজা বললেন গুরুকে, 'আপনার কথামতো মন্ত্র নিয়েছি। যথারীতি জপতপ করছি, কিন্তু শান্তি তো পাচ্ছি না। আপনাকে সাতদিন সময় দিলাম। যদি এর মধ্যে শান্তির পথ বলে দিতে পারেন তবেই নিস্তার। নইলে আপনার পরিবারস্থ সকলেরই প্রাণদণ্ড হবে।'

মহাসমস্যায় পড়লেন গুরুদেব। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না। আহার নিদ্রা বন্ধ হলো। আসন্ন মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। গুরুদেবের ছিল একটি মাত্র পুত্রসন্তান। সেও মূর্খ, লেখাপড়া শেখেনি। সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। শুধু খাবার সময় বাড়ী ফেরে। এদিকে একদিন একদিন করে ছয়দিন অতিক্রান্ত হলো। সাতদিনের দিন গুরুদেবের বাড়ীতে আর রান্না খাওয়ার কোনরূপ আয়োজনই হলো না। দুশ্চিন্তায় গুরু ও তাঁর স্ত্রী অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রইলেন। এদিকে দুর্দান্ত ছেলেটি বাড়ী

ফিরে দেখে রান্না খাওয়ার কোন ব্যাপারই নেই। বাপ মা গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় নীরব হয়ে রয়েছেন।

ছেলেটি রাগবে কি, বাপ মার ঐ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো 'তোমাদের হয়েছে কি বলতো? রান্না খাওয়া বন্ধ করে এমনভাবে রয়েছো কেন?'

মূর্খ অবাধ্য পুত্র তাই এতদিন বাপ-মা কিছুই বলেন নি ছেলেকে। আজ মৃত্যু আসন্ন দেখে পিতা পুত্রকে সব কিছুই খুলে বললেন।

সব কিছু শুনে ছেলেটি তো হেসেই অস্থির। হাসতে হাসতে বললো, এই জন্য তোমাদের এত দুশ্চিন্তা? এতদিন আমায় বলো নি কেন? আগামী কাল আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চলো, আমিই ওঁকে শান্তির পথ বলে দেবো।' ছেলের কথায় বাপ মা উঠে রান্না খাওয়ার আয়োজন করলেন। তবুও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। পাগল ছেলে যে!

পরদিন রাজগুরু মূর্খ দুর্দান্ত ছেলের হাত ধরে রাজসভায় এসে হাজির হলেন। এবং নিজ পুত্রকে দেখিয়ে বললেন—'মহারাজ আমার এই পুত্রই আপনাকে শান্তির পথ বলে দেবে।'

এবারে রাজা বিদ্রূপের হাসি হেসে গুরুপুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, 'পারবে? আমাকে শান্তির পথ বলে দিতে পারবে তো? নইলে কি শাস্তি পাবে জানো নিশ্চয়?'

প্রত্যুত্তরে গুরুপুত্র নির্ভয়ে বললো, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমি আপনাকে শান্তির পথ বলে দিতে পারবো। তবে আপনাকে আমার কথামতো এখনই একটা কাজ করতে হবে।'

রাজা গুরুপুত্রের সাহস ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'বেশ, বলো তোমার অভিরুচি। আমি তোমার নির্দেশমতই কাজ করবো।'

গুরুপুত্র বললো, 'এখনই আমাদের তিনজনকে গভীর জঙ্গলে যেতে হবে। সেখানে আমি, আমার পিতা ও আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। এবং আমার কাজে কোনরূপ বাধা দিতে পারবেন না।'

রাজা কৌতূহলবশতঃ বললেন, 'বেশ তো, চলো। তখনই রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন বনে যাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য।'

অবশেষে তারা তিনজনে গভীর বনে এসে উপস্থিত হলেন। এবারে গুরুপুত্র রাজা ও নিজ পিতাকে দুটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেললো শক্ত করে। তারপর নিজে একটি গাছের ডালে বসে দু পা দুলিয়ে মহানন্দে গান

রাজা গুরুপুত্রের এই পাগলামী দেখে আর বন্ধনজ্বালায় অস্থির হয়ে আদেশ করলেন মুক্ত করে দেবার জন্য।

কিন্তু গুরুপুত্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আরও দ্বিগুণ স্বরে গান করতে লাগলো। রাজা তখন আদেশ করলেন গুরুকে বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য।

গুরু কাতর কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ আমি নিজেই যে আবদ্ধ, আপনাকে কেমন করে মুক্ত করবো ?' গুরুর এই ছোট্ট উত্তরটি শুনে রাজার চোখ খুলে গেল। অকস্মাৎ দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। ভাবলেন, তাইতো বন্ধনের মধ্যে থেকে শান্তির আশা করি কি করে ? আর যিনি নিজেই বদ্ধ তিনিই বা আমাকে কেমন করে মুক্ত করবেন ? আমি রাজত্ব করে বিষয়জালে আবদ্ধ হয়ে শান্তির আশা করছি। মুক্তি কামনা করছি। আমার মত মূর্খ কে ?

রাজা এবার ধীর কণ্ঠে গুরুপুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বৎস ! তুমি মূর্খ হলেও জ্ঞানী। অশেষ ধন্যবাদ তোমায়। এখন আমি শান্তির পথ দেখতে পেয়েছি। তুমি আমায় এই সাময়িক বন্ধন থেকে মুক্ত করো।'

গুরুপুত্র এবারে পিতা ও রাজাকে মুক্ত করে, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

রাজা তখন দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে গুরুর জ্ঞানী পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা রাজধানীতে ফিরে যান। আমি আর বিষয়ের সংসারে ফিরে বন্দী জীবন যাপন করব না।' সত্যি সত্যিই রাজা সন্ন্যাসী হয়ে তাঁরই সন্ধানে যাত্রা করলেন যাঁকে জানলে সব কিছু জানা যায়, আর যাঁকে পেলে সব কিছু পাওয়া যায়।"

আনন্দময়ী মা গল্প শেষে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই মুক্তিলাভের জন্য সকলকে সংসার ছেড়ে বনে জঙ্গলে যেতে এ শরীর বলছে না। এই সংসারে থেকেই সংসার ত্যাগ করতে হয়। সংসার তাদের কাছেই তাপময়, যারা সংকে সার করেছে। আর যারা জানে আমরা সং সেজে আছি মাত্র, আমাদের প্রকৃত রূপটা এটা নয়, সংসার তাদের তাপ দিতে পারে না। ত্রিতাপ জ্বালা এড়াইবার জন্যই তপস্যা করিতে হয়। তপস্যা মানে এ শরীর বলে তাপ সহা। এক তাপ দিয়েই আর এক তাপ নষ্ট করা যায়। শুদ্ধ বন্ধন নিলেই অশুদ্ধ বন্ধন কেটে যায়। পরে সবই চলে যায়, সর্ব বস্তুতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।'

'স্ত্রী পুত্র সন্তান সন্ততি পিতা মাতা সকলের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করো। এই জগৎ যে ঈশ্বরপূর্ণ। তোমার দুর্বল মনের উপর স্থাপিত জগতের ধারণা ত্যাগ করো। তাহলেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হবে। অখণ্ড শান্তিলাভ করতে পারবে। যতক্ষণ বন্ধনের জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে ততক্ষণ বন্ধন আছে। এই বুদ্ধি চলে গেলে কর্মবন্ধন দূর হয়। সবই তো ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে। তা অনুভব করতে পারলেই মুক্তি।'

১৮

ইংরেজী ১৯২৭ সাল। বাংলা ১৩৩৩ সনের ফাল্গুন মাস। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। কুম্ভযোগে পুণ্য স্নান। তখন সূর্য মেষরাশিতে, বৃহস্পতি কুম্ভ-রাশিতে অবস্থান করে।

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভো নাম তদোত্তমঃ॥

পুরাকালে, সত্যযুগে সুর ও অসুরগণ অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। দেবতা ও অসুরের সেই সমুদ্রমন্থনে নানারকমের ধনরত্ন উঠতে উঠতে লক্ষ্মীদেবী উঠলেন। সেই অপরূপা লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। কে পাবে ভাগে। এমন সময় উঠলো এক ভাঁড় অমৃত। অমৃত আর অসুরেরা চিনবে কি করে? তারা তখনও লক্ষ্মীদেবীর মোহে মোহাচ্ছন্ন। দেবরাজ ইন্দ্র অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি অমৃতের ভাঁড় দিলেন পুত্র জয়ন্তর হাতে। ইশারা করলেন পালাতে। জয়ন্তও ছুটলো ভাঁড় হাতে নিয়ে। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য অমৃত দেখে চীৎকার করে উঠলেন। অসুরদের সচেতন করে দিয়ে বললেন, 'ওরে মূর্খ ধর, ধর, অমৃত নিয়ে পালালো যে। অসুরেরা তখন বুঝতে পেরে ছুটলো জয়ন্তর পিছু পিছু। জয়ন্তও ছোটেন প্রাণপণে। জয়ন্তও ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিন দিন একভাবে ছুটে এক জায়গায় ভাঁড় রেখে একটু বিশ্রাম করে নিলেন। আবার তিন দিন পর ভাঁড় নামান হাত থেকে। এইভাবে তিন দিন পর পর চার জায়গায় জয়ন্ত ভাঁড় নামান। সেই চার জায়গা হলো, হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী। আমাদের এক বছর দেবতাদের

একদিন। তাই তিন বছর পর পর এই সব জায়গায় হয় কুম্ভযোগ। বারো বছর পর হয় পূর্ণ কুম্ভ।—মহাকুম্ভের যোগস্নান। আনন্দময়ী মা'ও ভক্তবৃন্দ সহ চললেন হরিদ্বারে, অমৃত কুম্ভে। কাশী হয়ে যাবেন। ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে উঠলেন ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের একটি খালি বাড়ীতে। রাজা জানকীনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত। মাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে নামগান-কীর্তন হলো। কীর্তনে মায়ের ভাবাবেশ হলো।

শাহবাগের নবাবজাদী প্যারীবানুও তখন কলকাতায় ছিলেন। তাঁর গৃহেও মা এলেন। সেখানেও নামগানের ব্যবস্থা হলো। প্যারীবানু মুসলমান হয়েও মায়ের প্রভাবে পুত্র কন্যাসহ হরিনাম করলেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য। মা আনন্দময়ী যেন কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানে স্বয়ং আত্মহারা হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপনার জন-মানুষকে সেই সুধারস পান করাবার জন্য ব্রতী হয়েছেন।

কলকাতা থেকে কাশীধাম হয়ে হরিদ্বারে এলেন। উঠলেন ধর্মশালায়। তারপর ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে যোগস্নান করলেন। সচন্দন পুষ্প আর পুষ্প-মালা দ্বারা অর্চিত হয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করলেন সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। ঢাকার মা—ঢাকা কলকাতা বঙ্গভূমির পরিধি ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালী মাতাজী আনন্দময়ী মা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। আনন্দময়ী মার জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে শুধুমাত্র জনসাধারণ নয়, সাধু সন্তরাও মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে জগজ্জননীরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে লাগলেন। অবশেষে হৃষিকেশ লছমনঝোলায় লীলা করে মা এলেন বৃন্দাবনে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শন মানসে। বৃন্দাবন প্রেমসরোবর শ্রীরাধা-শ্যামের লীলাস্থল। লীলায় ছাওয়া এই বৃন্দাবন। সেই যমুনাপুলিন! যেখানে কৃষ্ণ পুলিন বিহার করেছিলেন। সেই কেলিকদম্ব! যে গাছে উঠে কৃষ্ণ কালিয়দহে ঝাঁপ দেন। নিধুবন, নিকুঞ্জবন, রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থল।

শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন নয়ন-মনঃ প্রাণহর।
বৃন্দাবন-বিমলচন্দ্র মধুর মধুর মুরলীধর॥

* * *

বৃন্দাবন ধাম জ্যোতির্ময়,
শীতল কিরণকর কল্পতরু গুণধর

ষড়ঋতু সদাকাল রয়।

পূর্ণচন্দ্র সমজ্যোতি   চিদানন্দময়ী যুথী

দরশনে মহানন্দ শোভা।

গোবিন্দ আনন্দময়   নিকটে বনিতাচয়

বিহরে মধুর মনোলোভা।

ব্রজপুরবনিতার   চরণ শরণসার

কর মন একান্ত হইয়া।

অন্য বোল গণ্ডগোল   নাহি শুন উতরোল

লহ প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া।

সেই লীলা-বৃন্দাবনের রসমাধুর্যে অবগাহন করতে লাগলেন লীলাময়ী মা আনন্দময়ী। কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। ভাব-বিহ্বল হয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। বৃন্দাবনের সেই মাঠ, সেই গাছপালা, সেই যমুনাপুলিন, হরিণ ময়ুর ময়ুরী সব কিছুই আছে। শুধু নেই কৃষ্ণ। ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে ভক্তপ্রাণের মহিমা। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সর্বাঙ্গে মেখেছিলেন এই ব্রজের ধূলি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ব্রজের ধূলি সর্বাঙ্গে মেখে উন্মত্তের মত কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে ছুটে গিয়েছিলেন যমুনা পুলিনে। আজ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মারও সেই ভাব, ভাবোন্মাদনা। আনন্দময়ী রাই কমলিনী। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী ব্রজগোপিনীর ভাব। কৃষ্ণচিন্তানিরতা শ্রীমতীর ভাব। মধুর ভাবের সর্বস্বত্বাধিকারিণী শ্রীরাধারাণীর ভাব।

মথুরাতে এসে মা দেখলেন মথুরানাথকে। রাখাল রাজা কৃষ্ণকে।

ধ্রুবঘাট—বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে এইখান হতে পার হয়েছিলেন।

গিরি-গোবর্ধন, মানস গঙ্গা, পাশাপাশি দুই কুণ্ড—শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড। চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী উদ্ধার করতে এসে এখানকার মাটি নিয়ে তিলক কাটলেন কপালে। শ্রীশ্রীমাও তিলক কাটলেন কপালে। রাধাকৃষ্ণ সখীদের নিয়ে কুণ্ডে জলকেলি করতেন। কুঞ্জে কুঞ্জে দোল খেতেন। কোথাও শিঙ্গার। কোথাও করতেন বিশ্রাম।

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘেরা শ্রীবৃন্দাবন, কত কুঞ্জ। আবার কত মঞ্জরী।

উত্তরে মদনসুখদা নাম ললিতার কুঞ্জ॥

কত কত কল্পতরু বিচিত্র কানন।

নানা পুষ্পলতা তাহে করয়ে শোভন॥

শ্রীকুণ্ডের ঈশানে বিশাখার কুঞ্জ।
নানা পুষ্প তরুলতা ফুল ফুল পুঞ্জ॥
বিশাখানন্দদা নাম কৃষ্ণের রাসস্থলী
তাতে কৃষ্ণচন্দ্র করে বহু রাসকেলী॥

... .

মদন আলসেতে শুইলা দুইজন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে চরণ সেবন॥
শ্রীরতি মঞ্জরী করে চামর বাতাস।
উথলিল কত শত রসের বিলাস।

* * *

আবার কত সখী! নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী। যুগল কিশোরের প্রীতি সম্পাদনই যে সখীগণের একমাত্র সাধ। তাইতো সখীগণ যুগল মিলনে নানা প্রকারের সাহায্য করেছেন। আনন্দময়ী মাও আজ সেই যুগল মিলনে সাহায্য করে ধন্য হতে চাইছেন। ব্রজধামের রসসিন্ধু মুরলীধর শ্যামসুন্দরের লীলামাধুর্য পান করছেন আজ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। শ্রীগৌরসুন্দরের মত রাধাভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন। ঢুলু ঢুলু আঁখি। গুণ গুণ স্বরে কৃষ্ণ গুণগান করছেন। যেন তার মনভৃঙ্গ শ্যামরস পানে মত্ত হয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধাম
ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণ।

আনন্দময়ী মা সেই রসস্বরূপ দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর লীলামাধুর্যের সংস্পর্শ অন্তরে লাভ করে, কৃষ্ণপ্রেমের স্নিগ্ধ এবং সরস স্পর্শে ভক্তদের বুক ভরিয়ে প্রাণে এনে দিলেন শান্তি। মর্ত্তজীবনেই ভগবানের নিজ ভাবটি আস্বাদনের অধিকারী করে তুললেন।

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া কোন ভাগ্যবান জীব
গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ'।

... ...

গোবিন্দ ভজন সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
বৃন্দাবন ধাম জ্যোতির্ময়।

* * *

এইভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল মথুরা বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করে আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দ সহ আবার ফিরে এলেন ঢাকায়, শাহবাগে। লীলাময়ী মা

কৃষ্ণকীর্তনে মেতে উঠলেন। নিজেও মাতলেন, ভক্তদেরও মাতালেন। আনন্দময়ী মা নন, এ যেন স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আনন্দময়ী মা রূপে আবির্ভূত হয়ে লীলা করছেন।

১৫

"আকুলভাবেই পূজার্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবণ, চেষ্টার দ্বারা সেই শক্তিকে জাগ্রত করা মানুষেরই কাজ।" শ্রীশ্রীমা বলছেন ভাইজীকে, ঢাকায়। ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) তখন খুবই অসুস্থ। প্রতিদিনই মা তাঁকে একবার দর্শন দেন এবং প্রসাদ পাঠান। জ্যোতিষচন্দ্রের প্রাণের আকুতি দেখে কৃপাময়ী মা এই কথা বললেন। আবার একদিন মা, গুরুপ্রিয়াদেবী ও ভোলানাথ সহ কলকাতায় চলে এলেন নবাবজাদী প্যারী-বানুর পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে। নবাবজাদী মাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি ভক্তিও করেন। একদিন কীর্তনের বন্দোবস্তও করলেন। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবী। কীর্তনের আসরে আনন্দময়ী মা বসে আছেন। পরিধানে লালপেড়ে শাড়ী। কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা। স্থূলদেহধারী মা নন, যেন দেবী ভগবতী মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণা হয়েছেন। এমনই অনির্বচনীয় মাধুর্য ফুটে উঠেছিল আনন্দময়ী মার মুখমণ্ডলে।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাসন্তীদেবী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন আনন্দময়ী মার মুখের দিকে। দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না, কেমন যেন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে বাসন্তীদেবীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "অনেক দিনের কথা—আমার ঠিক মনে নেই, তবে এই

* শ্রীশ্রীমা কলকাতায় প্রথম এসে অবস্থান করেন নবাবজাদী প্যারীবানুর গৃহে এবং ঢাকার সাবজজ্ ভক্তপ্রবর প্রাণকুমার বসুর জামাতা ভক্ত শ্রীসতীশ-চন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র গুহের বালীগঞ্জের বাড়ীতে। কলিকাতার ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতেও অবস্থান করতেন।

মূর্তিই যেন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমাকে বললেন—'তুমি সাবধান হও, তোমার ভয়ানক বিপদ আসছে।' এই স্বপ্নাদেশের কিছু দিনের মধ্যেই সত্য সত্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোক গমন করেন।"

বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাসন্তীদেবী আনন্দময়ী মাকে কোলে নিয়ে বসলেন। কীর্তন শুরু হলো। অপর্ণাদেবীও ভজন শোনালেন শ্রীশ্রীমাকে। ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ীর ভাবাবেশ হল। মা আনন্দময়ী ভাবানন্দে বিভোর হয়ে হিন্দু মুসলমান ছোট বড় সকলকেই নামামৃত পান করাচ্ছেন। নামকীর্তনে কোন জাতিভেদ নেই। শ্রীশ্রীহরির নামসঙ্কীর্তনে সকলের জন্য দ্বার যে অবারিত। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে মা যেন বলছেন :

সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন,
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার,
তাঁহার কৃপাতে হয় সাক্ষাৎ তাঁহার।

এইভাবে কলকাতায় লীলা করে মা আবার একদিন ফিরে এলেন ঢাকায়। কিন্তু মা আজকাল ঢাকায় স্থির হয়ে বসছেন না। একদিন হঠাৎ বেরিয়ে পড়লেন কামাখ্যার পথে। কামাখ্যাতে এসে ভাবাবেশে মা দর্শন করলেন অসংখ্য দেবদেবী আর মহা তপস্বী মুনি ঋষিদের। এই কামাখ্যা পাহাড়েই একদিন শ্রীবাবা ভোলানাথ সহধর্মিণী আনন্দময়ী মাকে মহাদেবী-রূপে দর্শন করে অভিভূত হলেন এবং ফুল বেলপাতা দিয়ে দেবীরূপে পূজা করলেন। যে ঘরে পূজা হল সেই ঘরের বারান্দার কিছুটা দূরে বলি হল। বাবা ভোলানাথই বলি দিলেন। পূজার সময় মা সমাধিস্থ ছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে মা বললেন, "বলির রক্তের ফোঁটা এ শরীরে লেগেছে।" ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হলেন। কারণ এতটা দূর থেকে রক্ত লাগার কথা নয়, কিন্তু মহাকালী মহাদেবীর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ভক্তজনপরিবৃতা হয়ে শ্রীশ্রীমা কামাখ্যা পাহাড়ে কিছুদিন অতিবাহিত করে ফিরে চললেন ঢাকায়। লামডিং দিয়ে ফিরোজপুর বাইসারী টাঙ্গাইল হয়ে ফিরলেন। পূর্ববঙ্গের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে কৃষ্ণকীর্তনে মুখরিত করে তুললেন চতুর্দিক। সুপ্তপ্রায় প্রাণহীন গ্রামের মানুষদের নামামৃত পান করিয়ে সঞ্জীবিত করে তুললেন। আর বৈষ্ণব ভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে এনে দিলেন প্রাণচাঞ্চল্য। ধর্মজগতের তত্ত্বকঠিন ভাবনাকে নামগানের মধ্য দিয়ে সরস করে তুললেন। অনির্বচনীয় এক আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত করে দিলেন গ্রামের মানুষদের

অন্তর্জগতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় ফিরে মা এসে উঠলেন 'উত্তমা কুটীরে', ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর নিকটে। এখানে কালীবিগ্রহও আনা হয়েছে। গৃহ নয় যেন মন্দির। এখন মা যেখানেই অবস্থান করছেন, সেই গৃহ বা স্থানই যেন মাতৃমন্দিরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখানেই টাকীর সূর্যকান্তবাবু পুত্রবিয়োগে কাতর হয়ে সপরিবারে এসে মাকে দর্শন করে মানসিক শান্তি লাভ করেন। এলেন মহাযোগী শ্রীশ্রীরামঠাকুর। শ্রীশ্রীমায়ের ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করে দেবী ভাগবতী বলে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানালেন। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাও প্রতিনমস্কার জানালেন যোগীশ্বর শ্রীরামঠাকুরকে।

*　　*　　*

ইংরাজী ১৯২৯ সন। বাংলা ১৩৩৫ সাল। বৈশাখ মাস। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীমার প্রথম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান শুরু হল। কাশী কলকাতা ও ঢাকার ভক্তমণ্ডলী একত্রিত হলেন। শুরু হল নামগান। অখণ্ড নাম সংকীর্তন। কর্মীবৃন্দের মধ্যে আছেন যুবক কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী, যোগেশ ব্রহ্মচারী, অতুল ব্রহ্মচারী ও জটুভাই। জন্মতিথিতে বাবা ভোলানাথই শ্রীমাকে পূজা করবেন স্থির হল। শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃদেব বিপিনবিহারীও উপস্থিত আছেন।

এই সময়ে বরিশালের বিপ্লবী হিমাংশু বসুরায় আনন্দময়ী মাকে দর্শন করে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেন এবং পরবর্তী জীবনে কালাচাঁদ ব্রহ্মচারী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নিমাই সন্ন্যাস, মানভঞ্জন, মাথুর প্রভৃতি কীর্তন গান করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর করে তুললেন। আনন্দময়ী মাও স্থিরভাবে বসে কীর্তন শুনতে লাগলেন। ভাইজী রচিত মাতৃবন্দনা সঙ্গীতও ভক্তরা মুখর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মা ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভাব-সমাধি। মধ্যরাত্রিতে ভোলানাথ পূজায় বসলেন। মহাকালী শ্রীআনন্দময়ী মা'র পূজা ষোড়শোপচারে। ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ হয়ে সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখে অভিভূত হল। এ যে জীবন্ত কালীর পূজা। এমন পূজা তারা জীবনে দেখে নি। পূজার সময় মা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। পূজা শেষ হতে আকাশে উষার আলো ফুটে উঠলো। মাও ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থা হলেন। তখন শ্রীশ্রীমার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো এক অলৌকিক মাধুর্য।

প্রভাতকীর্তনে মেতে উঠলো সকলে। অনির্বচনীয় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হল। সিদ্ধেশ্বরীর কালীও নন, আনন্দময়ী মাও নন। যেন নিত্য বৃন্দাবনের হ্লাদিনী শক্তির জীবন্ত বিগ্রহ মূর্ত হয়ে উঠেছে আনন্দময়ী মার মধ্য দিয়ে। বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীরাধাই আমাদের আনন্দময়ী মা। ভক্তপ্রাণ বাউলবাবু ফুলের সাজে সাজালেন মাকে। মাথায় দিলেন ফুলের মুকুট, হাতে পায়ে সর্বশরীরে পরিয়ে দিলেন ফুলের গহনা, গলায় দিলেন ফুলের মালা। অপরূপ সাজে সজ্জিত হলেন আনন্দময়ী মা। মার সেই রূপ নয়নগোচর করে ভক্তদের কখনও মনে হচ্ছে অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীশ্যামসুন্দর, আবার মনে হচ্ছে মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধারাণী। কোন ভক্ত দেখছেন রাধা বিরহের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে। আবার কেউ দেখছেন প্রেমময় তৃষ্ণা ঘনীভূত গোপীতনুরূপে, আবার কোন কোন ভক্ত ভাবছেন মহাকালী—মহাদেবীই নানা রূপ ধরে লীলা করছেন। সিদ্ধেশ্বরীর কালী ও আনন্দময়ী মা এক ও অভিন্ন। কিন্তু মা বলেন, "তোমরা যাহাই মনে করো, এ শরীরটা তাহাই, একই তো আছে, দুই তো নাই।"

আনন্দময়ী মার পিতৃদেব আপনভোলা মানুষ বিপিনবিহারীও কৃষ্ণকীর্তনে মেতে উঠলেন। নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন। মা আনন্দময়ী তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। বিপিনবিহারী গেয়ে উঠলেন—

হরিনামের মালা নিতাই দিল আমার গলে,
হরিনাম মন্ত্র দিল স্নান করায়ে গঙ্গাজলে।

তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চললো ভক্তের প্রাণে প্রাণে। ভক্তপ্রাণে যে ভাবশক্তির অভাব ছিল তাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চললো অব্যক্ত এক আনন্দলোক অভিমুখে। অন্তর ভরে উঠলো এক অবিস্মরণীয় মাধুরীতে। দুঃখ বেদনা কোন ক্ষুদ্রতার ভাব নেই, মনের কোথাও যেন পড়েনি কোন গ্লানি। শুধু আছে আনন্দ, আনন্দ!

* * *

জগৎ ভরাই তো আশ্রম, নূতন করে আশ্রম করিবি কি? ভাইজী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীশ্রীমা এই কথা বললেন।

—আমি তো বেশী কিছু চাই না, কেবল এমন একটু স্থান চাই, যেখানে আপনার চরণের চারিধারে সবাই মিলে কীর্তন করতে পারি—প্রত্যুত্তরে ভাইজী বললেন। মা সম্মুখীন একটা পুরানো জীর্ণ বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,—যদি এরকম কিছু করিস তবে ওই যে ভাঙ্গা বাড়ীখানি দেখছিস

ওই স্থানই প্রশস্ত। উহা তোদের পুরানো বাড়ী।

শ্রীশ্রীমা যে স্থানের ইঙ্গিত করলেন, সেখানে ছিল একটি শিবমন্দির। বহু প্রাচীন, ভগ্ন অবস্থা। ওই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হল আশ্রম। আর এই হল ঢাকার ভক্তমণ্ডলীর বড় সাধের রমণীয় আশ্রম।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবের খেলা বিচিত্র। কখন কি করেন, কেন করেন, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বাংলা ১৩৩৬ সালের ১৯শে বৈশাখ, ভক্তবৃন্দকে নিয়ে মা কীর্তন সমারোহে নূতন আশ্রমে পদার্পণ করলেন। চতুর্দিকে আনন্দের রোল। মাকে ঘিরে শুরু হল আনন্দ মহোৎসব। নিত্যানন্দময়ী আনন্দময়ী মায়ের উপস্থিতিতে নব প্রতিষ্ঠিত রমণা আশ্রমবাড়ীতে নির্মল আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে চললো। ভক্তপ্রাণ বাউলবাবু মাকে ফুলের সাজে সাজালেন। ফুলের মালা গলায় আর ফুলের মুকুট মস্তকে ধারণ করে মা যেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করলেন। অবশেষে ভাইজী রচিত মাতৃবন্দনা সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন ভক্তরা।

আনন্দ জলধিনীল আনন্দ গগনতল
আনন্দ বায়ু হিল্লোল আনন্দ ভুবনময়।
আনন্দ নিকুঞ্জবনে আনন্দ তটিনী সনে,
আনন্দ মধুপ-গানে হৃদয় পাগল হয়॥
আনন্দে গাহিছে পাখী, আনন্দে নাচিছে শাখী,
আনন্দে মেলিয়া আঁখি সুহাসে প্রসূনচয়।
নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া
ভুলিয়া দুঃখ তুলিয়া বাহু
নাচ আনন্দে প্রেমানন্দে
প্রিয়া সঙ্গে প্রেম রঙ্গে
গাহ মা আনন্দময়ীর জয়॥

মহা মহোৎসবের আনন্দে মেতে রইল ঢাকার রমণার আশ্রমবাড়ী। আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে লাগল আনন্দময়ী নাম ও কৃষ্ণনাম ধ্বনি। মধুর আনন্দময়ী নাম ও কৃষ্ণনাম ধ্বনিতে অকস্মাৎ সুধাজ্যোৎস্নায় চারিদিক অলৌকিকভাবে বিভাসিত হয়ে উঠলো। বৃন্দাবনের সকল মাধুরিমাই যেন যুগপৎ প্রকাশিত হল রমণা আশ্রম-মন্দিরে। ঢাকার রমণা আশ্রম নয়—যেন শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমময় শ্রীশ্যামসুন্দর আনন্দময়ী মা-রূপে আবার আবির্ভূতা হয়েছেন।

কিন্তু তখনও কারো মনে এ সম্ভাবনার উদয় হয়নি যে, মিলনোৎসবের এত আনন্দ এত শীঘ্রই হবে বিষাদে পরিণত। পরের দিনও কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তবৃন্দ কীর্তন করতে লাগলেন নামগান, কৃষ্ণগুণগান। মাও ভাবাবেশে বিভোর। ভাববিহ্বলতা। কীর্তনেরও যেমন বিরাম নেই, তেমনি শ্রীশ্রীমার ভাবেরও নেই অন্ত। এক এক সময় এক এক ভাবমূর্তিতে হতে লাগলেন প্রতিভাত। যেন কোন স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহ মায়ের শরীরকে বিগলিত করে করুণাঘন প্রেমঘন করে তুলেছে। শ্রীমায়ের খেয়ালে যখন যে ভাবের খেলা এসে পড়ে, আপনা হতেই তখনি তার অনুরূপ ক্রিয়া তাঁর দেহে সঞ্চারিত হয়ে জীবন্তরূপে প্রকাশ পায়। আনন্দময়ী মার ভাবময় জীবনের ইহাই এক বিশেষত্ব।

অকস্মাৎ একদিন মা ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—তোমরা এ শরীরকে ছেড়ে দাও, আজই এ শরীর ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে, বাধা দিলে শরীর ত্যাগ করেই চলে যাবে। ভক্তবৃন্দ বিস্মিত অভিভূত ও হতবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেমন ছিলেন সেই অবস্থায়ই একবস্ত্রে মা আশ্রম ত্যাগ করলেন। ভোলানাথ ও ভাইজীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন অনির্দিষ্ট অভিযানে। অন্তরের ইঙ্গিতে। ভাইজীর তখন পূর্ণ সংসার—স্ত্রী পুত্র কন্যা ও সরকারী অফিসের উচ্চপদ। ভোলানাথও কর্মরত। কিন্তু এদের কোন ইচ্ছাই মার ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল না। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হল।

*　　　*　　　*

আনন্দময়ী মার আধ্যাত্মিক আকর্ষণী শক্তির বন্যায় ভেসে চললেন ভোলানাথ ও ভাইজী। কোথায় চলেছেন, কেন চলেছেন, কি করণীয় কিছুই ওঁরা জানেন না। অবশেষে মার ইঙ্গিতে কাটিহার, গোরক্ষপুর ও লখ্‌ণৌ হয়ে দেরাদুনে এসে পৌঁছলেন। দেরাদুন শহর থেকে তিন চার মাইল দূরে রাইপুর গ্রামে এক শিবমন্দিরের নিকটস্থ ধর্মশালায় তিনজনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর এই সময়ের জীবনই অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের অধ্যায়। যেন সন্ন্যাসিনী আনন্দময়ী মা। সন্ন্যাসিনীর জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য। এও মায়ের এক খেয়াল। শ্রীশ্রীমার পুণ্য সান্নিধ্যে এসে ভাইজী ও ভোলানাথ কৃচ্ছ্রসাধন করছেন পরম আনন্দে। জ্যোতিষচন্দ্র এখন আর কোট প্যাণ্ট পরিহিত সাহেব নন। পরিধানে আটহাতি মোটা ধুতি। জামা জুতো ব্যবহার করেন না। কম্বল

ও চাদর দিয়েই শরীর রক্ষা করেন। ভোলানাথও সাধন ভজনে মনোনিবেশ করেছেন। খাওয়া কোন দিন বা জোটে, কোন দিন জোটে না। অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় কয়েকজন ধর্মপ্রাণ পরিবার মায়ের সান্নিধ্যে এসে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন এবং ভক্ত হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে আনন্দময়ী মা'র দিব্য আকর্ষণী শক্তির প্রভাব দেরাদুন শহরে ছড়িয়ে পড়লো। আশে পাশের গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আগমন হতে লাগল। এলেন শ্রীযুত হরিরাম যোশী, এলেন জহরলাল নেহেরুর স্ত্রী কমলা নেহেরু। এঁরা এই সময়েই আনন্দময়ী মা'র সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ ও অভিভূত হন এবং বিশিষ্ট মহলে আনন্দময়ী মার নাম প্রচার করেন। মা'র চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব হল, যে মানুষ একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এমনকি সাধু সন্ন্যাসীই হন না কেন, ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। মা বলেন, "এ শরীর ধরতে জানে, ছাড়তে জানে না।"

ইংরাজী ১৯৩৩ সাল। মুসৌরী থেকে মা চলেছেন উত্তর কাশীর পথে। ৬০।৬৫ মাইল পথ। পদব্রজে। ব্রহ্মচারীর বেশ, হাতে দণ্ড, মুখে কৃষ্ণনাম। পেছনে চলেছেন ভক্ত সন্তান জ্যোতিষচন্দ্র। উত্তর পশ্চিম ভারতের মাতৃভক্তদের প্রিয়তম 'ভাইজী'। সন্ন্যাসীর বেশে। আনন্দময়ী মার সমগতিতে। কেউ যে পেছনে আছে এ জ্ঞানও যেন মা'র নেই। এইভাবে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে মা একদিনে অতিক্রম করলেন পঁচিশ মাইল পার্বত্য পথ।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মা চলেছেন কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে। ক্রমে ক্রমে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও মায়ের দৃষ্টির সম্মুখ হতে অপসারিত হলো। চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সজল-জলদাঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দরের জীবন্ত মূর্তি। অপার্থিব আনন্দে আনন্দময় হয়ে উঠলো আনন্দময়ীর দেহ মন আত্মা। অনির্বচনীয় এক প্রেমঘন মূর্তি

ধারণ করলেন আনন্দময়ী মা। এ মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র অশ্রুসরস মহানন্দে নিমগ্ন হলেন। বনভূমি-হিমালয় ও আকাশের দিকে তাকিয়ে পক্ষিকুলকে সম্বোধন করে যেন বললেন, 'হে মধুর ফলবনবিহারী পাখীরা সব তোমরা শোন আনন্দময়ী-মা'র কণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণনাম, যিনি স্বর্গ ছেড়ে এই মর্ত্যে পদার্পণ করেছেন, দুঃখী তাপী মানুষকে ভালবেসে নিজের করে নিয়েছেন, যিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে আমাকে অনুভবময় করে তুলেছেন, সেই ভবভয়নাশিনী প্রেমময়ী আনন্দময়ী-মা'র জয়গান তোমরাও কর।'

পাখীদের কলকূজন শুরু হয়ে যায়। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে সে নামধ্বনির মধুর তরঙ্গ বয়ে চলে। মেঘেরা সরে সরে যায়। সূর্যের আলোকে আবার হিমালয়-অরণ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আলো ছায়ার মধ্য দিয়ে আনন্দময়ী মা পথ করে চলেন। ছুটে আসে পথিপার্শ্বস্থ জনপদের মানুষেরা পুরুষ নারী নির্বিশেষে। এমন ভগবতী তনু তারা জীবনে দেখে নি। অভিভূত হয়ে মাথা লুটিয়ে সকলে প্রণাম করে। অবশেষে প্রাণহরা মা আনন্দময়ী জনপদের মানুষদের প্রাণ হরণ করে, তাদের অন্তরের পূজা গ্রহণ করে এসে উপস্থিত হলেন উত্তর কাশীতে।

মুগ্ধ আত্মহারা জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল দেবী ভগবতী স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন, কে দেখবে ছুটে এসো। সাধু সন্ন্যাসীদেরও কর্ণগোচর হলো মা'র আগমন সংবাদ। কিন্তু স্ত্রীলোক বলে প্রথমে তাঁরা কেউই এলেন না মাকে দর্শন করতে। ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে এসে মহামায়ীর মহাশক্তির দিব্য আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হলো যোগী সন্ন্যাসীদেরও মনোজগতে। আনন্দময়ী মা'র দিব্যশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না হিমালয়ের গিরিকন্দরে তপস্যারত যোগীবৃন্দ। তাঁদের মনোজগতেও সৃষ্টি হলো ভাবান্তরের। যেন এক বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন বিপুল কলোচ্ছ্বাসের মত যোগী তপস্বীর হৃদয়কেও করে ফেললো আচ্ছন্ন। অকস্মাৎ দলে দলে সাধু সন্ন্যাসীরা এসে ভিড় করলেন মাতৃমূর্তি দর্শনের অভিলাষে। শুধু দর্শন নয়, শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীও শুনবেন।

মা বলছেন: লক্ষ্য স্থির হলেই চিত্ত স্থির হবে। নাম করতে করতেই চিত্ত ও লক্ষ্য উভয়ই স্থির হবে। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। ভগবান আসবেন ভগবানকে পাবো এ ধরনের প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান ত রয়েছেনই আমার মধ্যে। আমি তাঁকে পেয়েছি। আমিই ত তিনি। এই

ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও।

ভগবৎপ্রাপ্তির কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধি। জ্ঞানে ও ভাবে গেলেই খুলে যায়— যেখানে গেলে কর্ম কর্মের ইচ্ছা কর্মের ভাব ইচ্ছা অনিচ্ছা সমাপ্ত হয়ে যায়। কর্ম এবং ভাবের সমাধানই সমাধি। এখানে ভাব বলতে ভগবৎ-ভাব বুঝায় না। কারণ ভগবৎ-ভাবের সমাধানের ত কোন অর্থই হয় না। এটা তো সব সময়েই আছে। এখানে ভাব হলো সেই ভাব যা ভগবৎ-স্থিতির বিঘ্ন করে। মনকে করে বহির্মুখ। আর যা কিছু দৃষ্টিতে আসে তাই কর্ম। তোমরা দৃষ্টি সৃষ্টি বলো না? ভাব এবং অভাব দুই-ই এক। আবার যেখানে অনুভব বলা হয় সেখানেও একটা স্থিতি আছে। যোগী ঘরে বসে ধ্যান করছেন, তখন যদি তিনি শূন্য অনুভব করেন, তবে বাইরে থেকে কেউ দেখলে সে ঘর শূন্যই দেখবে। শূন্যের পরে শরীর ধারণ করাও এক যোগক্রিয়া। এই যোগক্রিয়াই ত সাধনা। সব কিছুই ভগবান লাভের জন্য। সাধনা ত অনন্ত। তিনিই সাধনারূপে অনন্ত। তবে কেমন করে আশা করা যায় যে সাধনা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে? এই জন্য তিনি বুদ্ধির ওপারে দুজ্ঞের্য়। আবার সাধনা যদি কেউ তীব্রভাবে করে তবে তাঁর প্রকাশ হতেই হবে। যেমন পাথরে পাথর জোরে ঘষলে আগুন জ্বলবেই।

কর্মেতে ক্রমকৃপা হতে থাকে। ক্রমকৃপা কর্মানুযায়ী। আবার হয় অহৈতুকী কৃপা। ক্রমের স্বরূপ তা নয়। এইজন্যই বলা হয় সাধনা অনন্ত। কাজেই তাঁকে পাওয়ার ঠিকানা কোথায়? এইজন্যই কৃপা। ভগবৎপ্রাপ্তি কৃপাসাপেক্ষ। ধৈর্য ধরে তাঁরই অপেক্ষায় থাকা। ধৈর্যই সাধনার প্রধান অঙ্গ। যার ধৈর্য নাই তার সাধনা নাই। ধর্ম নাই।

দিব্য মাতৃমূর্তি ও মাতৃমুখনিঃসৃত বাণী শুনে সাধুরা তৃপ্ত হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মা হিন্দী ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কথা বলেন। মাঝে মাঝে দু'চারটি ইংরাজী শব্দও ব্যবহার করেন। মধুর মায়ের মধুর কথামৃত।

উত্তর কাশীর লীলা সমাপন করে লীলাময়ী মা আবার ফিরে এলেন ডেরাডুনে। ভাইজী, ভোলানাথ, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত সহ উত্তর কাশীতেই অবস্থান করতে লাগলেন। ভোলানাথ এখানে থেকে সাধন ভজন ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্যে ব্রতী হলেন।

শ্রীশ্রীমা ডেরাডুনে এসে এবার আনন্দচকে অবস্থান করতে লাগলেন। ক্রমশঃ আনন্দচকের মন্দিরে সংসঙ্গের আয়োজন হোল। ভাইজী রচনা

করলেন 'জয় হৃদয়বাসিনী' প্রভৃতি মাতৃভজন। মাতৃনাম ও ভজন কীর্তনের ঝংকারে ডেরাডুন শহর ও শহরতলী মুখরিত হয়ে উঠলো। 'আনন্দময়ী মা' নাম দিকে দিকে প্রচারিত হতে লাগলো। এই সময়ে হরিরাম যোশী মাতৃকৃপা লাভ করে মাতৃভক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও* রচনা করেন। মহাসমারোহে জন্মাষ্টমীর উৎসব পালিত হলো। আবার একদিন শ্রীমতী কমলা নেহেরুর ইচ্ছানুসারে রাজপুরে দুর্গামন্দিরে আনন্দময়ী মার উপস্থিতিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হলো সম্পন্ন।

ডেরাডুন মনোহর মন্দিরেও যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হলো। এই যজ্ঞকুণ্ডের সঙ্গে মায়ের জীবনের একটি অদ্ভুত ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা একদিন শুয়ে আছেন, পাশে বসে আছেন ভাইজী। হঠাৎ একটি কৃষ্ণবর্ণ বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে ঠিক মায়ের সম্মুখে এসে স্থির হয়ে রইলো। ভাইজী চমকে সরে গেলেন। মায়ের কোনরূপ ভাবান্তর হলো না। স্থির দৃষ্টিতে সাপটিকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই সাপটি অন্তর্হিত হলো। পরমুহূর্তেই ভাইজী সাপটিকে অনুসন্ধান করতে উদ্যত হলেন; মা ভাইজীকে নিষেধ করলেন। কৃষ্ণবর্ণ সাপটি যেখানে স্থির হয়ে ছিল মায়ের নির্দেশে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হলো যজ্ঞস্থান, যজ্ঞকুণ্ড, মনোহর মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ড।

রহস্যময়ী মাই জানেন এর ভিতরকার রহস্য কি।

ঢাকার মা, শাহবাগের মা উত্তর পশ্চিম ভারতে এখন 'আনন্দময়ী মা' নামে সুপরিচিতা হয়ে উঠেছেন। আর জ্যোতিষচন্দ্রকে মায়ের ধর্মপুত্র জ্ঞানে 'ভাইজী' বলে সম্বোধন করেন ভক্তবৃন্দ। তাঁরা মাকে যেমন ভক্তি করেন তেমনি ভালবাসেন 'ভাইজী'কে। আর রমণীমোহন! মায়ের দেওয়া 'ভোলানাথ' নামেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন, ভক্তমণ্ডলী ও সাধু সন্ন্যাসী মহলে। ভোলানাথের স্নিগ্ধ ব্যবহারে ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ ও অভিভূত। তাঁর প্রিয় হলো বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

... ...

মা আজকাল মনোহরলালের মন্দিরেই বেশী থাকেন। একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, অপরটিতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। কাশ্মীরী পাঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাটী মারাঠী হিন্দুস্তানী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক এখন

* MA Anandamayee Lila—Memoirs of Hari Ram Joshi.

আনন্দময়ী মা'র ভক্ত হয়ে পড়েছেন। সকলেই মায়ের নামে আত্মহারা এবং দেবীজ্ঞানে ভক্তি করেন। 'আনন্দময়ী মা' নাম এখন বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের গতিতে উত্তর পশ্চিম ভারতকে প্লাবিত করে তুলেছে। মায়ের জন্য লোকের আকুলতা যেমন দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমনি মায়েরও স্নেহধারা বর্ষিত হচ্ছে সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের উপর। মা আদর করে কারো নাম রেখেছেন গোপালজী, আবার কারো নাম বালগোবিন্দ, লছমীরাণী, মীরা, কৌশল্যা ইত্যাদি। নয়ন প্রাণ-হরা আনন্দময়ী মা সকলেরই প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে ডেরাডুনে রাইপুর ও কিষণপুরে মাতৃ-আশ্রম গড়ে উঠলো। ভক্তপ্রবর ভাইজী আশ্রমে 'মা' নামকীর্তনের ব্যবস্থা করলেন এবং রচনা করলেন মাতৃবন্দনা সঙ্গীত। ইতিপূর্বে ঢাকায় অবস্থান-কালে ভাইজী মাতৃভাবে বিভোর হয়ে অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করে 'শ্রীচরণে' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, 'যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই গানগুলি লিখিত, তিনিই আপনাকে শ্রীচরণে টানিয়া শান্তি দিবেন।' সত্যসত্যই ভাইজী মায়ের শ্রীচরণে স্থান লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

মা কিন্তু স্থির হয়ে কোথাও বসছেন না। দেশ হতে দেশান্তরে তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মায়ের বেশভূষারও এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিধানে সরু চুল পেড়ে ধুতী। গায়ে সেমিজ নাই। ফতুয়ার মত জামা ব্যবহার করেন। মাথায় ঘোমটা দেন না। চুল মাথায় চূড়া করে বাঁধা। পার্বত্য পথে পা ফেটে যায় বলে ভক্তরা জুতো পরিয়েছে। গায়ের সাদা চাদরখানি অনেকটা পুরুষের মত করে দেন। দেখলে যুবক ব্রহ্মচারী বলে ভ্রম হয়। সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ রাখেন না। সামান্য ঘটি, কম্বল ও দু-একখানি কাপড় মাত্র।

* * *

(আমার) কি জাতি কি নাম,
কোথায় বা সে ধাম
স্থির নাহি তার বলি কি করে।
বলিব কি আর, আমি নহি কার,
কেউ নহে আমার, এ তিন পুরে॥
পিতা-মাতা হীনা, কে ছিল জানি না
কেহ ত বলে না, কোথাও না শুনি।

পতি গুণাধার কপালে আমার
শ্মশানে কি হলো কি জানি ॥
সে যাতনা ভুগি, হয়ে গৃহত্যাগী
সংসার বিরাগী ফিরি বনে বনে।
আনিল সে বনে, জীবন ধারণে
আছি একাকিনী প্রীতি সমরে।

মুখর কণ্ঠে গান গাইছেন আনন্দময়ী মা ভাববিহ্বল হয়ে বারাণসী ধামে, প্রশান্ত সন্ধ্যায় পাঁড়ের ধর্মশালায়। তখনও কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম গড়ে ওঠে নি। মাকে ঘিরে বসে রয়েছেন বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ। গোপীনাথ কবিরাজ (শ্রীশ্রীমায়ের গোপীবাবা), ভাইজী, শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় গুরুপ্রিয়াদেবীর পিতৃদেব স্বামী অখণ্ডানন্দ, মায়েরই নির্দেশে তিনি সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন হরিদ্বারের মঙ্গলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট থেকে। গুরুপ্রিয়াদেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া, সেবা (ডেরাডুনের লেডি ডাক্তার মিস সারদা শর্মা), শ্রীহরিরাম যোশী, ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী অমলাদেবী। ডাঃ দাশগুপ্ত মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কাশীতে 'আনন্দময়ী করুণা সেবাশ্রম' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দীন দুঃখীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। স্ত্রী অমলাদেবীও মা-অন্ত প্রাণ। শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ। কাশীর ভক্তদের পটলদা। আনন্দময়ী মার আকুল প্রাণের সঙ্গীতে সকল ভক্তদেরই দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। সে আকুলতা যেন তাঁদের মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করে যায়। নিমেষে জাগিয়ে তোলে কি এক অনির্বচনীয় মাধুরী! অন্তর তাঁদের ভরে ওঠে সেই অবিস্মরণীয় মাধুরীতে। দুঃখ বেদনা ও কোন ক্ষুদ্রতার ভার ক্ষণিকের জন্য অন্তর্হিত হয় মনোরাজ্য থেকে। কোথাও কিছু গ্লানি আর পড়ে নেই। আচ্ছন্ন অবশ হয়ে আসে চেতনা। নদীর নিরবিচ্ছিন্ন মর্মরধ্বনির মত তখন শুধু কানে ভেসে আসে আনন্দময়ী মা'র সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের মন ভরে উঠলো তাঁর পরম প্রেমের ছোঁয়ায় ও সিক্তিত হয়ে উঠলো ভক্তিরসধারায়। তখন তাঁদের মনে হোল ধর্মশালা নয় তাঁরা যেন এক পরম শান্তিময় ধামে অবস্থান করেছেন। ভক্ত মন বলে উঠলো, 'যিনি আকাশ যিনি পৃথিবী সমস্ত কিছু যিনি, যাঁকে জেনেও জানা যায় না, তিনি আজ করুণায় বিগলিত হয়ে স্বয়ং এসে আমাদের সকলকে আপন করে নিয়েছেন। আমরা তাঁর চরণ বন্দনার গান গাইতে গাইতে তাঁরই দুয়ারে

এসেছি। তাইতো তিনি মুখ খুলেছেন, কণ্ঠ হতে অমৃতরসধারা নিঃসৃত করছেন। আমাদের হৃদয় মন ভরে উঠেছে। তিনি ত আনন্দময়ী মা! স্বর্গবাসিনী দেবী আনন্দময়ী আমাদের ভালবাসবার জন্যই ত মর্ত্যে এসেছেন। আবার মা গান ধরলেন :

ভজরে ভাইয়া রাম গোবিন্দ হরে,
রাম গোবিন্দ হরে রাম গোবিন্দ হরে
রাম গোবিন্দ হরে ॥
ভজরে বহিনা রাম গোবিন্দ হরে
যো মুখ রাম নাহি, সো মুখ ধূল পড়ে,
খোলত গাঁঠরি, ভজরে ভাইয়া,
রাম গোবিন্দ হরে ॥

আবার ভাবতরঙ্গ উথলে উঠে উপস্থিত ভক্তবৃন্দেম মন প্রাণকে প্লাবিত করে দিলো। আত্মহারা ভক্তরা ভাবঘন দৃষ্টিতে শ্রীশ্যামসুন্দরের ভাবাবেশিত আনন্দময়ী-মা'র সেই অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন। তাঁরা মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন মাতৃচরণে। স্বর্ণময়ী কাশীতে সুবর্ণ নির্মিত বারাণসী ধামে শ্রীবিশ্বনাথের লীলাভূমিতে আনন্দময়ী মা ভক্তসনে লীলা করে চললেন। কখনও আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের মুখ হতে স্তোত্রাদি নির্গত হতে লাগলো। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জ্ঞানী পুরুষ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ শ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত স্তোত্রাদি শুনে মন্তব্য করলেন, "ইহা প্রকৃত দেবভাষা, মর্ত্যলোকের সংস্কার লইয়া ইহা বুঝা অসম্ভব।" পরবর্তীকালে তিনি আনন্দময়ী মার আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহার স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সাজিয়াছে বটে, তবে যখন যে ভাবে সাজিয়াছে তখন সেই ভাবের অভিনয়ই যথাযথ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন, তিনি যেখানে আছেন সেইখানেই আছেন। সেইখানে থাকিয়াই সাক্ষীরূপে নির্বিকার ভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংস্কারের অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্তা হইয়া শুধু দ্রষ্টা-রূপে অবস্থান, ইহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত রহস্য।"

প্রতিদিন বৈকালে খোলা জায়গায় সভা করে শ্রীশ্রীমাকে বসানো হলে ভক্তসমাগম হয়। ভক্তবৃন্দের মধ্য হতে প্রশ্ন করা হয়, শ্রীশ্রীমা করেন মীমাংসা। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একখানি পাখা হাতে করে মাকে বাতাস

করছেন আর শুনছেন শ্রীমুখের কথা। মার সঙ্গে এখন গোপীনাথ কবিরাজের খুবই সখ্যতা। মা কথাশেষে গোপীনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কি গোপী বাবা! ঠিক বললাম তো? গোপীনাথও মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মা তখন মৃদু মৃদু হাসেন। গোপীনাথ কবিরাজ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই মাতৃস্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

ভগবৎকৃপা প্রসঙ্গে মা বলছেন, 'কৃপা যে অহৈতুকী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কৃপা না থাকলে তোমরা থাকতে কোথায়? করুণাসাগর তিনি। তোমাদের শূন্য ঘট পূর্ণ করবার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। তোমরা নিতে জানো না এই তাঁর দুঃখ, তোমাদের একেই তো সব ছোট্ট ছোট্ট আধার। বেশী কৃপা ধরে না। তার উপর আবার নিজের ঘট উল্টো করে রেখেছো। যেটুকু কৃপা পাচ্ছ তাও পড়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছো না। হঠাৎ যদি কৃপার বন্যা এসে পড়ে তুমি তো সহ্য করতে পারবে না। তোমার যে এখনও সময় হয় নি। তোমার যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু পাচ্ছ।

বেশী আকাঙ্ক্ষা, বাসনাই দুঃখের কারণ। তাঁকে প্রাপ্তির ইচ্ছাই সুখ। ভগবান ধুয়ে মুছে তাঁর কোলে নেন কিনা! এই কষ্ট যে সুখের জন্য। সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখো।

আপদ বিপদ মানুষেরই আছে। বিপদের সময় ধৈর্য ধরা চাই। উহাতে যে বীর ধীর হতে পারে সেই জিতে যায়। সময় এক রকম থাকে না। বিপদের সময় তাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে কাটানো দরকার। কে জানে তিনি কি বিপদ দিয়া কি বিপদ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ দিয়াই বিপদ হরণ করেন। এই জন্যই তাঁর নাম বিপদভঞ্জন।

সেইজন্য বলা হয় ধৈর্যের আশ্রয় নিয়া তাঁর কাছে প্রার্থনা। সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা করা। সবই যে ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। ধৈর্যের আশ্রয়ে সব সহ্য করে তাঁরই নাম নিয়া থাকা।

আবার একদিন গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর গুরু শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের আশ্রমে নিয়ে এলেন আনন্দময়ী মাকে। শক্তিধর মহাসাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস কাশীতে গন্ধবাবা নামে পরিচিত ছিলেন। নিভৃতে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সঙ্গে আনন্দময়ী মার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। বিশুদ্ধানন্দজী ভক্ত শিষ্যদের নানারকম অত্যাশ্চর্য খেলা দেখাতেন। এই প্রসঙ্গে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে ইঙ্গিত করে

আনন্দময়ী মা হেসে হেসে বললেন—বাবা, তোমাদের এই সব খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। তোমরা যেন আসল বস্তু আদায় করে নিতে ভুল করো না।

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবও মায়ের কথা শুনে হাসতে লাগলেন। এইভাবে আনন্দময়ী মার উপস্থিতিতে সমগ্র আশ্রম বাড়ীতে এক অনির্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চললো। মা অকস্মাৎ ধ্যানমগ্ন হলেন, যেন পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে আছেন। মর্মর প্রতিমার মত নিথর নিস্পন্দ। সেই অনির্বচনীয় ভাবমূর্তি নয়নগোচর করে যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবও অভিভূত হলেন। আনন্দময়ী মার মধ্য দিয়ে বিশ্বজননীকে দর্শন করে ধন্য হলেন।

* * *

মা তুমি কি?

কেহ বলে তুমি অবতার, কেহ বলে তুমি আবেশ। কেহ বলে তুমি সাধিকা, সিদ্ধজীব। আমি প্রকৃতই জানিতে ইচ্ছা করি তুমি কি?

জিজ্ঞেস করছেন দয়ানন্দ স্বামী। ভারত ধর্মমহামণ্ডলের প্রচারক।

আনন্দময়ী মা মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি কি মনে করো বাবাজী? তুমি যা মনে করো আমি তাই।'

মা সাধারণতঃ বলেন, "এ শরীরটা একটা যন্ত্র। যে যেমন আঘাত করবে সে সেইরূপ শব্দ পাবে।" আবার কখনও বলেন, "এ শরীর তো একটা পুতুল। তোরা যেমন খেলাতে চাস, এ তেমনিতর খেলতে থাকে।"

১৫

মহাপীঠ—তারাপীঠ। তারাপীঠের মহাশ্মশান! মহাতান্ত্রিক ঋষি বশিষ্ঠদেবই প্রথম দ্বিভুজা শিলাময়ী তারিণীদেবীর প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে প্রাণবন্ত করে তুললেন। তারাপুরের শ্মশানভূমি তারাপীঠ বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ নামে প্রসিদ্ধ হল। তারাপীঠ তারাপুর তন্ত্রোক্ত নাম। গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। সাধারণ মানুষ ভুলে গেল চণ্ডীপুর নাম। তারাপীঠ নামই সাধারণ মানুষের

হৃদয়-মন হরণ করে নিল।

পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের সাধক কর্ণাভরণ বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডির আসনে সস্ত্রীক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং তারা ও অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গে লীন হয়ে যান। ধীরে ধীরে সেই জাগ্রত সাধনপীঠও সুপ্ত হয়ে রইল অরণ্যের অন্তরালে। অদৃশ্য হল 'বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ'—তারাপীঠের শিলাময়ী তারিণীদেবী আর ভৈরব চন্দ্রচূড় বনের মাটিতে।

অকস্মাৎ একদিন রত্নগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক জয়দত্ত এসে নৌকা নোঙর করলেন দ্বারকা নদীর তীরে সুপ্ত মহাশ্মশানের বুকে। একমাত্র পুত্র খুবই অসুস্থ, মরণোন্মুখ অবস্থা। সকালে মাঝিরা সুপ্ত শ্মশানের মাঝে এক পুকুরের ধারে রান্নার আযোজন করেছে। মাছ কেটে পুকুরের জলে ধুতে গিয়ে দেখে মৃত মাছ জীবিত হয়ে উঠলো। বিস্মিত ও হতবাক্ হল মাঝিরা। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা বলবার জন্য ছুটে এল তারা বণিক প্রভুর কাছে। বণিকের পুত্র তখন পরলোক গমন করেছে। শোকাতুর পিতা তখন আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই মুহূর্তে মাঝিদের মুখ থেকে অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে দেহে মনে শক্তি ফিরে পেলেন। মৃত পুত্রকে সেই পুকুরের জলে স্নান করালেন। সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্জীবন লাভ করল বণিকপুত্র। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বণিক জয়দত্ত স্থানমাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। গভীর রাত্রিতে সপ্নে আবির্ভূতা হয়ে তারিণীদেবী স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারামায়ের কৃপা লাভ করে বণিক জয়দত্ত পরদিন প্রত্যুষে হৃষ্টচিত্তে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে লোকজন সংগ্রহ করে সেই অরণ্যকে দিলেন সরিয়ে, যে অরণ্য আর মাটি আচ্ছাদন করে রেখেছিল শিলাময়ী তারিণীদেবী আর অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড়কে। ধীরে ধীরে জেগে উঠলো বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ, আর তার পুণ্যময় সাধনভূমি মহাশ্মশান। বহু অর্থ ব্যয় করে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করলেন বণিকপ্রবর জয়দত্ত। জনপদের মানুষেরা আবার চিনল তারামাকে। মহাপীঠ তারাপীঠকে আর সেই পুকুরকে, যার নাম হল 'জীবিত কুণ্ড', 'জীওল পুকুর'। আবার অরণ্য এসে গ্রাস করলো তারাপীঠকে। সে অরণ্যকেও একদিন সরিয়ে দিলেন রাজা রামজীবন রায়। মন্দিরের সংস্কার ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের কর্মচারী রামজীবন। বৈভব ও সদ্গুণের জন্য রাজা নামে খ্যাত হন। রামজীবনের বংশধর এঁড়োলের বাঁড়ুয্যেরা তারামায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। এই সময়েই বিশেখ্যাপা নামে শক্তিসাধক আবির্ভূত হন

তারাপীঠের মহাতীর্থে। আবার জাগ্রত হল তারাপীঠ।

রাণীভবানী যখন নাটোরের কর্ত্রী, আসাদুল্লা খাঁ তখন বীরভূমের রাজা। তারাপুর গ্রাম তখন তাঁরই অধীনে ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দুর দেবীকে লাঞ্ছিত ও অবহেলা করবেন এই আশংকায় ভক্তিমতী রাণীভবানী নিকটবর্তী একটি মৌজা তাঁকে প্রদান করে তারাপুর গ্রাম নিজের অধীনে আনয়ন করলেন। রাজসরকার থেকে পূজার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই সময়ে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশ্মশানে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। নাটোরের রাজা রাণীভবানীর দত্তকপুত্র রাজযোগী রাজা রামকৃষ্ণও তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। ভক্তপ্রাণ রাজা রামকৃষ্ণ তারামায়ের মন্দিরের সংস্কারসাধন ও নিত্য পূজার সুবন্দোবস্ত করেন। একটি বৃহৎ তালুক উৎসর্গ করেন তারামায়ের পূজা ও মন্দির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যয়ের জন্য। রাজা রামকৃষ্ণ আনন্দনাথ নামে একজন কৌল সাধককে প্রধান কৌল-পদ বৃত করলেন। তাঁরই সমসাময়িক যোগীবর বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যও তারাপীঠে সাধন করে সিদ্ধ হন। তাঁর শিষ্য তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। পূর্বাশ্রমের নাম মাণিকরামমুখোপাধ্যায়। তারাপীঠেরমহাশ্মশানই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। ইনিই ছিলেন শ্রীশ্রীবামাখ্যাপার দীক্ষাগুরু। বামাখ্যাপার আত্মপ্রকাশের পর থেকেই আবার বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ—তারাপীঠ নবজীবন লাভ করল। প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে শিলাময়ী তারাদেবী! কত যুগের, কত সাধনার ইতিহাস নীরব হয়ে তারাপীঠের মহাশ্মশানের এই মাটি আর বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাইতো আজও তন্ত্রসাধনার এই তপঃক্ষেত্রে অন্তঃসলিল ধারাটি নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই মহান্ তন্ত্রপীঠে আজ আবার এলেন শ্রীআনন্দময়ী মা। সন্ন্যাসিনী মহাতান্ত্রিক আনন্দময়ী মা নন, তারামা-ই যেন আনন্দময়ী মারূপে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন মন্দিরের বহির্ভাগে। ভক্তসনে লীলা করবার মানসে। তিনিই একাধারে প্রজ্ঞা প্রেমরূপ নাম, ত্যাগ ও শক্তির একায়ন। তিনিই মূর্তিমতী অবতীর্ণা কালী তারা শ্রীমা আনন্দময়ী। জগতের সমস্ত মাতৃত্বের একীভূতা মূর্তি হলেন শ্রীআনন্দময়ী মা। তাইতো তিনি বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

দিকে দিকে প্রচারিত হল বিশ্বজননীর আগমন সংবাদ। দূর দূরান্তর থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে এসেছে জীবন্ত তারামাকে দেখবে বলে। ঢাকার মা নন, তারামা—আনন্দময়ী মা। তারাপীঠ মাতৃউৎসবে মেতে উঠেছে। দিকে দিকে সমারোহ। অগণিত লোক। যেন প্রত্যেক দিনই মেলা বসেছে।

মহামহোৎসব চলেছে আনন্দময়ী মাকে কেন্দ্র করে। মায়ের স্নেহধারা বর্ষিত হল ভক্তদের উপর, তারাপীঠের গৃহস্থ বধূদের উপর, দুঃখী তাপী দুঃস্থ গ্রামবাসীদের উপর। শুধুমাত্র মানুষের উপরই নয়, মায়ের এই স্নেহধারা উৎসারিত হয়েছে জগতের প্রতিটি জীবের জন্য। বনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষরাজি, স্থাবর, জঙ্গম সকলের সঙ্গেই আছে মায়ের অন্তরের যোগ।

তারাপীঠের এই পবিত্র ভূমিতে সাধক বামাখ্যাপা একদিন যে মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে ধন্য হয়েছিলেন, সেদিন জগন্মাতা দর্শন দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ভক্ত বামাখ্যাপাকে। আর আজ সেই পীঠস্থানে বিশ্বজননী স্বয়ং মানবীরূপে অবতীর্ণা হয়ে দর্শনপ্রার্থী প্রতিটি মানুষকেই দিচ্ছেন দর্শন। মর্ত্যের দুর্বিষহ মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে স্বর্গ হতে নেমে এসে ধরণীকে ধরা দিয়ে যেন বলছেন—"দেখ্, ওঠ্ আমি এসেছি।"

শ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষ্যে নূতন নূতন দোকান বসেছে। দোকানে ভিড় লেগেই আছে। মাতৃ-উৎসবের মেলায় ভিড। তারাপীঠে আনন্দময়ীর মেলা। দূর গ্রাম থেকে মানুষেরা এসেছে। বালক যুবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকল শ্রেণীর মানুষের ভীড। কি সে দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা! শুধু দেখবে। দূর থেকে একবার দর্শন করতে পারলেই ধন্য।

মা এক গ্রামের বধূকে লক্ষ্য করে বললেন—আমার জন্য তোমরা এমন করছ কেন? আমি তো তোমাদের মতই মানুষ, সাধু সন্ন্যাসী তো নই।

বউটি প্রত্যুত্তরে বললো, মা, কেন ছলনা কর? তুমিই তো তারা মা। তোমাকে দর্শন করাই পুণ্য। কথা বলতে বলতে কণ্ঠ তার আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। ভক্ত বধূটির আকুতি দেখে মা বললেন—"যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা তারই তো কৃপা। ধৈর্য নিয়ে সংসার করা। নিরাস হতে নাই। যেখানে সেখানে যে ভাবে সেভাবে কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা, তবেই তো শান্তি।"

অসংখ্য গ্রাম্য মানুষ মাকে শুধু দেখা নয়, কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হল। আনন্দশিহরণ দেহে মনে আত্মায় অনুভূত হতে লাগল। মা কোনরূপ অলৌকিক বিভূতি দেখাল না, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত মাকে শুধুমাত্র দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মা যে পথ দিয়ে, যে অঞ্চল দিয়ে চলেন সেখান এমন কোন বিশিষ্ট মানুষ নেই যিনি ছুটে এসে মায়ের কৃপাপ্রার্থী না হয়েছেন। এমনও দেখা গেছে আনন্দময়ী মার শুধুমাত্র উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষের দেহে মনে একই সময়ে একই ভাবে

ভাবস্পন্দন আনন্দশিহরণ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কেন এমন হয় কেউ বলতে পারেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাণহারা মা তারাপীঠের মানুষদের মন প্রাণ হরণ করে নিয়ে চললেন বক্রেশ্বর তীর্থ অভিমুখে।

মায়ের আদেশে ভোলানাথ তারাপীঠে সাধনা করে 'তারাসিদ্ধি', 'শিব-সিদ্ধি' লাভ করেন।

বক্রেশ্বর তীর্থে বক্রেশ্বরকে দর্শন করে মা আবার অন্য এক ভাবমূর্তিতে প্রতিভাত হলেন। ভক্তবৃন্দ সেই অপার্থিব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে ধন্য হলেন।

বক্রেশ্বর তীর্থ মহাশ্মশানের উপর। এখানে দেবী মহিষমর্দিনী। ভৈরব বক্রনাথ। বক্রনাথের পাশেই অষ্টাবক্র মুনির মূর্তি। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু বধ করায় ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে অসহনীয় জ্বালা অনুভূত হয়। মহামুনি অষ্টাবক্র সেই জ্বালা নিজ হাতে গ্রহণ করে নৃসিংহদেবকে জ্বালামুক্ত করেন, কিন্তু নিজে খুবই কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। অষ্টাবক্রের কষ্ট দেখে নৃসিংহদেবের করুণা হল। তিনি অষ্টাবক্রকে বললেন, বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করতে। গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করে অষ্টাবক্র মুনি যে মুহূর্তে মহাদেবকে স্পর্শ করেন সেই মুহূর্তেই সবতীর্থের জল এসে তাঁকে অভিষিক্ত করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালামুক্ত হন। সেইজন্য এখানকার কুণ্ডটির নাম 'জীবনকুণ্ড'। এখানে অনেক কুণ্ড ও অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। কুণ্ডের জল স্পর্শ করে, মহান তীর্থভূমি দর্শন করে মা ফিরে এলেন কলকাতায়। এসে উঠলেন শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাসায়, সালকিয়াতে।

* * *

'সুরধুনীর তীরে ও কে হরি বলে নেচে যায়'—সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাইছে লতিকা, ভক্তপ্রাণ জ্যোতিষচন্দ্রের কন্যা। নবদ্বীপধামে—সুরধুনীর তীরে।

নবদ্বীপধাম। প্রেমময়ের লীলাভূমি। প্রেম ভক্তি অনুরাগ ও বিশ্বাসের মহান্ তীর্থভূমি। নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন। যেই নদীয়া সেই তো ব্রজ। নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি, বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি! নবদ্বীপে সংকীর্তন, বৃন্দাবনে রাসমণ্ডল। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলেছেন, ব্রজভূমেতে বাস তারই তো হয় রে, শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি।

নবদ্বীপধামে এসে মা শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবে বিভোর হলেন। শ্রীরাধারাণীর ভাববিহ্বলতা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো। কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে কৃষ্ণপ্রেমে

ব্যাকুল হল তাঁর অন্তর। একদিন এই নবদ্বীপধাম থেকেই শ্রীগৌরসুন্দর মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দরের পায়ের নূপুর শিঞ্জন শুনতে পেয়েছিলেন আর শুনতে পেয়েছিলেন সেই মোহনবাঁশীর সুরধ্বনি। সুরধ্বনি নয়, ভগবানের হাতছানি, আহ্বানসঙ্গীত শুনে শচীমায়ের স্নেহনীড় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকুঞ্জ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সেই প্রেমময়ের সন্ধানে শ্রীধাম বৃন্দাবনে। আজ নবদ্বীপ ধামে এসে সেই বংশীধ্বনি নূপুরশিঞ্জন শুনে মা যেন প্রেমপাগল হযে উঠেছেন। আজও যে নবদ্বীপের বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ নামধ্বনি আর সেই প্রেমময় ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পুণ্য মধুব সৌরভ। তাইতো মা আনন্দময়ী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কেন জানি আনমনা হযে যাচ্ছেন।

এই নবদ্বীপধামেই আনন্দময়ী মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা চির-কুমারী শ্রীগৌরীমার সঙ্গে পরিচিতা হলেন। কত কথা কত হাস্যপরিহাস হল উভয়ের মধ্যে। আবার মিলন হল আদ্যাপীঠের সাধিকা শ্রীনির্মলা মার সঙ্গে। শ্রীশ্রীহেমভাই ও শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। তারপর দর্শন করলেন নবদ্বীপধামের মন্দিরাদি, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভুর স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন স্থানসমূহ। সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন ললিতা সখীর কীর্তনে। শ্রীমা ভক্তবৃন্দ সহ অবস্থান করলেন নাটমন্দিরে। মায়ের ইচ্ছায় মধ্য রাত্রিতে ললিতাসখী শোনালেন কীর্তন। কৃষ্ণকীর্তন। নামগান। 'আবার বল হরিনাম আবার বল, মধুর এই হরেকৃষ্ণ নাম আবার বল'। চারিদিক নামধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। মনে হল যেন নামমুখরিত বাতাস দিগ্-দিগন্ত নামধ্বনিতে আকীর্ণ করে আকাশ নামমেঘে সমাচ্ছন্ন করে তুলেছে। এখন বুঝি নামবর্ষণ শুরু হবে। কৃষ্ণগুণগানে শ্রীমা অন্তরে অন্তরে পরম প্রেম-স্বরূপ ভাবঘনতনু মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের জন্য হয়ে উঠলেন ব্যাকুল। ভাবাবেশ হল। সেই যমুনাপুলিন-বিহারী মোহন মুরলীধর শ্যামসুন্দর বসলেন এসে তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে। তিনি উপভোগ করতে লাগলেন প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দরের দ্বাপরিক লীলার মধুময় রস। অবশেষে অনন্তলীলাময়ী বিশ্ব-জননী শ্রীআনন্দময়ী মা নবদ্বীপধামের লীলা সাঙ্গ করে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়।

•

ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থায় সাধিকার দর্শনলাভ আগে আমার কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী

আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে আনন্দময়ী মা। সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ কেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে পড়েছে, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, তৃতীয় নেত্রের প্রতীক, তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে সদা-জাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দুটি হাত, আর ছোট্ট দুটি পা—তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।

বলছেন পরমহংস যোগানন্দ*। অকস্মাৎ আনন্দময়ী মার সঙ্গে সাক্ষাৎ-লাভ হয় কলকাতায়—ভবানীপুর অঞ্চলে ইং ১৯৩৫। আনন্দময়ী মাকে যতই দেখছেন ততই যেন বিস্মিত ও অভিভূত হচ্ছেন। মা হঠাৎ সমাধিস্থ হলেন। আবার কিছু সময়ের পর সমাধিভঙ্গ হল। সেই প্রসংগে তিনি বলছেন—"ব্রহ্মানন্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময়ী মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে এলেন।"

—বাবা, বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন ? তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর ঝংকার।

—বর্তমানে কলকাতা কিংবা রাঁচী। কিন্তু শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছি।

—আমেরিকা ?

—হ্যাঁ, সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মতো ভারতীয়া সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে। যাবেন আপনি ?

—বাবা নিয়ে গেলেই যাব।

---

* ১৯২০ সনে পরমহংস যোগানন্দ ইন্টারন্যাশান্যাল কংগ্রেস অফ রিলিজিয়াস লিবারেলস-এর ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আহূত হয়ে বক্তৃতা করেন। সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁর উপদেশ ও যৌগিক শিক্ষাপ্রণালীর লোকপ্রিয়তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে চুরাশীটি সৎসঙ্গ আশ্রম ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এক আমেরিকাতেই দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও উপর তাঁর শিষ্য ছিল। তাঁরই প্রবর্তিত 'যোগদা' প্রণালীর শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ছিল অগণিত। সনাতন ধর্মের বাণী প্রচার ও বিশ্বজনীন মানবহিতৈষণার বিরাট কর্ম প্রচেষ্টার অন্তরালে তিনি গভীর ধর্মভাবপূর্ণ বহু প্রবন্ধ কবিতা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহা-রাজের শিষ্য ছিলেন। তাঁরই রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী'।

······তারপর বিদায় নিয়ে বললুম, এখন অন্ততঃ রাঁচীতে তো আসুন আপনার শিষ্যদের নিয়ে। আপনি নিজে একজন ঈশ্বরের 'শিশু', আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দ পাবেন।

—বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবেন তখনই খুশী হয়েই যাব।

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মার রাঁচি বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়বাটী ও প্রাঙ্গন উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে তুললো। আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে হাস্যমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন—যেন স্বর্গের একটি সচল দেবীপ্রতিমা।

প্রধান গৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা সানন্দে বলে উঠলেন, 'এ জায়গাটি ভারি সুন্দর!' শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন····· অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সর্বব্যাপিত্বের এ কি রহস্যময় স্বতন্ত্র! বললুম—আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—"বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন?" হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস····সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তা আবার বলবে কি! একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। কি আর করেন, সুন্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গিতে প্রসারিত করে বললেন—"বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার জ্ঞান কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয় নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা আমি সেই একই ছিলুম। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও আমি সেই। নারীত্বে পৌঁছে তখনও আমি সেই। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম, তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইল, তখনও আমি সেই। আর বাবা, এখন আপনার সামনেও আমি সেই একই আছি। আর এই অনন্তের কোলে আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্য আমি সেই একই থাকব।

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মূর্তি তাঁর মর্মর প্রতিমার মতন নিথর নিস্পন্দ। মন কার ডাকে যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। গভীর কালো চোখ দুটি তাদের অতল স্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন নিষ্প্রভ কাঁচের মতো। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের

চৈতন্য অপসারিত করেন তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব বর্তমান থাকে। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কি আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম আনন্দময়ী মার সম্বিৎ ফিরে এসেছে। বললুম, মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন, রাইট সাহেব গোটা কয়েক ছবি নেবেন।

—আচ্ছা, বেস বাবা। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। অনেকগুলি ছবি তোলা হল। ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতি অপরিবর্তিত।

তারপর এল ভোজের পালা। আনন্দময়ী মা কম্বলাসনে বসলেন। একজন শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। মার মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মতো শান্তভাবে তিনি খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল খেযেই যাচ্ছেন, তরকারী আর মিষ্টিতে যে স্বাদের কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময়ী মার কাছে তার কোন প্রকার বোধ কিছুমাত্র নেই।

সন্ধ্যা হয়ে এল—আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার সময় আর এক দফা তাঁদের উপর সেই রকম গোলাপফুলের পাপড়িবৃষ্টি হল। তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃ উৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল। তাদের সে এক কী আনন্দের দিন।

সকল প্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্ত-ভাবে পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিতদের চুলচেরা বিচারে নয়। কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মতো সরল সাধিকা মানব জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্য লাভ। লক্ষ কোটী সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানুষের কল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ। কারণ তা মানুষের মন সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বটে, কিন্তু যীশুখৃষ্ট তাঁর 'প্রথম আজ্ঞায়' যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব

থেকে আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য তা তার একমাত্র দাতার মুক্ত হস্তের দান—প্রথম শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্রীরামপুর ষ্টেশনে। শিষ্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্য তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, বাবা, আমি হিমালয়ে যাচ্ছি। গাড়ীতে চড়লেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, কি ভীড়ের মধ্যে, কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে, কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি— "দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে এ শরীরটা চিরকাল সেই একই আছে।"

৭৫

চোখের সামনে আলোয় আলোময় করে উপবিষ্ট ইনি কে? নয়ন ভুলানো! পরিধানে রক্তবস্ত্র। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। ছল ছল আয়তলোচনা, ভুবনমোহিনী মূর্তি! ইনিই কি আনন্দময়ী মা? বলছেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহেরু।

জাগ্রত অবস্থায় অকস্মাৎ আনন্দময়ী মার এইরূপ দর্শন করে অভিভূত হন কমলা নেহেরু। কিছুদিন ধরে তিনি মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। সন্তানবৎসলা মা এইভাবে এসে সন্তানকে দর্শন দিয়ে গেলেন। ডেরাডুনের মনোহর মন্দিরে আনন্দময়ী মার সংস্পর্শে এসে শ্রীমতী কমলা নেহেরু মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে মাতৃদর্শন আকাঙ্ক্ষায় ওঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। ব্যাকুল অন্তরে পত্র লিখলেন মায়ের পর্ষদ ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্রকে (ভাইজী)। ভাইজী, আপনি আমাকে মার খবর সর্বদা দেন না—কিন্তু আমার প্রাণটা সর্বদাই মার সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমি মাকে এখান থেকেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। কয়েকদিন দেখছি, মা একখানা

লালপেড়ে শাড়ী পড়ে বসে আছেন।

অবশেষে যখন জানতে পারলেন মা মুসৌরীতে আছেন, শ্রীমতী কমলা নেহেরুও ছুটে এলেন মুসৌরীতে। মায়ের পুণ্যস্পর্শে অভিভূত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তারপর বললেন, মাতাজী, কন্যার সঙ্গে আর ছলনা কেন? জানি না আজ কোন শুভক্ষণে হয়েছিল আমার প্রভাত! তাইতো আপনার দর্শন পেলুম। আপনার জন্য আমার প্রাণটা মাঝে মাঝে যে অধীর হয়ে ওঠে, তা কি আপনি বুঝতে পারেন না? জানি না আবার কোন পুণ্য লগ্নে পাবো আপনার দেহের পুণ্যস্পর্শ! মৃদু হেসে সন্তানবৎসলা মা সন্তানকে সান্ত্বনা দিলেন।

শ্রীমতী নেহেরু একরাত্রি মায়ের কাছে অবস্থান করে বিদায় নিলেন। মায়ের সঙ্গে এই হলো তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাস। এর পরই কমলা নেহেরু পরলোক গমন করেন।

ফুলের সৌরভে অলি যেমন ছুটে আসে, দিগ্-দিগন্ত থেকে মায়ের আকর্ষণে তেমনি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এলো ভক্তের দল মুসৌরীতে। মাকে ঘিরে শুরু হোল ভজন-কীর্তন-নাম গান। নাম-তরঙ্গে ভাসতে লাগলো পাহাড়ের রাণী ছোট্ট মুসৌরী শহর।

কাশী থেকে সপরিবারে এলেন পরম ভক্ত নির্মলবাবু (শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গম্ভীর ও দৃঢ় প্রকৃতির মানুষ। একমাত্র জামাতা ও জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষের মৃত্যুতেও তাঁর চোখে এক বিন্দু অশ্রুও কেউ দেখে নি। আবার সেই মানুষই মায়ের সংস্পর্শে এলে ভাব-বিহ্বলতায় তাঁর দুই চোখ বেয়ে নামলো জলের ধারা। তিনি বললেন, 'মা আমার ভিতরের নর্দামা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।'

ভাবের নানা স্তরের অবস্থা সম্বন্ধে মা বলছেন ভাইজীকে। "এই যে কীর্তনাদিতে ভাব হয়, এও কত রকমের। কখনও নামের ধ্বনিতে শরীরে একটা তরঙ্গ ওঠে, তাতে অবসাদ বা ক্লান্তি আসে। তখন সাধক জড়বৎ খানিকক্ষণ পড়ে থাকে।

প্রথম হয়—রূপের নেশায় ভরপুর। যেমন কৃষ্ণরূপে আত্মহারা। কৃষ্ণের পূজায় কৃষ্ণের নামে ঢল ঢল ভাব।

আর একটু উপরের অবস্থা, যেমন কালো মেঘ দেখে কৃষ্ণের মূর্তি জেগে উঠলো অথবা যা দেখছো, মনে করছো—আমার কৃষ্ণেরই রূপ। তখন 'আমার কৃষ্ণ' এই ভাবটি আছে।

চিত্তশুদ্ধি হলেই একলক্ষ্য হয়ে একের রূপে মজে যায়। আবার একটা অবস্থা রূপের নেশায় ঢল ঢল ভাব, সেই ভাবটা কমলেই কান্না আসে।

আর একটা অবস্থা, যা দেখে তাতেই প্রিয়তমের ছায়া দেখে আনন্দ পায়। তখনও মূর্তির উপর লক্ষ্য আছে।

আবার হয় ব্রহ্ম ভাব। তখন সাধক সাধ্য এক হয়ে যায়। বিশেষ মূর্তির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এক ছাড়া কিছুই নাই এই ভাব জেগে ওঠে। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং আর কি। এব ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। ব্রহ্মই সকল প্রকল্প ও ভাবের আদি ও অনন্ত। একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই। এই ভাব।

আরেকটা হলো সবিকল্প সমাধি। তখন এক সত্তা বোধ, আর কিছুই নাই। আরও উপরের অবস্থা—নির্বিকল্প সমাধি, তখন আর কিছুই নাই অথবা কি আছে কি নাই,—নাই বললেও বলা হয় না, আছে বললেও বলা হয় না। বলা আর কতটুকু হয়, এক একটা দিকের কথা বলা হচ্ছে মাত্র।

যদি কোন একটা অবস্থা ধরে বসে থাকা না যায় তবে একটার পর একটা আসবেই। কিন্তু যদি একটা অবস্থা ধরে থাকা হয়, তবে ঐখানেই বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

একটা স্তরে দাঁড়ালেই যেটা ছেড়ে গেল, তারও ছায়া থাকবে। আবার যে স্তরটা পরে আসছে, তারও আভাস পূর্বস্তরে থাকতেই পাওয়া যায়। কাজেই একটা স্তরেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটে অবস্থাই খেলা করে। লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কোন্ স্তরে আছে।"

মা আবার ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "নির্বিকল্প সমাধির পর শরীর ছেড়েও যেতে পারে।"

* * *

"ধন দৌলত কিসের জন্য ?

নিজের জীবন ধারণ ও পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য। পুত্র পরিবার কার জন্য ? সরলভাবে জবাব দিলে বলতে হবে, 'আমার জন্য'। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয় এই 'আমি' কে ? তাহলে আর জবাব নেই। এই তো হলো তোদের বুদ্ধির দৌড়। 'আমি কে' একবার বেশ ভাল করে চিন্তা করে দেখ্ দেখি, 'আমি'র সন্ধান করতে গিয়ে দেখবি যে সব পুঁথিপত্র স্কুল কলেজে বসে চর্বিত চর্বন করেছিস আর কর্মক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিস্, তার ভিতরে এই প্রশ্নের জবাব নেই। আমি ও আমার সন্ধান পেতে হলে বিষয়কে কেন্দ্র করে যে চিন্তা উত্থিত হয়, সেই চিন্তাধারাকে

বদলে একতত্ত্বের সাধনায় মনোযোগ দিতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। চিত্ত চঞ্চল হলে দৃঢ়তার সঙ্গে মনকে সরিয়ে এনে তাকে 'আমি'র মূলে আকৃষ্ট রাখতে হবে। ইহাই আত্মদর্শনের উপায়।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছো। বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছপালা পশু-পক্ষী কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নূতন গাছপালা পশুপক্ষী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি কেবল তাই করলে তবে প্রভেদ রইল কি ?"

তাইতো এ শরীরটা বলে, 'ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে কর্ম করে যাওয়া। যেখানে যেভাবেই থাকো সেই এক গান। একের চিন্তায় সময়টি একটু বেশী করে দেওয়া'।

*　　　*　　　*

আনন্দময়ী মা আবার চলেছেন উত্তর কাশী অভিমুখে। সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে। ঢাকা, কলকাতা, কাশী ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসেছেন। ডাণ্ডি কাণ্ডি খচ্চরও নেওয়া হয়েছে সঙ্গে। মুসৌরী থেকে বিরাট বাহিনীসহ পার্বত্যপথে শ্রীমায়ের যাত্রা হলো শুরু। মা কখনও চলেছেন ডাণ্ডিতে, আবার কখনও পদব্রজে। মায়ের সঙ্গলাভে ভক্তবৃন্দ দুর্গম পার্বত্যপথের পথকষ্টও ভুলেছে। আনন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন করতে করতে চলেছে সকলে। এইভাবে ছয়দিন পথ পরিক্রমা করে আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌছলেন উত্তর কাশীতে। মহান তীর্থক্ষেত্র। শিবের লীলাস্থল। শিব লীলা করেছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে এই স্থানে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হলে পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যভার পরীক্ষিতের হাতে তুলে দিয়ে, কাশীর পথে যাত্রা করলেন বিশ্বেশ্বর শিবজীকে দর্শন করবার জন্য। মহাদেবকে প্রণাম করে তাঁরা সশরীরে স্বর্গের পথে যাত্রা করবেন। পাণ্ডবদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে নারদ ছুটে এলেন কাশীতে। শিবের নিকট। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জ্ঞাতি হত্যা করে পাণ্ডবেরা অনেক পাপ করেছে। এখন আবার আপনার দর্শনাভিলাষী। আপনি ওদের সহজে দর্শন দেবেন না। শিব নারদের কথা মেনে নিলেন এবং কাশী ছেড়ে চলে গেলেন। পাণ্ডবেরা কাশীতে এসে শিবের দর্শন না পেয়ে দিশে-হারার মত এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। শিবও নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে অবশেষে বর্তমান উত্তর কাশীর অরণ্যময় স্থানে এসে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবেরাও ছাড়বার পাত্র নন। নানাস্থান ঘুরে ঘুরে এই উত্তর

কাশীতে এসে সমস্ত অরণ্যভূমি তোলপাড় করে শিবের সন্ধান করতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে শিব মহিষের রূপ ধরে পালাতে লাগলেন।

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মহিষরূপী শিবকে চিনে ফেললেন। এবং বিশাল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মহিষরূপী শিবকে। শিবঠাকুর তখন নিজ মূর্তি ধারণ করে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিলেন। পাণ্ডবেরা বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে তৃপ্ত হলেন। এবং পূজা করে শিবকে প্রতিষ্ঠা করলেন হিমালয়ের ঐ অরণ্যময় ভূমিতে। শিবের অবস্থানের জন্য ঐ স্থানও কাশীধামে রূপান্তরিত হলো। ঐ স্থান উত্তরাখণ্ডে বলে নাম হলো 'উত্তর কাশী'।

এই উত্তর কাশী আবার নূতন প্রাণে জেগে উঠলো আনন্দময়ী মার আগমনে। মা প্রতিষ্ঠা করলেন কালীমূর্তি। সমারোহের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পন্ন করলেন বাবা ভোলানাথ। এই উপলক্ষ্যে সাধুদের দেওয়া হলো ভাণ্ডারা। আবার মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো উত্তর কাশী। এইভাবে লীলাময়ী মা উত্তর কাশীর লীলা সমাপন করে ফিরে এলেন ডেরাডুনে মনোহর মন্দিরে।

আবার একদিন ডেরাডুন—কিষণপুরে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞ শুরু হোল। শ্রীবাবা ভোলানাথ চারজন ব্রাহ্মণসহ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড নির্মিত হয়েছে লক্ষ আহুতি প্রদানের বাসনায়। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী, লেডি ডাক্তার সারদা, শ্রীযুক্ত শচী ঘোষ, হংস প্রভৃতির উৎসাহে ডেরাডুনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। ১৩৪৩ সালের ২৫শে বৈশাখ শ্রীআনন্দময়ী মা ও ভোলানাথসহ ভক্তবৃন্দ প্রবেশ করলেন নূতন আশ্রমে। ষোড়শোপচারে জীবন্ত মায়ের পূজাও হলো। পূজা করলেন ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ভাবাবেশ হোল। সেই অলৌকিক দেবীমূর্তি নয়নগোচর করে রোমাঞ্চিত দেহে পূজা করলেন ভক্ত মন্মথবাবু। ২৭শে বৈশাখ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হলো। বাবা ভোলানাথ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ভক্তবৃন্দের মস্তকে শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। দ্বিপ্রহরে মায়ের ভোগ হোল। মহামহোৎসবের কার্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হোল।

নামকীর্তনে মেতে উঠলো কিষণপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম বাড়ী।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

রাম এবং কৃষ্ণ এই দুই নামের মাধুর্য ছড়িয়ে আনন্দময়ীমা কলিযুগে

প্রেমাবতারের প্রেম বিতরণ কার্য সম্পন্ন করলেন।

*　　　*　　　*

আনন্দময়ীমার যত আশ্রমই প্রতিষ্ঠা হোক না কেন, মা কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। পিছনের কোন বন্ধন, কোন আহ্বান, কোন মমতা এই মমতাময়ী সন্তানবৎসলা মাকে তাঁর সঙ্কল্পিত যাত্রাপথ থেকে কোনদিনই প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। মুক্ত বিহঙ্গের মত দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মা বলেন, "এ শরীরটা দেখে জগৎভরা একটি বাগান। জীবজন্তু উদ্ভিদাদি যত কিছু আছে সবই এই বাগানে নানারকমে খেলছে। প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্টতা আছে। তাই দেখে এ শরীরের আনন্দ। তোরা সবাই মিলে বাগানের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছিস। এ শরীরটা বাগানের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। তাতে তোরা কেন এত আকুল হয়ে পড়িস।"

আবার হঠাৎ একদিন মা চলে এলেন ৺তারাপীঠে। গুরুপ্রিয়া দেবীর উপনয়ন আর বাবা ভোলানাথের পালিতা কন্যা মরণীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন তারাপীঠের মহাশ্মশানে। এই অভাবনীয় অনুষ্ঠান দেখবার জন্য অসংখ্য লোকসমাগম হলো। তারাপীঠের গ্রামের মানুষেরা তো মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। বিস্ময়ে পুলকে হতবাক হয়ে মায়ের এই লীলাখেলা দেখলো তারা। মায়ের তো এ এক খেয়াল। কেন, কেউ জানে না, বলতে পারে না।

মহাশ্মশানের মাঝে তারামায়ের মন্দিরের সম্মুখে এই বিবাহ অনুষ্ঠান দেখে ভক্তবৃন্দের মনে হোল মহাশ্মশানের বুকে নয়, এ যেন কৈলাসে হরপার্বতীর লীলা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে। মরণী বাবা ভোলানাথের দত্তক কন্যা। আশ্রমে পালিতা। পাত্রটিও আশ্রমেরই ছেলের মত। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ভোলানাথই কন্যা দান করলেন। ভোলানাথ মরণীকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই সম্প্রদান করবার পরমুহূর্তেই তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুবিন্দু। ভোলানাথ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষসিংহ হলেও, অন্তরটি ছিল তাঁর স্নেহপূর্ণ—মাখনের মত কোমল। শিশুর মত সরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

বিবাহের পর দিবস কন্যা জামাতাসহ আত্মীয় স্বজনেরা বিদায় নিলেন তারাপীঠ থেকে, মহাশ্মশানের পুণ্যভূমি হতে। লীলাময়ী মা তারাপীঠের

লীলা সাঙ্গ করে ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করলেন শ্রীরামপুরের পথে।

আঁকা বাঁকা মেটে পথ দিয়ে রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আলোয় বিশখানি গরুর গাড়ী চললো। নিস্তব্ধ চতুর্দিক, ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষেরা। শান্ত সমাহিত এক ভাব ধারণ করে আছে। চতুর্দিকের সেই প্রশান্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে কীর্তনের সুমধুর স্বর উত্থিত হলো। ভক্ত শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন সুরু করলেন,—

হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল,
কেশব মাধব গোবিন্দ বোল।
...   .
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে শ্রীমাও কীর্তনে যোগদান করলেন। মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভক্তরাও কীর্তন গানে মেতে উঠলো। এইভাবে সকলকে নামরসে অভিষিক্ত করে, জাগিয়ে মাতিয়ে মা পথ চলতে লাগলেন। শ্রীনামের রসময় বিগ্রহস্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নয় আনন্দময়ীমাই যেন প্রকটিত হয়েছেন।

আনন্দময়ীমাকে আবার হঠাৎ দেখা গেল পুরীধামে শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যময় ভূমিতে। অপূর্ব লাবণ্যময়ী সর্বালঙ্কারভূষিতা জগজ্জননীরূপে দর্শন করলেন পরম বৈষ্ণব শ্যামদাস বাবাজী। হরিদাস ঠাকুরের মঠের বাবাজী। শ্রীক্ষেত্রে দৃষ্টিবিভ্রমও নয়, স্বপ্নও নয়। শ্রীমার প্রত্যক্ষ মূর্তি বাবাজীর কুটীরে। মা তাঁকে কিছু সময়ের জন্য দর্শন দিয়েই অন্তর্ধান হলেন।

শ্যামদাস বাবাজী বৈষ্ণব মানুষ। পুরীধামে আছেন প্রায় ত্রিশ বৎসর। বয়স ৮০ বৎসর; বাতে পঙ্গু, কিন্তু আনন্দময়ীমার নামে পাগল। মাকে সশরীরে দেখবার জন্য আকুল হয়ে ডাকছিলেন। আকুল প্রাণের আহ্বানে মা স্বয়ং এসে দেখা দিয়ে গেলেন। শ্যামদাস বাবাজী বলছেন, 'মা আনন্দময়ী এই ঘরে বসিয়াই আমাকে দর্শন দিয়া গিয়াছেন। কয়েক মিনিট এখানে ছিলেন। আমার কি তখন জ্ঞান ছিল? মা কিছুক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গেলেন।'

১৮

আনন্দময়ী মা এখন সোলনে। সোলনের রাজা দুর্গা সিংয়ের আমন্ত্রণে এসেছেন। রাজা দুর্গা সিং মায়ের পরম ভক্ত। মা তাঁর নাম রেখেছেন 'যোগীভাই'। রাজা সাহেব নিঃসন্তান এবং ধর্মভীরু। মায়ের নামে আত্মহারা। মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস।

শ্রীমা এসে উঠলেন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। শোগীবাবার প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ। শোগীবাবা খুবই বৃদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ, এ অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা সাধু।

মন্দির সংলগ্ন গৃহে কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। মা ভক্তবৃন্দসহ এসে বসলেন কীর্তনের ঘরে। রাজাসাহেব মায়ের চরণ বন্দনা করলেন। অন্যান্য ভক্তরাও মাকে প্রণাম করে কীর্তনের ঘরে বসলেন। রাণী, রাজমাতা ও রাজপরিবারের মেয়েরা মাকে প্রণাম করে চিকের আড়ালে মন্দিরের ভিতরে বসলেন।

আনন্দময়ী মার প্রেমাপ্লুত সুকণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভক্তবৃন্দ কীর্তন করতে লাগলেন। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন। রাজা সাহেবও ভাবাবেগে কৃষ্ণকীর্তনে যোগ দিলেন।

বৃষ্টিসিক্ত রাত্রি হয়ে আসে গভীর। রুদ্ধ বাতায়নে আঘাত করে চলে বৃষ্টির জলবিন্দু। বাতায়নের কোণ বেয়ে গড়িয়ে চলে জলের ধারা, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো এসে জানালাগুলিকে করে দেয় শুভ্র। ভিতরে ঘরে অবিরাম চলে নাম গান। কৃষ্ণ কীর্তন। রাজাসাহের ভৃত্যসহ বিপুল উল্লাসে হাততালি দিয়ে তালে তালে নেচে নেচে কীর্তন করতে লাগলেন। কীর্তনের গানে যে আছে 'মিলে চাকরে নফরে ভূপাল কৃষক-এ সবাই বলে হরিবোল।'

অপার মহিমময়ী মা আনন্দময়ী আজ সেই ভাবকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুললেন। ভক্তিরসসিক্ত করে ভক্তের হৃদয়কে অমৃতপূর্ণ করে তুলেছেন। মায়ের সংস্পর্শে এসে রাজাসাহেবের হৃদয়ের অভিমান দূরীভূত হয়ে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যভাব জাগ্রত হয়েছে। মা যেন আজ করুণায় আপ্লুত হয়ে করুণা বিতরণ করে চলেছেন। রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সমভাবে মা আজ হরিনাম বিতরণ করছেন। সোলনের রাজা দুর্গা সিং ও

রাজপরিবারের সকলেই আজ নিজেদের ধন্য মনে করছেন করুণাময়ী আনন্দময়ী মার ভাবাবেশের মূর্তি নয়নগোচর করে আর অযাচিত কৃপা লাভ করে। তিনিই যে সর্বাশ্রয়!

মা ভক্তদের বার বার বলেন: 'ওরে তোরা নাম কর। নামেই সব হয়। নাম জপেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। যে কীর্তন করে, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেখানে কীর্তন হয় সেই স্থানও পবিত্র হয়। যে কীর্তন শোনে সেও পবিত্র হয়।

নামে ত তিনিই প্রকাশিত। তাঁর অন্য যে সব প্রকাশ তাঁদের সঙ্গ পেতে হলে আশ্রমে যেতে হবে। তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ছুটতে হবে। কিন্তু নামের সঙ্গ করতে কোথাও ছুটতে হবে না। সেই পরম প্রিয়ের অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ সর্বক্ষণ পাওয়া যায়, সর্বাবস্থায়।

ঠাকুরের নাম হলো তেঁতুল। যতই নাম করো চিত্তশুদ্ধ হবে। তেঁতুল দিয়ে ময়লা ওঠে। বাসন পরিষ্কার হলে তাতে পরিষ্কার মুখ দেখা যায়। নাম করা হচ্ছে মাজা। মেজে স্বরূপ দেখা। এই হলো জ্ঞান। জ্ঞানগঙ্গা এসে কর্ম টর্ম সব কিছু ধুয়ে দেন। পথ তো অনেকই আছে। নূতন পথ আর কিছু চাই? খেলনা তো অনেক রকম আছে। তিনি কত রকমের খেলে গেছেন। সেই খেলা নাও, সে খেলা নিলে এটা যে খেলা তা ধরা পড়ে। হচ্ছে না হবে না বলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে নেই। যেদিন যায়, সে আর ফিরে আসে না। খেলার ভিতর দিয়ে খেলা ভাঙ্গতে হয়। পথ অনন্ত, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি। তবে তারপরেও আছে, যেখানে গতিও নেই, স্থিতিও নেই। গতি স্থিতির নেই। গতি স্থিতির প্রশ্নই নেই। সেখানে ডোবা ভাসা নেই। একই স্থিতি, সবই তাঁরই প্রকাশ। তিনিই, তিনি যা—তাই, তিনি যা—তা। বিচিত্র সংস্কার রয়েছে বিচিত্র জীবে। যার যে সংস্কার, সে যেখানে আছে, সেখান থেকে ত এগোতে হবে তাকে। আপনাকে পাওয়া মানে সত্যকে পাওয়া। পূর্ণকে পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তাইতো সাধন। সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গ ও স্মরণ করণীয়। যাঁর সৃষ্টি তিনিই ত সব দিকে। দ্রুত গতিতে সেই লক্ষ্য পথে চলা। সবার মধ্যেই সব আছে। বীজের মধ্যে যেমন থাকে অনন্ত বৃক্ষ।'

* * *

দীর্ঘ উপলবন্ধুর পথ চলে চলে মা আবার একদিন এসে পৌছুলেন সিমলায়। ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনায়। সিমলার ভক্তদের একান্ত আগ্রহে।

সিমলার কালীবাড়ীতে শ্রীমা তাঁর ঘরের ছোট্ট বিছানাটুকুর ওপর বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। ঘরটিও যেন তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তরা অপলক নয়নে শ্রীমার ভুবনমোহিনী মাতৃরূপসুধা পান করছেন আর শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করছেন।

'দেখ একাগ্রতা আর সরল বিশ্বাসই তাঁকে পাওয়ার উপায়। বিশ্বাস। কেবল শিশুর মত সরল বিশ্বাস চাই। অভ্যাসের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনায় সত্যিকার ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফলস্বরূপে প্রকাশ পান।

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে তাঁকে সরলভাবে জানাবে। আর ব্যাকুল চিত্তে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবে তাঁর কৃপা বর্ষিত হবেই।

কৃপা বললেই অহেতুকী কৃপা বোঝায়। যখন কৃপা হবার তখন তাঁর ইচ্ছাতেই কৃপা বর্ষিত হয়। যেমন দেখ, শিশু খেলা করতে করতে মাকে ভুলে গেছে। মা হঠাৎ গিয়ে তাকে কোলে নিলেন। শিশু না ডাকতেই মায়ের স্নেহ প্রকাশ হলো।

তাঁর কৃপা তো সকলের ওপর সমানভাবে রয়েছে। যখন উহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার সময় বা যোগ্যতা আসে তখন সে দেখতে পায় যে সে কৃপালাভ করছে। তাঁর কৃপা না থাকলে তোমরা থাকতে কোথায়?

আবার ভক্তিমতী স্ত্রী-ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছেন: তোমরা প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট সময়ে দশ মিনিট তাঁকে ডাকবে। যদি সংসারে কাজের জন্যে এক জায়গায় চুপ করে বসতে না পার, তবে অন্ততঃ সেই নির্দিষ্ট সময় যেখান থেকে (হাতে কাজ কর) যার যেভাবে ইচ্ছা, তাঁকে স্মরণ করবে। এতে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার নেই। কাপড় ছেড়ে শুচি হওয়ার দরকার নেই, এমন কি সেই নির্দিষ্ট সময়ে যদি পায়খানায়ও যাও, তাও কিছু বাধা নেই। সেখানে বসেই তাঁকে ডাকবে। নাম করবে, মনে করবে এই দশ মিনিট তাঁকে দিয়েছি। পাখীরা যেমন নির্দিষ্ট সময় ডেকে ওঠে, কোন বাধা বিঘ্ন মানে না। তোমরাও এমনি একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁকে দিতে চেষ্টা কর। এই সময়টি তাঁকে সমর্পণ করেছি এই ভাবটি রেখো।

দেখো, যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। তাঁরই নাম লইতে চেষ্টা কর। তাঁর নাম ভজলে সর্বরোগ

আরোগ্য হয়।'

একজন স্ত্রী ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন—'মা, মন ত কিছুতেই স্থির হয় না। মন স্থির হওয়ার উপায় কি ?'

হেসে হেসে মা বলছেন : 'কলসী ভরা জল। যতক্ষণ কলসীটা নাড়াচাড়া কর ততক্ষণ ভিতরের জলও নড়তে থাকবে। কলসীটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থিরভাবে রেখে দাও, দেখবে ভিতরের জলও স্থির হয়ে গেছে। সেই রকম শরীরটা বেশীক্ষণ স্থির ভাবে রাখতে চেষ্টা কর, যত বেশী সময় এক লক্ষ্যে স্থিরভাবে বসতে পারবে, ততই মন স্থির হয়ে আসবে। একদিকে মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব, অন্যদিকে আবার শান্ত স্থির ভাবও মনেরই স্বভাব। যে যত বেশী সময় বসে তাঁর নাম নিতে পারো, তার চেষ্টা করো। মনটা ছুটাছুটি করুক, তোমার চেষ্টা তুমি ছাড়বে না। মন ত তার ধর্ম ছাড়ছে না, তুমি কেন তোমার ধর্ম ছাড়বে ?

সর্বদাই যদি 'যে কোন কাজ করছি তাঁরই সেবা করছি', এইভাবে তাঁকে স্মরণে রাখা যায় তবে গাছের নূতন পাতা গজাইবার সময় যেমন পুরানো পাতাগুলি আপনিই ঝরে যায়, তেমনি সংসার আসক্তি দূর হয়ে তাঁর প্রতি আসক্তি জাগিয়ে বহির্মুখী ভাবগুলি অন্তর্মুখী করিয়ে দেয়। ইহাই তার স্বাভাবিক গতি। দেখ না পুরানো পাতাগুলি মাটিতে পড়ে আবার গাছেরই সার হয়ে থাকে। বৃথা কিছুই যায় না জানিও।"

এবারে মা মৃদু মৃদু হাসছেন আর বলছেন পুরুষ ভক্তদের উদ্দেশ্য করে—'তোমরা সব পাগল হইলে নাকি ? কোথায় অফিস হইতে যাইয়া জলটল খাইবে, বেড়াইতে বাহির হইবে, সব দেখি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। আমিও তোমাদের একটি মেয়ে বইত নয় আমারও ত রক্ত মাংসের শরীর। কি দেখিতে আস ?'

ভক্তরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। ওঁরা নিজেরাও জানেন না কিসের আকর্ষণে ওঁরা আসেন। সকলেই বললেন, কি যে এক নেশায় পড়েছি বলতে পারি না।

এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চলেছে পার্বত্য শহর সিমলাতে। কালীবাড়ীর ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠে। মা আবার বলছেন, 'তোমরা শান্তি খুঁজছো। শান্তি চাওয়ার নামই ঈশ্বরকে চাওয়া। তোমরা এই দুইনিয়া ভাবটা ছেড়ে একভাব নিয়া থাকতে চেষ্টা করো, শান্তি দেখা দেবে। একভাবে থাকলে ত আর অভাব থাকে না। অভাব না থাকলে অশান্তি

আসতে পারে না। তাই এক মন্ত্র। একেতেই সত্য শান্তি ও আনন্দ।

সংসার অর্থ সং+সার অর্থাৎ সং যার সার। তাইতো সংসার। যতদিন তুমি নিজে কি তাহা ভুলিয়া সং সাজিয়া থাকিবে, ততদিন কি শান্তি আসতে পারে? তুমি প্রকৃত যাহা, তাহা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায়? তাইতো এ শরীরটা বলে নিজেকে চিনিতে চেষ্টা করো। স্বভাবে স্থিত হও। জগৎ ভাবময়। সৃষ্ট বস্তুসকলই ভাবের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগ্রত করে তুলতে পারে, দেখবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই একই খেলা চলছে। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়। তাইতো বুঝতে পারে না প্রকৃত তত্ত্ব।'

একজন ভক্ত বলছেন, 'মা, আমার পূজা জপ কিছুতেই ত মন বসে না।

প্রত্যুত্তরে মা সরস করে বলছেন: 'দেখ না খেজুর গাছ। প্রথম কাটলেই কি আর রস বের হয়? কাটিতে কাটতে পরে ঝর্ ঝর্ করে রস বের হয় সেই রসে আবার কত শক্ত জিনিষও তৈরী করা হয়। চাই ধৈর্য। ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলবে। তোমার নিয়মমত কাজ করে যাও।'

'আবার দেখ, তোমাদের আহার বিহারের মধ্যে এমন কোন দোষ নিশ্চয়ই থাকে, যাতে তোমাদের মনটা বিক্ষিপ্ত করে দেয়। নামে বসতে দেয় না। এমন কি, কোন দৃশ্যবস্তুর দোষে, কি কোন লোকের সংস্পর্শে, কি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ও সব রকমেই তোমাদের অজ্ঞাতসারেও তোমাদের মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ ঘটে যেতে পারে। তাই যদি কারও এই দিকে আসতে হয়, তার সকলের সঙ্গ বর্জন করে একান্তে থাকা নিতান্ত দরকার। প্রথম প্রথম সর্বদা তার লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন মনটা তাঁর দিকে যেতে বাধা না পায়। অবশ্য সংসারীর পক্ষে সকলের সঙ্গ বর্জন করে থাকা সম্ভব নয়। তারা সর্বদা সৎসঙ্গ করবে। সদালোচনা করবে। সৎলোকের সঙ্গ করলে বা মহাপুরুষের জীবনী পড়লেও মন শুদ্ধ হয়। তাঁর দিকে যাওয়ার সহায়ক হয়। অনেক সময় পূর্বজন্মের কর্মও এই জন্মে সৎপথে যাওয়ার বাধা বা সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবও এই জন্মে প্রকাশ হয়। তাতেও এক এক সময় এক একটা ভাব প্রবল হয়ে দাঁড়ায়।'

মায়ের কথামৃত পান করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন সিমলার ভক্তবৃন্দ। বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে আছেন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার শ্রীজিতেন দত্ত, শ্রীঅমল সেন, চারুবাবু, পঞ্চুবাবু, হারাণবাবু ও আরও অন্যান্যরা। মা নিজেও অবাক, কি করে এত কথা জুটছে, পুরাণ পুঁথি শাস্ত্র কিছুই তা পড়া নেই

মিষ্টি হেসে মা বলছেন, 'এ মেয়েটা তো বাবা লেখাপড়া কিছুই শেখেনি তাই সময় সময় উল্টাপাল্টা সব বলে যায়।' কিন্তু ভক্তরা ভাবছেন অন্য কথা—যার এতটুকু কৃপাতেই অজ্ঞানী মানুষ জ্ঞানী হয়ে যেতে পারে। শাস্ত্র থেকে শ্লোক আওড়ে মা তত্ত্ব বোঝান না। মা তাঁর অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান থেকেই কথা বলেন।

মা আবার বলছেন, গুরু নির্বিশেষে বীজমন্ত্র জপের উপযোগিতা সম্বন্ধে। 'দেখ না, যেমন বীজটি মাটিতে পুঁতে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজটি যদি বারে বারে উঠিয়ে দেখ, তবে আর গাছ বের হয় না। যাঁর নিকট থেকেই হোক যদি বীজমন্ত্রটি পাও, আর তা মনের ভিতর গোপন রেখে নিয়মমত কাজ করে যাও, তবে সময়ে নিশ্চয়ই সেই বীজ হতে গাছ হযে ফুল ফল প্রসব করবে। গাছের বীজের মত তাকে গোপনে রেখে জল দিতে থাক। সময়ে গাছ বের হবেই। গুরু যেমনই হোক, তুমি যে বীজ পেয়েছ তা ত তাঁর নাম ঠিকই। তবে কাজ হবে না কেন?

একটা শিশু যদি তোমার হাতে একটা বীজ দিয়ে যায়, শিশু ত আর জানে না কিসের বীজ, তাই বলে কি আর বীজ থেকে গাছ বেরুবে না? তবে গাছ বেরুবার জন্য যা-যা করণীয় নিয়মমত তা তো করতে হবে গুরু যেমনই হোক তুমি যদি বীজটি নিয়ে নিয়মমত কাজ কর নিশ্চয়ই ফল হবে'

এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি গল্প বললেন মা।

"একটা লোক একবার দীক্ষা নেবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে এক সাধুর কাছে যায়। সাধুটি ত কিছুতেই দীক্ষা দেবেন না। লোকটিও ছাড়বে না। অবশেষে সাধুটি একরকম রাগ করেই বললেন, যা নে 'গোপীয়ানন্দন'। লোকটি পরম শ্রদ্ধাভরে সাধুটিকে প্রণাম করে 'গোপীয়ানন্দন' নাম দিনরাত জপ করতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া ভুলে গেল। কাজ কর্মও ছাড়লো। ঘুমও বন্ধ হলো। দিবারাত্র চললো নাম জপ। তার একজন নিকট আত্মীয় ভাবলো এভাবে এ ত পাগল হয়ে যাবে। তাকে বুঝিয়ে বললো তোমার 'গোপীয়ানন্দন' নাম আমি জপছি। তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। সে কিছুতেই নাম জপ ছাড়বে না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে সে নামটি ঐ আত্মীয়ের কাছে দিয়ে কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আত্মীয়টি ভাবলো ও তো ঘুমুচ্ছে এখন আর কি নাম করবো? 'গোপীয়ানন্দন' কি আবার একটা বীজ নাকি? এই কথা ভেবে সে নাম ছেড়ে উঠে গেল। এদিকে লোকটি জেগে দেখে তার নাম বন্ধ হয়ে গেছে। সে তখন পাগলের মত ঐ আত্মীয়টির কাছে গিয়ে

বললো, 'আমার নাম আমায় দাও'। তার ধারণা ছিল, একবার যে নাম তাকে দিয়েছে সে আবার সেই নাম ফিরিয়ে না দিলে সে নিতে পারবে না।

আত্মীয়টি বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞাভরে বললো, 'নে তোর ঘণ্টানন্দন'। লোকটি কিন্তু এ অবজ্ঞা বুঝলো না। যাকে নাম দিয়েছিল তার কাছ থেকে যা পেয়েছে তাই নিয়েই সরল মনে মহা-আনন্দে জপ করতে লাগলো। অবশেষে একদিন সে নামের গুণে লোকালয় ছেড়ে চলে এলো বনে। গাছতলায় বসে বসে জপতে লাগলো সেই নাম, 'ঘণ্টানন্দন'। নাম জপের প্রভাবে এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আসন টললো। তিনি শ্রীরাধারাণীকে বললেন, চলো আমার এক ভক্তকে দেখবে চলো। 'এত বড় ভক্ত আমার আর নেই, রাধারাণীও ভাবলেন, দেখে আসি কে আবার এতবড় ভক্ত। দুজনে চললেন মর্ত্যধামের পথে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব লুকোচুরি খেলা করা। তিনি পৃথিবীলোকে এসে এক গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন আত্মগোপন করে। আর শ্রীরাধা এক সাধারণ স্ত্রীলোকের বেশে সেই লোকটির কাছে গিয়ে দেখলেন সে চোখ বুজে জপ করছে 'ঘণ্টানন্দন'। কি নিষ্ঠা! আর কি সরল প্রাণের আকুতি। লোকটি তখন আর সাধারণ মানুষ নেই, প্রকৃত যোগীপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রীরাধা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কার নাম জপ করছো?' বার বার জিজ্ঞেস করায় যোগী চোখ খুলে দেখলেন সাধারণ স্ত্রীলোক নয় স্বয়ং শ্রীরাধারাণী। হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার পতির নাম জপ করছি।' শ্রীরাধাও হেসে বললেন, 'বলতো আমার পতি এখন কোথায়?' নামের প্রভাবে তখন তার দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে। অদূরে বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রীত হয়ে নবীন সাধককে যুগল মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সেই আধ পাগলা সাধারণ লোকটি আর সাধারণ লোক রইলো না, যোগী মহাযোগীও হলো না, কৃষ্ণকৃপায় মুক্তিলাভ করলো।"

গল্প শেষে মা বললেন, 'দেখ, গোপীয়ানন্দন ঘণ্টানন্দন নাম জপ করেও সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে। আবার শুধু সাধু যোগী হওয়াই নয়, সাধু যোগীদেরও যা কাম্য সেই মোক্ষলাভও করলো। একাগ্রতা, নিষ্ঠা, আর সরল বিশ্বাসই তাঁকে (পরমপুরুষকে) পাওয়ার একমাত্র উপায়। সেই চেষ্টা করে যাওয়া।

মা আবার বলছেন, 'বেতালা বেসুরা যেমন গান কীর্তন জমে না, তেমনি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুর বা তাল না থাকলে সাধারণতঃ মন বসতে চায় না। তাইতো শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সহজ ও সমভাবে নাম বা মন্ত্র

জপ কর। শ্বাস ও নাম এক যোগে চলতে চলতে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে প্রাণবায়ুর গতি স্ব-ভাবে এলে দেহ স্থির ও মন একমুখী হবে এবং দৃষ্টি খুলবে, তখন দেখা যাবে যে জীবমাত্রেই এক মহাপ্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত।'

মায়ের মুখের অমূল্য উপদেশ বাণী শুনে নিজেদের ধন্য মনে করলেন সিমলার ভক্তবৃন্দ। প্রাণহরা মা সিমলা পাহাড়ে এসে পাঞ্জাবী, রাজপুত, পাহাড়ী ও বাঙ্গালী নির্বিশেষে সকলেরই প্রাণ-হরণ করে নিলেন। ঘরে ঘরে নাম জপ, নাম-কীর্তনের প্রচলন হয়ে গেল মায়ের প্রভাবে, মা যেখানেই যান সেখানেই নাম গান কীর্তনে মেতে ওঠে সকলে। কালীবাড়ী কীর্তনের ঘরেও দিবারাত্র চলেছে নাম গান, কীর্তনের সমারোহ। শ্রীবাবা ভোলানাথও ভক্তবৃন্দসহ ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করছেন। সুললিত ছন্দে অমৃতনিস্যন্দী ভক্তিপ্লুত স্বরে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

কীর্তনানন্দে মা নিজেও মাতলেন, ভক্তদেরও মাতালেন। সিমলার আকাশ বাতাস যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ীমার অবস্থানে, কৃষ্ণ নামের কলকোলাহলে। সে যেন এক মহাপুণ্যময় মুহূর্ত। যেন যুগান্তব্যাপী তপস্যার এক পরম শুভলগ্ন।

শ্রীমা দেশে দেশে নগরে নগরে কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা বিতরণ করে চলেছেন। মা আনন্দময়ী হলেন প্রেম-সুধা-সমুদ্র। এমন-কৃষ্ণনাম রত্ন, ত্রিভুবনে যা মূল্য দিয়েও ক্রয় করা যায় না সেই অমূল্য রত্ন দুঃখী তাপী মানুষের সংসারে যেচে দান করছেন।

আনন্দময়ী মা!—যে নাম শ্রুতিপথে প্রবেশ করে হৃদয়-সরোবরকে করে পূর্ণ উদ্বেলিত হৃদয় হতে সেই অমৃত নয়ন ছাপিয়ে পড়লে অধম দেহ-মরুভূমিতেও উত্থিত হয় পুলকাঙ্কুর! যাঁর নামেই মিটে যায় সমস্ত শোক, তাপ, দুঃখ বেদনা। তিনিই তো আনন্দদায়িনী আনন্দময়ী মা! বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

'অনেক যোগ তপস্যা করেও মন স্থির করতে পারছি না, শান্তি পাচ্ছি না। শান্তির পথ বলে দিন, মা।'

বলছেন একজন সাধু, শ্রীমাকে। বেরিলিতে। মা এটোয়া থেকে বেরিলিতে এসেছেন। উঠেছেন এক ধর্মশালায়, গুপ্তভাবে থাকবার ইচ্ছা। কিন্তু পারলেন না। এখন দেশে দেশে মায়ের ভক্তসংখ্যাও অগণিত। ভক্তিমতী পাঞ্জাবী মহিলা শ্রীমতী মহারতন মায়ের ভক্ত। লোকপরম্পরায় মায়ের আগমন সংবাদ জানতে পেরে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন ধর্মশালায়। একে একে আরো অন্যান্যরা এলেন। সংবাদ পেয়ে একজন সন্ন্যাসীও এলেন। ধর্মশালা পরিণত হল তীর্থক্ষেত্রে। মায়ের এই আকর্ষণী শক্তি ও প্রভাবের কথা ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। চোখের সামনে ঘটনা দেখলেও ভাষা হারিয়ে যায়। ব্যাকুল প্রাণের অগণিত মানুষ, তাও আবার এক জাতি এক ধর্মের নয়, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আকুল হয়ে মাকে দেখছেন, চোখ দুটি তাঁদের ছলছল করছে। কেন করছে কেউ বলতে পারে না। তবে মাকে দেখলে নাকি অমন হয়। মা রোগের ওষুধ দেন না. অলৌকিক বিভূতিও দেখান না। আপন আসনে আপন ভাবে বসে থাকেন, আবার কখনো সুমিষ্ট কণ্ঠে নামগান করেন। কখনও বা মিষ্টি করে প্রশ্নের উত্তর দেন। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব; আবার অন্যায় দেখলে রাগও প্রকাশ করেন। যা কিছু করেন গুরুগম্ভীর গুরুদেবের মত নয়, আপন জনের মত, আপন ঘরের স্নেহময়ী মায়ের মত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ আজ আনন্দময়ী মার পিছনে ছুটছে, শুধু তাঁকে দর্শন করবে আর শ্রীমুখের কথা শুনবে। সাধু সন্ন্যাসীরাও বাদ নেই। 'আনন্দময়ী মা' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন এক পুলক শিহরণ জাগে ভক্তের প্রাণে প্রাণে।

মা গোপনে সাধুটিকে কিছু উপদেশ দিয়ে বললেন—"বাবা, প্রথম বীজটি পুঁতে যদি বারে বারে উঠিয়ে দেখা যায়, তবে সেই বীজে আর গাছ বেরোয় না। বীজটি মাটির ভিতরে পুঁতে যত্নে রক্ষা করতে হয়, জল সেচন করতে হয়। শেষে গাছ বের হয়ে বড় হয়ে গেলে সেই গাছ থেকেই আবার কত বীজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন কত ফুল ফল ঝরে পড়ে। তাইতো এ

শরীরটা বলে সাধনার প্রধান অঙ্গ ধৈর্য। সাধনার কাজ কি? সাধনার কাজ হল আবরণ সরানো। সাধনার দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তিনি সাধনার অধীন নন, তিনি স্বয়ং প্রকাশ।"

সাধুজী মায়ের উপদেশলাভে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। ভক্তিমতী স্ত্রী ভক্তরা কীর্তন শুরু করলেন। কৃষ্ণকীর্তন। কীর্তনে মার ভাবাবেশ হল। ভাবসমাধি। এক অপরূপ মাতৃমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। মা এখন বেশীরভাগ সময়ই আপন ভাবে নিরিবিলি থাকছেন।

বেরিলিতে নয় দিন অবস্থান করে ভক্তপ্রবর কৃষ্ণরাম পন্থের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মা এসে পৌঁছলেন নৈনিতালে। অবস্থান করলেন নয়না মন্দিরে। এখানেও বহু ভক্তসমাগম হল। দুর্গাপূজার নবরাত্রিতে ভক্তরা মাকে ফুল চন্দন দিয়ে জীবন্ত ভগবতীরূপে পূজা করলেন ফল দিয়ে ভোগ দিলেন।

মার কিন্তু এখন অজ্ঞাতবাস চলছে। কিন্তু ভক্তরা যে যেখানে মাকে দেখছেন তিনি ভোলানাথকে বা নিজেদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে পত্র বিনিময়ে প্রচার করে দিচ্ছেন। তাঁরা অবশ্য গোপনেই নিজেদের মধ্যে মায়ের খবরাখবর করছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই গোপন খবর, মায়ের অজ্ঞাতবাসের সংবাদ বিশাল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ছে। মায়ের অজ্ঞাতবাস ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আর অজ্ঞাত থাকছে না।

মাকে নিয়ে আজকাল বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন ভোলানাথ আর ভক্তবৃন্দ, যাঁরা সর্বদাই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। 'একবস্ত্রেই যাব', বলে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র বা একখানি কম্বল পর্যন্তও না নিয়ে মা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছেন। প্রব্রজ্যার পর সত্যলাভের জন্য তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ ও নানা স্থানে ধ্যান ধারণায় রত হলেন মা। মায়ের সব কিছুই গুপ্ত অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে চলেছে।

সন্ন্যাসিনী জীবনের কঠোর সাধনার এ আর এক অধ্যায়। সংসারী বিষয়ী মানুষের মধ্যে থেকেও সুন্দরী গৃহস্থ কুলবধূ হয়েও ভগবন্মুখী সাধনায় এমন নিষ্ঠা একাগ্রতা ও দৃঢ়তা ভারতবর্ষের নারীজাতির সাধনার ইতিহাসে বিরল। কলকাতা থেকে ভক্ত শ্রীযতীশ গুহ মহাশয় কাশীতে স্বামী শঙ্করানন্দকে লিখছেন—"মা ১৮ই শ্রাবণ সোমবার প্রাতে শ্রীরামপুরে ভোলানাথ প্রভৃতি সকলকে নিয়েই যান, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই ভোলানাথের সঙ্গে সকলকে কলকাতায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। মা, বিরাজমোহিনী দিদি ও রাজসাহীর প্রফেসর অটলবাবুর ভাগিনেয় কমলকে (বর্তমানে স্বামী বিরজানন্দ) সঙ্গে

নিয়ে শ্রীরামপুর হইতে রাত্রির গাড়িতে কোথায় চলিয়া যান কেহই জানে না। ভোলানাথকে ঢাকুরিয়া পিসিমার বাসায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে বলিয়া গিয়াছেন।"

ভোলানাথ লিখছেন বিন্ধ্যাচলে গুরুপ্রীয়াদেবীকে—'মা বলিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন তাঁহার জন্য চিন্তা না করে এবং তাঁহার অনুসন্ধান না করে। তিনি সময়মত আসিয়া সকলের সাথে মিলিবেন।'

রাজসাহী থেকে ভক্তপ্রবর অধ্যাপক অটলবিহারী ভট্টাচার্য লিখছেন—"এত বৎসর এত কান্নার পর মা জননী আসিয়া দেখা দিয়াছেন। আমার সব ক্ষোভ মিটিয়াছে। জীবনে এত আনন্দ ও এত আশীর্বাদ আর পাই নাই। এখন প্রার্থনা করি শীঘ্র শীঘ্র যেন সংসারের ঋণমুক্ত হইয়া মার কোলে যাইয়া শান্তি পাইতে পারি। ধর্মশালা সুবিধামত না পাওয়ায় মা আমার খোলা বারান্দায় এক রাত্রি কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন। ইহাও মার কৃপা।"

২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) শ্রীযতীশ গুহ কলকাতা থেকে বিন্ধ্যাচলে গুরুপ্রিয়াদেবীকে লিখছেন—"পুরীধামের জটিয়াবাবার আশ্রম থেকে শ্রীযুক্ত মাখনবাবু কলিকাতায় পত্র দিয়াছেন যে, মা পুরীতে গিয়াছেন। এইরূপ অযাচিতভাবে হঠাৎ মাকে পাইয়া তাঁহারা মহা আনন্দে আছেন। জটিয়াবাবার আশ্রমে খুব উৎসব হইয়াছে।"

নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করে মা এলেন ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বর থেকে গোমো, আদ্রা জামসেদপুর, কাশীধাম, এলাহাবাদ, আগ্রা হয়ে এলেন মথুরাতে—রাখালরাজা কৃষ্ণের লীলাভূমিতে। এসে উঠলেন এক ধর্মশালায়। এখান থেকে কমলকে কলতাতায় ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। এখন যাত্রা-পথে একমাত্র সঙ্গিনী রইলেন বিরাজমোহিনী। কমলাকে বিদায় দিয়ে মা এসে বসলেন বিশ্রামঘাটে। কিছু ফল কিনে বিরাজমোহিনী দিদি মাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। চারিদিকে ভীড় জমে গেল। শ্রীমার রুক্ষ চুল, আলুথালু বেশ, আর অপরের হাতে খাওয়া দেখে অনেকেই ভাবলো পাগলিনী মেয়ে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ধীরে ধীরে সূর্যদেব অস্তমিত হলেন। আনন্দময়ী মা তখনও বসে আছেন বিশ্রামঘাটে। ভিখারিণীর বেশ। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন কিছুই ঠিক নেই। হঠাৎ এক কাশ্মীরী মহিলা মাকে দেখেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি মায়েরই ভক্ত। মাকে এভাবে দেখতে পাবেন চিন্তাই করতে পারেন নি।

তিনি একটি মন্দিরে মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। এখানে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশিবনারায়ণ মাকে জগদ্ধাত্রীরূপে দর্শন করে অভিভূত হন এবং ভক্ত হয়ে পড়েন। ইনিই মায়ের বৃন্দাবন যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন। আবার মা রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনধামে এসে উপস্থিত হলেন। বৃন্দাবনে লীলা করে আগ্রা হয়ে এলেন সুলতানপুরে। উঠলেন কালুমল্লীর ধর্মশালায়। এইখানে মায়ের ভক্ত সারদার বোন লেডি ডাক্তার রমা শর্মা মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্তও করে দিলেন। এখন থেকে ফয়জাবাদ হয়ে এলেন অযোধ্যাতে। সেই বহু বিখ্যাত উত্তরকোশলের রাজধানী, বহু সাধুসন্তের চরণপূত রামায়ণের অযোধ্যানগরীতে। এসে উপস্থিত হলেন সরযূর তীরে, রামমন্দিরে। শুনতে বসলেন রামনাম। শুনতে শুনতে নামগানের মধ্যে নিজেকেও ডুবিয়ে দিলেন। তনু মন নামমালা হয়ে উঠলো। সেই সময়ে আনন্দময়ীমার ভাববিহ্বল মূর্তি নয়নগোচর করে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হলেন। এমন নয়নমনোহরা মাতৃমূর্তি যেন তারা জীবনে দেখেনি। মন্দিরের পূজারী জীবন্ত দেবীজ্ঞানে মাকে পূজা করলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল স্বয়ং দেবী সীতা অযোধ্যানগরীর রামমন্দিরে আবির্ভূতা হয়েছেন। অসংখ্য ভক্ত সমাগম হল। সকলেই মাকে দর্শন করে প্রণাম করে প্রীত হলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠে মা গান ধরলেন।

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম।
জয়তু শিব শিব জানকী রাম
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম॥

শ্রীমায়ের মধুর কণ্ঠস্বর সকলেরই মর্ম স্পর্শ করলো। আনন্দময়ীর অবস্থানে সরযূর তীর আনন্দধামে পরিণত হল। আর সরযূ নদী হয়ে উঠলো শ্রীসৌন্দর্যসুধানদী। আনন্দময়ীর সাহচর্যে এসে তাদের মন প্রাণ যেন বলে উঠলো, 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'! জানলো চিনলো অযোধ্যা-নগরীর বাসিন্দারা বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে। এখানে আর ভিখারিণী পাগলিনী মা নন। অযোধ্যায় মা হলেন ঐশ্বর্যময়ী জগজ্জননী। মা এক এক সময় এক এক ভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেন। এও মায়ের খেয়াল। মা কিছু করেন না, সব কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যায়। মন্দিরের দেবীর মত মায়ের ভোগ নিবেদনও হোল।

ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। শ্রীরামচন্দ্রের আসনের পাশে শ্রীমা আনন্দময়ীকে বসিয়ে পূজারীরা পূজা ও আরতি করতে লাগলেন।

অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। অযোধ্যাবাসী এই আরতি দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হল।

অযোধ্যার লীলা সাঙ্গ করে মা এলেন লক্ষ্ণৌতে। লক্ষ্ণৌ থেকে ভারতের মহান তীর্থভূমি নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে এটোয়াতে। এটোয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ পীতাম্বর পন্থ মায়ের ভক্ত। মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করলেন তিন মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে দাউজীর মন্দিরের সন্নিকটে। নিরিবিলি থাকবার উপযুক্ত মনে করে মা এখানে থাকলেন পঁচিশ দিন। গুপ্তভাবে। মা অবশ্য সর্বত্রই গুপ্তভাবে থাকিবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে যায়। একে একে এসে উপস্থিত হন ভক্তরা। তারপর গড়ে ওঠে ভক্তমণ্ডলী। শুরু হয় নাম-গান, সৎসঙ্গ, আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরের আসর। মাকে সম্মুখে রেখে কত গান, কত কথা, কত পুরাণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ। যেন একটা তীর্থক্ষেত্র। আর দুর্গোৎসবের মেলা বসেছে।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে যমুনায় তীরে তীরে শ্মশানের সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে বসেন শ্রীমা। দিনে দিনে এখানেও গড়ে উঠলো ভক্তমণ্ডলী। প্রতাপগড়ের রাণীরা আনন্দময়ী মাকে দর্শন করেই অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়লেন। প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা ও আরতি করলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

মা সর্বদাই ভক্তদের বলছেন, 'নাম কর, নামেই সব হয়। চাই নিবিড় একাগ্রতা, কিন্তু সংসারীর মন তো সংশয়ে ভরা। মন স্থির হতে চায় না। মনকে স্থির করবার জন্যই ত সাধনা। মন স্থির হইয়া গেলে ত হইয়াই গেল। চঞ্চলতা মনের স্বভাব। সে স্বভাবতঃই এদিক ওদিক যাইতে চায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বধন না পায়, শুদ্ধভাব না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থির হইবে না। মনকে স্থির করিতে হইলে একভাব লইয়া থাকিতে হয়। যেমন নাম করা।'

'হ্যাঁ, নামেই হয়। মন এদিক ওদিক গেল বলে দুঃখ করে লাভ নেই, বরং তখন এই বলে বিচার করতে হয় যে, মন যখন আমার বাধ্য না হয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে, আমিও মনের বাধ্য না হয়ে জোর করেই নাম করতে থাকবো। তোমরা দেখনা ছেলেরা ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি আকাশে এদিক ওদিক চঞ্চলভাবে উড়তে থাকে, কিন্তু উহা বাঁধা থাকে লাটাইয়ের সুতার সঙ্গে। ঘুড়িটা হচ্ছে মন, উহাকে সুনামরূপ তার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। এইভাবে বাঁধা থাকলে একদিন না একদিন মনকে বশ করা যায়। মনকে শান্ত করতে হলে একটা কিছু আশ্রয় করতে হয়। আশ্রয় কর নামকে।

সকল কাজেই চাই সংকল্প, সাধনা। নাম করাকেই এ শরীর বলে সাধনা। তোমার যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই ডেকে যাও। দরকার মতো তিনি নিজে এসে তাঁর প্রকৃত নাম বলে দেন। যেমন দেখনা, একটি ছেলের ভাল নাম তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তুমি যদি তাকে তার ছেলেবেলায় সাধারণ নামে অথবা খোকন, খোকা বলে ডাকো, প্রথমে খেয়াল না করলেও তাকে উদ্দেশ্য করে ডাকতে থাকলে সে নিশ্চয়ই আসবে এবং তখন সে নিজেই বলবে আমার ভাল নাম এই। কাজেই যে নামে ডাকো কাজ হবেই। আবার দেখ, ছোট শিশু যখন 'মা' বলতে পারে না, তখন সে কাঁদলেই মা বুঝতে পারেন যে, শিশু মাকে চাইছে। অমনি মা ছুটে যায় শিশুর কাছে। কিন্তু বড় হলে ছেলে কাঁদলেও মা বুঝতে পারেন না যে ছেলে মাকেই চাইছে। সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, তিনি জানতে পারেন।'

আবার একদিন এটোয়ার লীলাও সাঙ্গ হল। নৈনিতাল বেরিলি হয়ে এলেন আগ্রায়। ভক্তপ্রবর ডাঃ ভার্গব ও ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাকে মহাদেবীরূপে পুষ্প ও চন্দন দিয়ে পূজা করলেন। মা ভাববিহ্বল হয়ে অপার্থিব জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে প্রতিভাত হলেন।

আগ্রা থেকে মা এলেন লাহোরে। সেখান থেকে অমৃতসর, মীরাট ও গড়মুক্তেশ্বর হয়ে এলেন দেওঘরে। এইভাবে মা উত্তর পশ্চিম ভারতের বহু নগর শহর গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করে দুঃখী তাপী গরীব ধনী সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই রামনাম, কৃষ্ণনাম বিলিয়ে অসহায় মানুষকে সহায় দিয়ে, সাহস দিয়ে, প্রেমের দোল দিয়ে নামমাধুর্য আস্বাদনে উদ্দীপিত করে ফিরে এলেন কলকাতায়। ভক্তরা মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হল।

কাননকুন্তলা পৃথিবী। শ্যামল শস্যাঢ্য প্রান্তর। দলিতাঞ্জন ঘন নীল মেঘপুঞ্জ। কত গাছ, কত ফুল, কত রঙ, কত পাখীর কত ডাক, কত জল, কত সুর—একটা অনবদ্য ছন্দ! অবিচ্যুত শৃঙ্খলা। তারই মাঝে 'আনন্দময়ী মা' হলেন একটি প্রেমপ্রসন্ন রসপ্রকাশ। আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ী। তাইতো মা যেখানেই অবস্থান করেন সেই স্থানই হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। আনন্দময়ী মার আধ্যাত্মিক জীবনলীলার বিশেষত্ব হল নবাগত ভক্তের মনোজগতে ইষ্টদেবতারূপে আত্মপ্রকাশ। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয় না। ভক্তরা বলেন—'এ হল মাতৃলীলা।' মা বলেন—"এ শরীরটা ধরতে জানে, ছাড়তে জানে না। আপন করে নিতে হয় না, সকলেই ত আপন হয়েই আছে।"

—সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি,
আজিও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি ॥
ওরা জানে না তাই মানে না।
আমি জানি তাই মানি
আমি অন্তরে তাঁর বাঁশরী শুনেছি।
তাই ওগো আমি মানি।—

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভজন গান করছেন দিলীপ রায়। আনন্দময়ী মাকে গান শোনাচ্ছেন। বিড়লা পার্কের শিব মন্দিরে। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে আছেন। দিলীপ রায়ও তাঁর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছেন। বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে আছেন বাসন্তীদেবী ও কন্যা অপর্ণাদেবী। দীনেশ ঠাকুর, নিবারণ সমাজপতি, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, রেণুকা সেন, সংজ্ঞাদেবী ও দীঘাপাতিয়ার রাণী।

দিলীপ রায় বললেন—মা, তোমাকে দেখে আমার বড়ই ভাল লাগছে বাড়ি বাড়ি গান অনেক করেছি। এই সুন্দর স্থানে বসে গান করবার একান্ত ইচ্ছা। মা'ও হাসি হাসি মুখে গান শুনবার ইচ্ছা জানালেন। দিলীপ রায়ের সেই উন্মাদ দুরন্ত সঙ্গীত আর অনুরাগমত্ত অন্তরের আর্তস্পন্দনে আনন্দময়ী মা হলেন ভাবাবিষ্ট। এবং অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। সঙ্গীত শেষে মা আনন্দিত চিত্তে দিলীপ রায়ের কণ্ঠে ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। ভক্ত দিলীপ রায় আনন্দিত চিত্তে বললেন, 'মা এখন কিছু কথা বলো। তোমার কথা শুনতেই এরা সকলে আমার সঙ্গে এসেছে। তোমার কথা শুনতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগে, তাই আমি এদের এনেছি তোমার কথা শোনাতে।'

মা মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাদের কান মিষ্টি, তাই এ শরীরটার কথা মিষ্টি শোন।'

মায়ের মিষ্টি রসিকতায় সকলেই হেসে উঠলেন। তারপর নানা রকম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সকলকেই আনন্দ দান করলেন। কোনও কঠিন তত্ত্বের

ব্যাখ্যা নয়, যিনি 'সত্য' তাঁকে সহজ করে সরল ভাষায় সুষমান্বিত বিন্যাসে বললেন। সংস্কারমুক্ত উদার হৃদয় নিয়ে সেই পরমতমকে ব্যাখ্যা করলেন নানা উপমায়। সকলেই তৃপ্ত হলেন। অবশেষে অর্পণাদেবী শুরু করলেন কীর্তন। একে একে ভক্ত দীনেশ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, নিবারণ সমাজপতি, রেণুকা সেন প্রভৃতিও গান শোনালেন। এ যেন সঙ্গীতের দেবীর সম্মুখে অবিরাম চলেছে সঙ্গীত সাধনা। গীতাঞ্জলি অর্পণ করছেন যেন ভক্তরা সঙ্গীতের বরদাত্রী দেবীর শ্রীচরণকমলে। আর সেই ভক্তির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো বিড়লাপার্ক। শিব-মন্দির নয়—মাতৃমন্দির।

মা বলছেন: "যতক্ষণ নাম রূপ আছে, ততক্ষণ নামেই সব। দেখ না, একবার গিয়ে নদীতে পড়তে পারলে তারপর স্রোতেই সমুদ্রের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন আর কিছু করবার থাকে না। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত নাম করতে হয়।" আবার বলছেন: "বাহিরের কর্মে অভাবের নিবৃত্তি হয় না। এসব যে অভাবের কর্ম। অভাবের কর্মের স্বভাবই এই যে সে সদা সর্বদা অভাব জাগ্রত করে রাখে। তাই স্বভাবের কর্ম করতে হয়। এমন বন্ধন নিতে হয় যাতে সর্ববন্ধন নষ্ট হয়। গ্রন্থিমোচন আর কি! বাহিরের দৃষ্টি, বাহিরের ভাব কমিয়ে দিয়ে পারি, অর্থাৎ তার জ্ঞানলাভ করতে পারি। আলোকের বিকীরণ বিচ্ছুরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, চৈতন্য সম্বন্ধে সে নিয়মগুলির অধীন নয়। আলোক নিজে কোন বস্তুকে প্রকাশ করতে পারে না, প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারে মাত্র। যে কক্ষে কোনও দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট জীব নাই, সেখানে অতি উজ্জ্বল আলোকও কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। আলোক কেবলমাত্র বস্তুর রং, আকার, গতি প্রভৃতি প্রকাশ করতে পারে, শব্দ বা গন্ধ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু বস্তুর নানাপ্রকার গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি চৈতন্যের নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু চৈতন্য ও আলোকের মধ্যে এই সব মৌল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈতবেদান্তীরা বলতে দ্বিধা করেন না যে, আলোকের মত চৈতন্যও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। কোন নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্রিয়াকলাপ যেমন কোন প্রদীপের আলোককে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ বা অভিভূত করতে পারে না, তেমনই জগতের ঘটনাসমূহ চৈতন্যকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ বা উত্তেজিত বা অভিভূত করতে পারে না। আলোকের মত চৈতন্যও (অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাও) নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। কিন্তু আলোক ও চৈতন্যের মধ্যে মৌল পার্থক্যের কথা মনে রাখলে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলিকে

নিতান্তই অযৌক্তিক বলতে হবে। যে অন্তঃকরণ জড় দেহের অংশ তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ বলে এবং তার ওপর শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিফলনের ফলে সেই অংশ ভাস্বর হয়ে উঠে এবং নিকটস্থ বস্তুগুলিকে আলোকিত করে। জড় অন্তঃকরণ দ্বারা চিদালোক বিকীরণই জ্ঞান বা চৈতন্য। এই ধরনের আরও যে সব উক্তি অদ্বৈতবাদীদের গ্রন্থগুলির নানা স্থানে দেখা যায় সেগুলিও অনুরূপভাবেই অযৌক্তিক। অদ্বৈত বেদান্তীরা অবশ্য বলতে পারেন যে তাঁরা নাট্যশালা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত উপমা হিসাবেই ব্যবহার করেছেন, আক্ষরিক অর্থে নয়। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁদের এই অত্মপক্ষ সমর্থন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করবেন এরূপ মনে হয় না।

সুতরাং চৈতন্য আত্মার গুণ অথবা একটি স্বয়ং-প্রমাণ, স্বয়ং-নির্ভর, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং-সৎ পদার্থ এবং আত্মার সঙ্গে অভিন্ন, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। চৈতন্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে আমরা সাধারণতঃ যে সব ধারণা ব্যবহার করি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে হবে। আমরা এই প্রসঙ্গে যে সব শব্দ (যথা 'চিৎ', 'সম্বিৎ', 'জ্ঞান', 'প্রতীতি', 'অনুভব' 'প্রকাশ' প্রভৃতি) ব্যবহার করি তাদের মধ্যে অনেকগুলিরই তর্কশাস্ত্রসম্মত লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তা হলেও সেগুলি কোন্ কোন্ পদার্থকে নির্দেশ করছে (অর্থাৎ তাদের অর্থ কি ?) তা স্থির করা অসম্ভব নয়।

অদ্বৈতবেদান্তীরা প্রায়ই 'জ্ঞান' বা 'চৈতন্য'কে 'প্রকাশ' শব্দের অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তাঁরা বলেন যে 'চৈতন্য' বা 'জ্ঞান' প্রকাশাত্মক বা প্রকাশ-স্বরূপ * অর্থাৎ চৈতন্য এবং প্রকাশ সমার্থক। কোথাও কিছুর প্রকাশ ঘটছে, আর 'জ্ঞান' বা 'চৈতন্য' কোন না কোন আকারে আছে, এই দুটি একই কথা। কিন্তু 'জ্ঞান' বা 'চৈতন্য'কে বুঝাতে যদি 'প্রকাশ' শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে 'প্রকাশ' এবং 'অ-প্রকাশ' (প্রকাশের অভাব) এই দুইয়ের পার্থক্য কি তা বুঝাতে হবে। কোন বস্তুর অস্তিত্ব এবং প্রকাশ এই দুইকে আমরা একই ব্যাপার বলে মনে করি না। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বুদ্ধি বলে যে একটি বস্তু সম্বন্ধে আরও কিছু ঘটা দরকার যার ফলে এর 'প্রকাশ' হল এমন কথা বলা চলে। অন্তর্মুখী হয়ে যেতে হয়।" তারপর সুর করে বললেন—

* "অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যানুমান", যোঃ তঃ, পৃঃ ১৯৬।

তাঁহারি গান গেয়ে,
চল তাঁহার দিকে ধেয়ে,
যায় দিন বয়ে।

*   *   *

এই বিড়লা পার্কে আনন্দময়ী মাকে প্রথম দর্শন করেই রামতরণবাবু (Advocate) ভক্ত হয়ে পড়েন। তিনি গুরুপ্রিয়াদেবীকে লিখেছিলেন, "বিড়লার মন্দিরে আমি দূরে দাঁড়াইয়া মার মূর্তি দেখিতাম। নিরাভরণা, কিন্তু মা আমার কি সৌন্দর্যই না ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে কত স্ত্রীলোক, কত সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু মার রূপের কাছে তাহাদের যেন মলিন দেখাইত। আর মার হাসিটুকু কখনও মৃদু কখনও উচ্চ। কি মধুর সেই হাসি! আজিও তাহা চিন্তা করিতে করিতে সব ভুলিয়া যাই।"

আবার একদিন শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বর! বাংলার তপোবন। সারদার পীঠস্থান। জ্ঞান ও তপস্যার প্রাণকেন্দ্র।

তপস্যাভাস্বর রামকৃষ্ণ, 'অমৃতস্য পুত্রঃ'—অভীঃ মন্ত্র এবং আত্মার ঐশ্বর্য লাভ করেন এবং 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী সার্থক করতে এই পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হয়ে মাটির মানুষের সঙ্গে কত না লীলাখেলা করেছেন!

মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধক রামকৃষ্ণের নরদেহ ছিল মহাকালীর লীলাক্ষেত্র। তাঁর নিত্যশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল দেহ-মনকে কেন্দ্র করে কত বিচিত্র লীলাই না হয়েছে প্রকটিত এই মহান তীর্থভূমিতে।

যুগে যুগে শক্তি সাধনার তপস্যা করেছে এই বাংলাদেশ। যেখানে তপস্যাবলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দেহ ও আত্মার হয়েছে পুনর্মিলন। এরই সাগরতীর্থে রাজা ভগীরথের তপস্যাশক্তিতে শঙ্করের শিরোবন্দিনী সুরধুনী অবতরণ করে কত সহস্র অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধার করেছিলেন। আর এই সুরধনীকে অবলম্বন করেই শত শত জনপদ হয়েছে সুজলা সুফলা, কূলে কূলে অগণিত তীর্থ হয়েছে রচিত। কত শত মঠ মন্দির হয়েছে নির্মিত। শতবর্ষ পরে সেই সুরধুনীর পশ্চিম কূলে দক্ষিণেশ্বরে মাতৃমূর্তিতে মহাকালী জগজ্জননী যেন আবার হলেন আবির্ভূতা। মন্দিরের প্রস্তরময়ী মূর্তি— চিন্ময়ী শক্তিতে হয়ে উঠলেন উদ্ভাসিত। বিশ্বজননী ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিলেন আনন্দময়ী মূর্তিতে। আবার শুরু হোল ভক্ত ও ভগবানের লীলা, লীলায় ছাওয়া এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে, পঞ্চবটিতে।

আনন্দময়ী মা মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটিশোভিত

উদ্যান ও সুবিশাল দেবালয়ের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। গঙ্গার পূত বাষ্পকণাপূর্ণ পবন মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করতে লাগলো। লীলাময়ী মা ভাব-বিহ্বল হলেন। সেই অপার করুণাময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলেন।

অবশেষে মা এসে বসলেন নাটমন্দিরে। মা আনন্দময়ী তো নয়, যেন মন্দিরের দেবী সন্তানবৎসলা বিশ্বমাতা অধিষ্ঠিত হয়েছেন নাটমন্দিরে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। ভক্তরাও গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হয়ে মাকে ঘিরে বসলেন। শুরু হোল কীর্তন, নাম গান, মাতৃসঙ্গীত :

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না।
রসনা! যা হবার তাই হবে॥
দুঃখ পেয়েছো (আমার মনরে) আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতন থেকো (মনরে আমার)
কালী বলে ডেকো,
এ দেহ ত্যাজিবে যবে॥
....
একবার ডাক কালী তারা বলে
জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে।

ভজন কীর্তন মাতৃসঙ্গীত অবিরাম চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে ভক্তরা ভোগের আয়োজন করলেন। শ্রীআনন্দময়ী মার ভোগ হলো। জগজ্জননীর ভোগ, মানবী মূর্তিতে কালীমায়ের ভোগ। মহামহোৎসবের আনন্দে আবার নেচে উঠলো, জেগে উঠলো, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আগমনে।

দিবাবসানে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরের লীলা সাঙ্গ করে নৌকা করে আবার ফিরে চললেন কলকাতার পথে। সে দিনটা ছিল শুক্লাদশমী। জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের দিন। কয়েকটি প্রতিমার নৌকাও গঙ্গাবক্ষে ভেসে চলেছে।

আনন্দময়ী মাও একটি জীবন্ত প্রতিমার মত বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে ভক্তরা কীর্তন করছেন:

—মেরে তো গিরিধারী গোপাল
দুসরো ন কোই।

গঙ্গার মলয় বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে কীর্তনের সুমধুর স্বরধ্বনি।

১৫

'জগতের যে গতাগতি তার আদি অন্ত নাই, সেই হিসাবে জগৎও সত্য। আর এক কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্ব উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎও যে সত্য তা মেনে নিতে হবে।'

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'র তাৎপর্য সম্বন্ধে মা বলছেন। সীতাকুণ্ডে শঙ্কর মঠে। সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে। সীতাকুণ্ডে এসে মা এই শঙ্কর মঠে অবস্থান করছেন। ভোলাগিরি আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে এবং তাঁর মনের সংশয় দূর করবার জন্য মা এই কথা বললেন। এই প্রসঙ্গে মা আবার বলছেন, "অনেকদিন পূর্বে রমণার কালীবাড়ী থেকে শাহবাগে ফিরবার সময় পথে তিনজন গৈরিক বেশধারিণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার মধ্যে একজন হঠাৎ এই শরীরটাকে ডেকে ধর্ম-তত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে করতে বললেন, দেখুন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। প্রত্যুত্তরে এ শরীর বললো, 'জগৎ মিথ্যা কি করে বলি? জগতের ভিতরই ত সকলের জন্ম। জন্মিয়াই ত এই জগৎ দেখা যাচ্ছে। বাস্তবিক যখন সেই জ্ঞান লাভ হবে তখন বলা চলে জগৎ মিথ্যা।' এই কথায় তিন সন্ন্যাসিনীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। একজন খুব রেগে অন্য জনকে বলে উঠলেন, 'এক সাদা কাপড় পরা ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোকের কাছে আবার কি জানতে গিয়েছিলে'? এবারে মা ব্রহ্মচারীটির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাস্যের উচ্ছলতায় কঠিন তত্ত্বপূর্ণ বিষয়টি সকলের কাছেই যেন সহজ হয়ে উঠলো।

মা আরও সহজ করে সরল ভাষায় কঠিন তত্ত্বকথা বলছেন: শাস্ত্র-পড়া—

বই-পড়া বিদ্যা—যেমন টাইম টেবল—গাইড দেখে রাস্তা চলা। গাইডে যা থাকে তা ছাড়া রাস্তায় আরও কত কি আছে। যা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করতে পেরেছে তাই আছে গাইডে। তা ধরে ধরে সেই রাস্তায় চললে দেখা যায় আরও কত কি দেখবার ও জানবার বিষয় আছে। গাইডে কি আর সব লিখতে পারে? যারা সেই পথে চলে তারা বুঝতে পারে যে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা সত্য, কিন্তু তা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখতে পারে? শাস্ত্র রচয়িতারা যা উপলব্ধি করেছেন সবকিছু কি লিখতে পেরেছেন?

ভগবান সকল শাস্ত্রের ধ্যান ধারণার অতীত। আর শাস্ত্রকাররা সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষের তত্ত্ব কতটুকুই বা অনুধাবন করতে পারেন? মানুষের দৃষ্টির সীমা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভগবান অসীম অনন্ত বিরাট। দৃষ্টির অগম্য।

তবে যেমন টাইম টেবল দেখেই ট্রেনের পথ চলতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলতে হয়। শাস্ত্রীয় কথার ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।

আত্মাতে বিশ্ব আছে, আবার বিশ্বতেও আত্মা আছে। অনুরাগের বর্ষণ অধিক হলে বিশ্বও থাকে না, আত্মাও থাকে না। অথচ উভয়ই অভিন্ন সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ, পূর্ণসত্তা। খণ্ড আনন্দে প্রাণটা তৃপ্ত হচ্ছে না, তাই মানুষ অখণ্ড আনন্দ পাবার জন্য অখণ্ডের সন্ধান করছে। শান্তি ও আনন্দ সকলেই চায়। আবার এই জাগতিক শান্তি ও আনন্দে মানুষ তৃপ্ত হচ্ছে না। পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের খোঁজ করছে। তবেই বুঝতে হবে সেই পূর্ণ আনন্দের অনুভব তার আছে, তাইতো মানুষ এই খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হচ্ছে না। সেই জন্যই সাধনার দরকার। বাস্তবিকই সাধন ভজন করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ বুঝতে পারে আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তিনি যেমন করাচ্ছেন আমি তেমনি করছি।

কিন্তু সেই অনুভূতি কোথায়? বাস্তবিক এই অনুভূতি হলে দুঃখ কষ্ট কিছুই বোধ থাকে না।

শঙ্কর মঠ থেকে মা এলেন শম্ভুনাথের মন্দিরে। পাণ্ডারা আনন্দময়ী মার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। সন্ধ্যায় শম্ভুনাথের আরতির পর দেবীরূপে শ্রীমারও আরতি করলেন। আনন্দময়ী মা এমনই এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী নারী যে, তিনি যখনই যে কোন দেবমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানেই সাধু সন্ত ও পাণ্ডারা তাঁকে

মন্দিরের বিগ্রহের মতই—পূজা আরতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এবং সৃষ্টি হয়েছে এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশের।

অবশেষে শ্রীমা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন :

জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর।

নির্জন পাহাড়। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরমা। একটানা অনুচ্চ শৈলমালা। তাদের ঢালুতে পলাশের জঙ্গল। উপরের দিকে বনগুল্ম ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে। গাছের ছায়া হ্রস্বতম হয়ে উঠেছে। বন্যফুলের সুবাসে জ্যোৎস্না-শুভ্র প্রান্তর ভরপুর। এমনই এক অপার সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে মাতৃকণ্ঠের সঙ্গীতের সুমধুর স্বর, দূরে-দূরান্তে। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে নীরবে পান করছেন সেই মাতৃকণ্ঠ নিসৃত অমৃত-সুধা।

তারপর অধিক রাত্রিতেই সেই মুক্ত জ্যোৎস্না শুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে ভক্তরা মাকে নিয়ে নামগান করতে করতে ফিরলো শঙ্কর মঠে।

আবার একদিন সীতাকুণ্ডের লীলা সমাপন করে মা এলেন চট্টগ্রামে। উঠলেন কালী বাড়ীতে। বহু ভক্ত সমাগম হোল।

কীর্তন শুরু হোল

যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল

যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে

যেথায় নিঠুর হরি ॥

* * *

কীর্তনে মার ভাব-সমাধি হোল। অপরূপ রূপে প্রতিভাত হলেন ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। তারপর মা ধীরে ধীরে মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বললেন, শুধু নাম, নামেই সব হয়। এ শরীরটা সব সময়ই বলে, যত বেশী সময় পার তাঁর জন্য দাও। তাঁর সঙ্গ করো। নাম করা অর্থই তাঁর সঙ্গ করা। তাঁকে ডাকা বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনাকে আপনিই ত ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা সেই প্রাণের প্রাণ, সেই প্রিয়কেই তো ডাকা। কতকাল ভোগকে ডাকিয়া ভোগ করিয়া আসা হইয়াছে তো? যাঁহাকে ডাকিলে ত্যাগ-ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলিয়া যায়, সেই ডাকটিই যে প্রিয় হওয়া চাই। আকুল প্রাণের ডাক হওয়া চাই। নামের ভিতর দিয়েই তিনি স্বয়ং ধরা দেন।

অমৃত ভোজী হও তোমরা। অমর ভোজী। অমর পথে চলো। যেখানে মৃত্যু নাই। দুঃখ নাই। ব্যাধি নাই।

অমর আত্মা—অমর পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি। আসল কথা কাজ চাই। কাজ কর, সৎ কাজের মধ্য দিয়া অগ্রসর হও। সময় দাও, বাস্তবিক তাঁকে চাও। প্রাণ দিয়ে চাও। দেখবে সব ঠিক মিলে যাবে। কারণ তিনি যে স্বয়ং প্রকাশ।

একজন ভক্ত বললেন—হ্যাঁ মা, তাঁর কৃপা হলেই ত চাইতে পারবো ?

মৃদু হেসে মা বললেন, "এই যে তিনি বলছো, এখনও তাঁর সাথে পরিচয় হয় নাই। শুধু মুখেই বলছো তাঁর ইচ্ছা। তোমরা পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাস করো। চাকুরী-বাকুরী করো, কত কাজ কর্ম করে থাকো। তখন তোমাদের শক্তি আছে বলেই মনে করো। সেই সময় তাঁর ইচ্ছা বলে বসে থাকো না। আর ভগবানের নাম করবার জন্য একটু সময় দিতে বললেই তোমরা বলে থাকো তাঁর ইচ্ছা না হলে কি করে করবো। তাঁর ইচ্ছা না হলে কিছুই হয় না সত্য, কিন্তু সে কথা বলবার অধিকারী হয়েছো কি ? সেই জন্যই এই শরীরটা বলে, এই যে তোমাদের শক্তি আছে বলে মনে করো—ইহা দ্বারাই তাঁকে একটু ডাক। 'তাঁর ইচ্ছা' বলে বসে থাকলে চলবে কেন ?"

শ্রীমার যুক্তিপূর্ণ কথামৃত পান করে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। ধীরে ধীরে বহু বিশিষ্ট পরিবার মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের সকলেই মায়ের অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়লেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দীগেণ ঘোষালের বাড়ীতে 'মা' পদার্পণ করলেন। সেখানে মেডিক্যালের ছাত্র তরুণ শ্রীহীরু চক্রবর্তী মাকে দর্শন করে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনিই হলেন স্বামী তন্ময়ানন্দ। এইভাবে মা আনন্দময়ী চট্টগ্রাম শহরকে জাগিয়ে মাতিয়ে নামামৃত সুধা পান করিয়ে চলে এলেন পরৈকোড়া গ্রামে। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের পিতৃভূমিতে। নদীর ঘাট হতে গ্রামবাসীরা কীর্তন করতে করতে মাকে নিয়ে চললেন। এ যেন স্বয়ং গৌর সুন্দর রাধা ভাবে বিভোর হয়ে জীবের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ নাম বিলিয়ে চলেছেন। শ্রীমা কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করলেন। মাধব ও মনসা মন্দিরের মধ্যস্থিত ঘরখানিতে এসে মা উঠলেন। কীর্তন বন্ধ হলো না। অবিরাম চলতে লাগলো। নামগান,

কৃষ্ণ গুণগান। বিখ্যাত কীর্তনিয়া জ্যোতিষ রুদ্রও এসেছেন। কীর্তনে মেতেছেন। মহানন্দে কীর্তন করছেন। অবশেষে মাকে ঘিরে কীর্তন হলো শুরু। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন :

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

মা বসে বসে দুলে দুলে ভাবে বিভোর হয়ে নামগান করছেন। শিশু বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই কীর্তনে মেতেছেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। দ্বিপ্রহরে মার ভোগ হোল। ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন। শ্রীমার জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে সকলেই মুগ্ধ তৃপ্ত। মাকে ছেড়ে কেউ যেতেও পারছেন না কিসের এক অপূর্ব মধুর আকর্ষণ অনুভব করছেন সকলে।

গৃহস্থ বধূরা বলছেন,—'কি করবো ঘরে যে থাকতে পারি না তাই ছুটে এসেছি। মাকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে না।' পুরুষরা বলছেন, 'এমন দেবীমূর্তি আমরা জীবনে দেখি নাই। অনেক সাধুরা ঔষধপত্র দেন তাই সাধুর কাছে ভিড় হয়। আর ইনি তো কিছুই দেন না। তবুও শুধু হাসি ও কথায় এমন মিষ্টত্ব যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না।'

অবশেষে মা এসে উপস্থিত হলেন, কক্সবাজারে। সমুদ্রের তীরে তাঁবু খাটিয়ে ভক্তরা মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। সামনেই সাগর। তার অসীমতা হারিয়ে গেছে দিগন্তে। মাথার উপর মেঘশূন্য নীলাকাশ। ঘনশ্যাম সাগরতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে শ্রীরাধারাণীর চরণ-কমলে। জলের ছলছলানি শব্দ নয়, এ যেন সজল জলদাঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দরের বাঁশী মর্মান্তিক সুরে আহ্বান করে চলেছে শ্রীরাধারাণীকে। সেই ব্রজরমণের বংশীধ্বনিতে মোহিত হয়ে তাঁবুর চারপাশের চঞ্চল ছায়াগুলিও শুরু করে দিয়েছে নৃত্য। সমুদ্রতীরের এই অপূর্ব মোহনীয় রাত্রে ভক্তরা শ্রীআনন্দময়ী মার পদতলে বসে কীর্তন শুরু করে দিলেন :

নবঘন শ্যাম মুরতি মনোহর
হামারি হিয়াপর জাগে,
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময়
পীতবাস দোলে পিঠভাগে॥

মা ভাবস্থ হলেন। ভাব বিহ্বল মায়ের সেই অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী দেবীমূর্তি নয়নগোচর করে কক্সবাজারের ভক্তরা অপার আনন্দ সাগরে যেন অবগাহন করতে লাগলেন।

কক্সবাজার থেকে মায়ের যাত্রা হলো শুরু রামকূটের পথে। রামকূট!

রামকূট পাহাড়। ছোট্ট মনোরম স্থান। এখানে আছে বুদ্ধ শিব ও রামসীতার মন্দির। পুরী সম্প্রদায়ের একজন সাধু এখানে থাকেন। এখন তিনি অসুস্থ, মা রামকূটে এসে সাধুটিকে দেখতে এলেন তাঁর কুটিরে। সাধু মহারাজ জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে অবিভূত ও আনন্দ বিহ্বল হলেন। মায়ের সঙ্গ ছাড়তে মন চাইছে না। বললেন 'আজই এসে আজই চলে যাওয়া কি ভাল হবে মা?'

মৃদু হেসে মা বললেন—'বাবা। আসা যাওয়া নিয়েই ত জীবের সংসার: মনকে তারও উর্ধে স্থাপন করা। সেই পরম চিন্তা পরম পথের যাত্রী হওয়া।' মায়ের মধুর কণ্ঠের কথামৃত পান করে সাধুটি মুগ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধাভরে মাকে প্রণাম করলেন।

ইতিমধ্যে দূর গ্রাম থেকে কীর্তনের দল এসে উপস্থিত হলো। শ্রীমাকে প্রদক্ষিণ করে কীর্তন করতে লাগলো:

প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকরে।
নিতাইর সমান দয়াল আর নাই রে॥

স্থানীয় জমিদার শ্রীঈশানচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র পাল মাকে নিয়ে গেলেন নিজেদের প্রাসাদে। সকলেই মাকে দেবী জ্ঞানে প্রণাম করলেন এবং মাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন।

আনন্দময়ী মা রামকূটের পথে পথে নামগান করে কৃষ্ণনামে মুখরিত করে তুললেন রামকূট পাহাড়। মধ্যরাত্রিতে এসে উঠলেন বিষ্ণু মন্দিরে। পরদিন প্রভাতে লীলাময়ী মা রামকূটের লীলা সাঙ্গ করে আবার ফিরে এলেন কক্সবাজারে। আবার মাতৃনামে প্লাবিত হয়ে উঠলো কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল। জ্যোৎস্না শুভ্র রাত্রিতে সমুদ্রকূল মাতৃনাম সুধায় মুখর হয়ে উঠলো। জ্যোৎস্না পুলকিতা রজনী। স্বচ্ছ নীলাকাশ। সমুদ্র অজস্র রজতধারা বুকে মেখে আনন্দ নৃত্য করছেন। মনে হয় এমনই এক মধু যামিনীতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সমুদ্রকূলে 'প্রতিপদং পূর্ণামৃত স্বাদনং'—রসধারা ভারতভূমিতে অজস্র সিঞ্চন করেছিলেন। আর তারই ফলে দেশ শ্যাম শোভায় কী অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মা আনন্দময়ী আবার সেই বেলাভূমিতে ছড়াচ্ছেন নামবীজ। উষর ভূমিতে এর ফল কত গভীর কত সুদূর-প্রসারী হবে কে বলতে পারে?

মাকে প্রদক্ষিণ করে ভক্তরা গাইছেন:

মম মন্দিরে নাচে গিরিধারী

কিবা নব নব ছন্দে।

সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে

তালে তালে মৃদু মন্দে ॥

কীর্তন শেষে মা বলছেন ভক্তবৃন্দকে। সমুদ্রকূলে তাঁবুতে বসে আজ মা সমুদ্রতীরে গিয়ে বসলেন না। তাঁবুতে বসেই ভক্তসঙ্গ করছেন।

'তোমরা যে মালিক হয়ে বস তাই দুঃখ পাও। মালিক না হয়ে মালী হও। তবেই আর দুঃখ থাকবে না।' এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছেন—'এক সাধু বনে থেকে তপস্যা করেন। হঠাৎ একটি লোকের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হলো। সে এসে সাধুর চরণে আশ্রয় নিলো। সাধুটি এক ছটাক চালের ভাত খান। নিজেই ভিক্ষা করেন। কিন্তু এই লোকটি আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর দুশ্চিন্তা হলো যে আমার আহারের উপর ভাগ বসাবে। কিন্তু আশ্রিত লোকটি খাওয়ার কথা কিছুই সাধুটিকে বললো না। সাধুটি যখন চাল ধুয়ে জল ফেলছেন তখন সে অঞ্জলিভরে সেই জল পান করলো। সাধুটি আশ্চর্য হলেন কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। লোকটি ঐ আহারেই তৃপ্ত হয়ে সাধু সেবা করতে লাগলো। কিছুদিন পর আবার একজন এসে সাধুর কুটিরে আশ্রয় নিলো। এবারে সাধুটি ভাবলেন একজন ত জল খেয়ে আছে এ তা থাকবে না। এ নিশ্চয়ই আমার আহারে ভাগ বসাবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিও আহার সম্বন্ধে কিছুই বললো না। সাধুটি যখন ভাত রান্না করে ফ্যান ফেললেন, সে তাই রেখে দিল। এবং তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে সাধুটির চরণ সেবা করতে লাগলো।

এবারে সাধুটির চৈতন্য হলো। ভুল ভাঙলো, তিনি উপলব্ধি করলেন। মালিক ভগবান। তিনিই সব ব্যবস্থা করেন। যখন যাকে যে কাজে পাঠান তখন তাকে তদুপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি দিয়েই পাঠান। কেউ কাউকে কিছু করে না।

সাধুটি জ্ঞান লাভ করে আশ্রিত দুই জনকে নিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন কঠোর তপস্যা করবার জন্য। ভগবান লাভের জন্য।'

আবার একদিন মা কক্সবাজারের লীলা সাঙ্গ করে কলকাতার পথে যাত্রা করলেন। মা কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। জীবের ঘরে ঘরে নাম বীজ বপন করে চলেছেন।

১৮

'মনের গেরুয়াই আসল সন্ন্যাস।' শ্রীমা বললেন একজন ভক্তকে, তিনি গেরুয়া পরে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা মৃদু হেসে সুন্দর করে কাব্যায়িত করে এই মন্তব্য করলেন।

যে যাই বলুক মনই ত সবকিছু। মন নিয়েই ত কথা। তাইতো মনের সমস্ত কুঠুরিতে জ্বালাতে হবে আলো। সে আলো প্রেমের আলো, ক্ষমার আলো, শান্তির আলো। সাধ্য কি তুমি আমার মনের ঘরটিতে এসে না বস। তোমাকে আমি ধন দিয়ে ভোলাবো না, ভোলাবো মন দিয়ে। এই অন্তরেই ত সুচির নীর-নিবাস। এই মনের মধ্যেই ত সেই মানস সরোবর। মনমালাই হোক জপমালা। তাইতো মা ডাঃ জে. কে সেনকে বললেন—'তুমি ত ডাক্তারী কর, এবার একটু মনের ডাক্তারী কর। তোমরা ত জান রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ পথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ান দরকার। সেই রকম নিয়ম মত নাম করে যাও। মন স্থির হবেই। ফল নিশ্চয়ই পাবে।'

—'নাম ত করি ফল ত দেখি না মা?'

—'দেখ, তোমরা ঔষধ খাও সত্য কিন্তু কুপথ্য কর। তাই ওষুধে ফল দেখা যায় না। ওষুধ হলো নাম, আর পথ্য হলো সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি আর রোগ আরাম হয়? যতই ওষুধ খাও ফল হবে না। তাই ত শরীরটা সবসময়ই বলে যদি ফল চাও শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নাম করে যাও।'

মা এখন দিল্লীতে, উঠেছেন ডাঃ সেনের গাছ ঘরে। মা আবার হেসে ডাঃ সেনকে বলছেন—'তুমি অন্ততঃ কিছু সময় এই গাছ ঘরে গাছ হয়ে বসে থেকো। ধ্যানে বসিও।' তারপর একান্তে বসে ডাঃ সেনের স্ত্রীর সঙ্গেও অনেক কথা বললেন। এই সেনের পুত্র ডাঃ সন্তোষ সেনও মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন।

অবশেষে ভক্ত হারাণবাবু বলছেন—মা, তুমি প্রায় এক বছর পর এলে। আমাদের ত কিছুই হলো না। নামে দেখছি কিছুই হয় না। এত কীর্তন করি, নাম করি, যখন করি তখন আনন্দ পাই। কিন্তু আবার ঘরে গেলেই যেই সেই।

মৃদু হেসে মা বললেন—'দেখ, চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে। তোমরা ওষুধ খাও আবার খেড়েও খাও, তাই ফল পাও না।'

রসিকতাপূর্ণ উত্তরটি শুনে ভক্তরা সকলেই হেসে উঠলেন। মাও হাসতে লাগলেন, হাসির উচ্ছলতায় মন্তব্যটি রস ও রহস্যে হয়ে উঠলো ভরপুর।

মা ডাঃ সেনের বাসায় লীলা সাঙ্গ করে ফিরে এলেন ভক্ত পঞ্চুবাবুর বাসায়। তাঁবুতে বহু ভক্ত সমাগম হলো। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী অগণিত মানুষ। কীর্তন শুরু হলো।

—কে রে যমুনার তীরে বাঁশরী বাজায় ও তার ইন্দ্রনীলমণিরূপ দেখে যাবি আয়।

কীর্তনে মার ভাব সমাধি হলো। মায়ের এই ভাব-বিহ্বল মূর্তি দর্শন করে একজন অ্যামেরিকান ভদ্রলোক অভিভূত হলেন এবং মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে মায়ের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর স্বভাবেরও পরিবর্তন হলো। চায়ের নেশাও ছাড়লেন। এক বেলা আহার শুরু করলেন। তিনি সাধুদর্শনের জন্যই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আনন্দময়ীমাকে দর্শন করে পরিতৃপ্ত হলেন এবং নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। মায়ের অযাচিত কৃপা বর্ষিত হলো এই বিদেশী ভদ্রলোকটির উপর। মা যে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা!

দিল্লী আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো আনন্দময়ী মার আগমনে। কৃষ্ণ কীর্তনে। ঘরে ঘরে শুরু হোল কৃষ্ণ কীর্তন—আনন্দময়ী কীর্তন। ভক্তরা জ্যোতিষচন্দ্রের রচিত মা কীর্তন শুরু করে দিলেন:

ডাক মা মা মা মা মা মা মা,
বল মা মা মা মা মা মা মা,
গাও মা মা মা মা মা মা মা,
ভজ মা মা মা মা মা মা মা,
জপ মা মা মা মা মা মা মা,
ডাক বল গাও ভজ জপ মা মা মা।

* * *

১৩৪৮ সন।

শ্রাবণ মাস সমাপ্তির দিকে। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ। সকলেরই চোখে জল। মা শুধু স্থির। ধীর। শান্ত। রাত্রি ১২টার পর ভাইজীর অবস্থা যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, তখন মা রোগীর নিকট হতে

উঠে নিজের খাটখানিতে এসে বসলেন। ডাক্তার তাঁর শেষ চিকিৎসা আর একটা সেলাইন ইনজেকশন দিলেন। রোগীর জ্ঞান আছে। মৃদুস্বরে বল্লেন,—মা, কৈ? মা—মা! ভাইজীর সেই করুণ হৃদয় বিদারক কণ্ঠস্বরে ভোলানাথ, হরিরাম, গুরুপ্রিয়া দেবী ও উপস্থিত অন্যান্য ভক্তজনদের চোখ হয়ে উঠলো অশ্রুসিক্ত। মা ধীরে ধীরে উঠে আবার রোগীর শয্যাপার্শ্বে এসে বসলেন। মাথার তালুতে হাত দিলেন। রোগীও ক্ষণিকের জন্য হলেন শান্ত। এ যেন মাতৃহারা শিশু ফিরে পেলো তার মা'কে।

অবশেষে সত্যসত্যই সেই ভীষণ দিনটি হলো উপস্থিত। ১৩৪৪ সালের ২রা ভাদ্র, বুধবার। ইংরাজী ১৯৩৭ সাল। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে সন্তানবৎসলা মা আনন্দময়ী ও ভক্তবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে জীর্ণ পিঞ্জর ছেড়ে মহান আত্মা মহাকাশে বিলনী হবার জন্য যেন পাখা মেলে দিলো। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত!

একটি পরম ভাগবত জীবনের হলো অবসান। একটি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো যেন মহামায়ার হৃদয়াকাশ হতে।

ভোলানাথ বলছেন, 'শেষ সময় পর্য্যন্ত জ্যোতিষের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর একটু পূর্বে আমাকে বললো, বাবা, দেখলেন তো, এই সংসারে কেহ কারো নয়। একমাত্র শ্রীশ্রীমাই সত্য। তারপর মা—মা বলে প্রণব উচ্চারণ করলো। হরিরামকে ডেকে বললো, We are all one। মা, আমি এক। বাবা, আমি এক। তারপর মা—মা ডাকতে ডাকতে লীলা সাঙ্গ হলো।'

একজন ভক্ত লিখছেন, 'দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে ভাইজী আমাদের একজনকে ডেকে লিখে রাখতে বললেন,—'আমরা সকলেই এক। মাকে যে অন্তরে বাইরে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। কি আনন্দ! কি সুন্দর!'

গুরুপ্রিয়া দেবীর ভাষায়,—'রোগীর অবস্থা ভয়ানক। আমরা কাঁদিতেছি। দাদা (ভাইজী) মৃদুস্বরে বলিতেছেন,—'খুকুনী নাম শুনাও।' আমি চোখের জল মুছিয়া মা নাম শুনালাম। একটু পরে বলিতেছেন, কি সুন্দর! আবার বললেন, খুকুনি কি সুন্দর! একটু পরে আবার এক অঙ্গুলি উঠাইয়া বলিলেন, '—সব এক। এক ছাড়া কিছুই নাই।' হরিরাম কাঁদিয়া বলিল ভাইজী! প্রত্যুত্তরে বললেন,—এক কথা খেয়াল রাখ না ভাই, 'এক-সব এক!'

আমি বলিলাম, দাদা, বেশ মা'র কোলে শুইয়া আছেন। বলিলেন,

—'মা ও আমি এক। বাবা ও আমি এক। আমরা সবাই এক। এক ছাড়া কিছুই নাই।' পরে সন্ন্যাসমন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন। জোরে জোরে শ্বাস পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে শব্দ বন্ধ হইল। মা'র দৃষ্টিতে ও কৃপার ভিতর থাকিয়া ধীরে ধীরে মহাপুরুষ আটান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগের দুই এক মিনিট পূর্বে আমি খাট হইতে নামাইয়া লইলাম। মা'র চরণ মাথায় ছোঁয়াইলাম। বালিশে মা'র চরণ ছোঁয়াইয়া রাখিলাম। মা চুপ করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। আত্মসমাহিত। ধ্যানস্থ। আমি সকলকে বলিলাম, '—মা নাম শুনাও।' তাহা আরম্ভ করিতেই শেষ নিঃশ্বাস পড়িল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন,—'এই ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত নয়। এ শরীর ও তোমাদের ভাইজী উহা পূর্বেই জানতো। সে ফিরিবার পথে এ শরীরকে বলেছিলো, আলমোড়াতে তার দেহপাত হতে পারে। তাকে সন্ন্যাস দেবার জন্য কৈলাসে এ শরীরের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিল। আরও অনুরোধ করেছিল সে যেন সংসারের সকল বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করতে পারে। তার এইস্থানে দেহত্যাগের কারণ হলো, তার পূর্ব জীবনের সহিত এই স্থানের ও এখানকার লোকেদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।'

ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর দিন মা সমাধিস্থ হলেন। দীর্ঘ ছয়দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় রইলেন একই ভাবে। শ্রীশ্রীমায়ের সেই অনির্বচনীয় ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ। আর অভিভূত হলেন একজন বিদেশিনী। ফরাসী মহিলা মিসেস পেণ্টরোজ। মা'কে দেখছেন আর অশ্রুধারায় হচ্ছেন অভিষিক্ত। জীবনে যা কখনও দেখেননি তাই আজ দেখছেন। বিশ্বজননীর প্রকাশমূর্তির দর্শন হলো। দৃষ্টি স্থির। শান্ত। স্নিগ্ধ। শরীরের নড়চড় নেই। মহাভাবে পূর্ণ এক মাতৃমূর্তি। যাঁর চিরকল্যাণময়ী জীবনের স্পন্দনে শুষ্ক প্রাণও হয়ে ওঠে মঞ্জরিত। যাঁর স্বতঃউদ্গত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অলক্ষ্যে অধ্যাত্মপথে মানুষের চিত্তগতি নানাদিকে হয় প্রসারিত। সেই জ্যোতির্ময়ী মহাভাবময়ী বিশ্বজননীর মূর্তি দর্শন করে অভিভূত হলেন মিসেস পেণ্টরোজ।

পরে তিনি ভক্তপ্রবর হরিরাম যোশীকে বলেছিলেন,—''আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি, কিন্তু মার মত এমন পূর্ণভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমি যখন আলমোড়াতে মা'র সমাধি অবস্থায় মা'র কাছে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম মা'র শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল।

আমি ভাবিলাম হয়তো আমার দেখিবার ভুল হইতেছে। এই ভাবিয়া চক্ষু রগড়াইয়াও দেখি সেই বিরাট রূপ। কিছু সময় পর মা'র শরীর হইতে সূর্যকিরণের মত একটা জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহা স্নিগ্ধ হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমার দেহ মনে কম্পনের সৃষ্টি হইল। সেই সময় মা'র সাথে আমার দৃষ্টি বিনিময় হইল। আমি শান্ত হইলাম। অনেক লোকের ভিড় ছিল। এই ঘটনার পর আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি মনে করি মা'ই পরাজ্ঞান। তিনি আমাকে যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। আমি আরও দেখিলাম মা বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়া সকলকে যেন বলিতেছেন, —'তোরা বাহিরে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস? আমার ভিতরে আয় অন্তর রাজ্যে প্রবেশ কর্।' এই কথা চিন্তা করিলে এখনও আমার দেহে মনে শিহরণ জাগে।"

১৮

দিন সপ্তাহ মাসের পর মাস চলে যায়। আবার আসে নূতন বছর নূতন দিন! শ্রীশ্রীমা এখন নর্মদা তীরবর্তী চান্দোদের বিষ্ণুমন্দিরে। মোহন্তজী মন্দির সংলগ্ন প্রকোষ্ঠটী মা'কে ছেড়ে দিয়েছেন। নর্মদায় স্নান করে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মা কথা বলছেন। কথা নয়, কথামৃত। বাণী! অমৃতময়ী-বাণী! মা বলছেন ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। রুমাদেবী, গুরুপ্রিয়াদেবী, হরিরাম যোশী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ রয়েছেন।

মা বলছেন বীজমন্ত্রের কথা সহজ করে সরল ভাষায়,—ধর্মের পথে যেতে হলে আগে চাই দীক্ষা। তবে কি সংস্কৃত শব্দে দীক্ষা না হলে ভগবানকে ডাকা যাবে না? কোন কাজ হবে না? না—তা ঠিক নয়। বীজ অর্থ কি? বীজ অর্থ হলো বিশেষ পরিচয়। যেমন তোমার জানা আর কিছু পরিচয় নেই। কিন্তু নাম ধরে ডাকলেই কাছে আসলে তার সব পরিচয় পাওয়া যায়। নামের মধ্যেই বীজ আছে। তাই নাম করতে করতে বীজ স্ফুরিত হয়। বীজের মধ্যেও নাম আছে। সবার

মধ্যেই সব। তাই নামের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। অনুরাগ নিয়ে কথা। নিষ্প্রাণ হয়ে ডাকা নয়, হৃদয়ের সুর দিয়ে ডাকা। মাটি যত শক্তই হোক যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে তবে নাম বীজের অঙ্কুর যতই হোক কোমল, মাটি ভেদ করে ঠিক উঠবে। এ শরীরটা সেইজন্য সর্বদাই বলে, যার যে নাম ভাল লাগে সে তাই করতে থাকে। সবার পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ সময় উপযোগী বিবেচিত নাও হতে পারে। তবে কি আর পথ নেই; পথ আছে। সে হলো নাম সাধনা। তাঁকে পাবার আশায় নাম করে যাও। সব মীমাংসা তিনি হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলবেন।

রেজেষ্ট্রি খাতায় নাম লিখাতে হলে ভাল নাম চাই। তোমার যে নাম ভাল লাগে করে যাও। দরকার মত সব এসে যাবে। গুরুর আদেশ বিনা বাক্যে পালন করে যাও। নিজেকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছেড়ে দাও। নিজের কোন ইচ্ছাই বড় করে তুলনা। দেখবে আপনা হতে সব ফুটে উঠবে। কলিযুগে সরল সোজা নাম সাধনেই সব হয় ইহাও ত কথা আছে!

গুরু কে?

'বাপ মা স্বামী শিক্ষক এমন কি যাঁর নিকট হতে কোন একটি বিষয় জানতে পেরেছো, সকলেই ত গুরু। সব কাজের জন্যই একটা উপলক্ষ্য চাই। যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চাও না কেন, গুরুর প্রয়োজন আছে।'

মা আবার বলছেন, 'কর্ম না করলে কিছুই হবে না। কর্ম করা চাই। অশুদ্ধ বন্দন কাটাতে হলে শুদ্ধ বন্দনে পড়তে হয়। যেমন কাপড়ে গেরো দিয়েছো, সেটি খুলতে হলে তার মধ্যে মনঃসংযোগ করে হাত দিয়ে খুলতে হবে। সব কাজই এইরকম।

চিত্তশুদ্ধির জন্যও কর্ম করা প্রয়োজন। নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে করতে কর্মসকল আপনিই ত্যাগ হয়ে যায়। কৌশলের দ্বারা কর্মত্যাগ হয় না। কামনা বাসনা-নিস্পৃহ আত্মাতেই চিত্ত সংযত করবার জন্যই কর্মসাধনা।'

দিবা অবসানে ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। নর্মদা তীরের মন্দির-গুলিতে শুরু হোল সন্ধ্যা-আরতি। আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো মন্দির প্রাঙ্গন। আর নর্মদার জলরাশি। ধীরে বয়ে চলেছে নর্মদা। যেন ছেদহীন একটিমাত্র চিন্তার ধারা। কোন তরঙ্গ নাই, বিক্ষোভ নাই। শান্ত। স্নেহ-মসৃণ।

নর্মদার চলমান জলধারার সঙ্গে আনন্দময়ী মাও ভক্তবৃন্দসহ ভেসে

চলেছেন নৌকা করে। মনে হয় নদীর গতির সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও যেন এক হয়ে মিশে গেছেন। কোন ভাবনা নাই। কোন বেদনা নাই। কোন বাধা নাই। চিরমুক্ত। নিত্য প্রবহমান।

নদীর জলমর্মরে মা আনন্দময়ী যেন শুনতে পেলেন কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মভেদী সুর। মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গান ধরলেন :

হরিনামের তরী বাঁধ ভাই,
দেখ গগনে আর বেলা নাই ॥

মাতৃকণ্ঠের সঙ্গীতে ভরে গেলো শূন্য দিগঙ্গনা। আনন্দ·· আনন্দ··· আনন্দ·· ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার। এইভাবে নৌকা চলতে চলতে এসে লাগলো এক আশ্রমের ঘাটে। আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ আশ্রম দর্পণ করতে এলেন। আশ্রমের মোহন্ত মহা আনন্দে মাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। এই মোহন্তের নাম কৈলাসানন্দ। এঁর গুরু কেশবানন্দ। আর কেশবানন্দের গুরু ছিলেন শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দই দেওঘরের শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরু ছিলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী এই নর্মদাতীরে বহু বৎসর সাধনা করেছেন। এঁরই প্রধানত প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। আশ্রমে আছে শিব মন্দির। এখানে আশ্রমকে বলে কুটিয়া। তারপর মা এলেন নর্মদেশ্বরীর মন্দির দর্শনে। এইভাবে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা নর্মদা তীরের কুটিয়া আর মন্দিরাদি দর্শন করে আবার ফিরে এলেন বিষ্ণু-মন্দিরে।

ব্যাস তীর্থ। ব্যাসদেবের তপস্যার স্থান। নর্মদার একদিকে ব্যাস অপরদিকে পুত্র শুকদেব। পরম পবিত্র ভূমি। নির্জন স্থান। দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির ও আশ্রম আছে। মা ব্যাস তীর্থে স্নান করে ব্যাস-স্ত্রী অনসূয়া দেবীর মন্দির দর্শন করলেন। কত তীর্থ, কত আশ্রম, কত মন্দির! তীর্থে তীর্থে আশ্রমে আশ্রমে মন্দিরে মন্দিরে মা পরিভ্রমণ করছেন।

নর্মদা তীর্থ পরিক্রমা করে মা এলেন গুজরাটে। আমেদাবাদে প্রাণহারা মা আনন্দময়ী অল্পসময়ের মধ্যেই গুজরাটী মেয়েদের প্রাণ জয় করে নিলেন। উপদেশ বাণী দেবার সময় মাঝে মাঝে দুই একটি গুজরাটী শব্দও ব্যবহার করছেন। স্থানীয় লোকেরা মায়ের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে, আনন্দময়ী কথামৃত গুজরাটী ভাষায় ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন।

একজন পার্শি মেয়ে মাকে জিগগেস করলেন,—মাতাজী, আমার কোনরূপ প্রতীক উপাসনা ভাল লাগে না। মন স্থির করবার উপায় কি?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, তুমি শান্তভাবে বসে যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে তা লক্ষ্য করতে থাক। আর কিছু করবার দরকার নেই। ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসই তোমার প্রতীক।

উত্তরটি পেয়ে মেয়েটির মন শান্ত হলো। মাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে প্রসন্নচিত্তে ফিরে গেল। এইভাবে স্ত্রী-পুরুষ যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ও মায়ের মুখনিসৃত কথামৃত পান করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলো। গুজরাট—আমেদাবাদের মানুষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, এমন দেবী মূর্তি আমরা পূর্বে দেখি নাই, ইনি মানবী নন সত্যই দেবী!

প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত কান্তিলাল, রতিলাল, অম্বাশঙ্কর বৈদ্যরাজ প্রভৃতি সকলেই মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়লেন। জ্যোতির্ময়ী আনন্দময়ী মা'র দিব্য আকর্ষণী শক্তি থেকে মুক্ত হতে পারলেন না এবং মায়ের কৃপা লাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলেন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন,—আচ্ছা মা পূর্বজন্ম আছে কি?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন,—আছে বৈকি বাবা! তবে যাদের পূর্বজন্ম পরজন্ম সংস্কার আছে তাদেরই জন্মান্তর হয়। যাদের নাই তাদের হয় না। যে যে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে তার সেইরূপ ভাবই জাগে। সে সেইরূপ কথাই বলে।

এবারে ভক্তটি বললেন,—তাহলে ত মুসলমান কি খ্রীষ্টান হওয়া খুব ভাল। তাদের জন্মান্তর সংস্কার নাই অতএব তাদের আর জন্ম হবে না। আর আমরা, আমাদের কত জন্ম যে যাওয়া আসা করতে হবে তা নির্ণয় করা অসাধ্য।

উত্তরে মা বলছেন,—'বাবা! তুমি ইচ্ছা করলেই কি শুধু এই ভাবটুকু নিয়ে সংস্কারমুক্ত হতে পারো? তোমার সংস্কার যে জন্মগত। আর দেখ, শুধু হিন্দু বা মুসলমান হলেই হয় না। কত মুসলমানের হিন্দু সংস্কার, আবার কত হিন্দুর মুসলমান সংস্কার থাকে।'

এবারে ভক্তটি জিগগেস করলেন,—ভগবানের দর্শন কি হয়? এবং হলে উহা কি ঠিক?

মা বলছেন,—নিশ্চয়ই হয়। যেমন তোমাকে দেখছি, ঠিক এইরকমই দেখা যায়। তবে চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই। চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন। শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ আধার না হলে 'তাঁর' উপলব্ধি হবে কেমন করে বাবা!

—আচ্ছা মা, আমাদের শাস্ত্রে আছে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় অব্যক্ত। যদি তাই হয় তবে তাঁকে জানা যায় কিরূপে?

—বাবা, তুমি একটি ফুল দেখেছো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা, ফুলটা কি রকম? তুমি বললে,—খুব সুন্দর! ফুলটি এই রকম। এই রকম, ইত্যাদি। কিন্তু এই কথায় ফুলের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা হলো কি? তোমার মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারলে কি? তুমি ভাষার মাধ্যমে কোন বস্তুরই সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারো না। একটু আভাস মাত্র দিতে পারো। কারণ বাণী সেখানে কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই। সেইরূপ ব্রহ্মও ব্যক্ত ও অব্যক্ত। জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়—যুগপৎ দুই-ই। সব ভাবই তাতে আছে। তাঁকে উপলব্ধি করাই—তাঁকে জানা।

আনন্দময়ী মার যুক্তিপূর্ণ উত্তরে ভক্তটির মনের সংশয় দূর হলো। নিজের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে নেমে এলো আমেদাবাদের আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার। মা সুমধুর কণ্ঠে গান ধরলেন,

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।
জয়তু শিব শিব জানকী রাম,
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম॥

শ্রীশ্রীমায়ের মধুর কণ্ঠস্বর সকলেরই মর্ম স্পর্শ করলো। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কীর্তনে যোগ দিল। ভক্ত অধ্যাপক নরেশবাবু, অধ্যাপক শচীবাবু, অধ্যাপক নরেনবাবু ও বাবা ভোলানাথ সকলেই ভাবানন্দে বিভোর হয়ে নেচে নেচে কীর্তন করতে লাগলেন। এইভাবে আমেদাবাদের মানুষকে জাগিয়ে মাতিয়ে মা এলেন ডাকুরে। এসে উঠলেন বল্লভ-ভবন ধর্মশালায়। তারপর গোমতীতে (প্রকাণ্ড সরোবর) স্নান করে দর্শন করলেন 'রণছোড়-রায়জী' (বিষ্ণুমন্দির)। প্রবাদ আছে যে দ্বারকানাথ এখানেই আছেন। এখন যে মূর্তি দ্বারকায় আছে তা পরবর্তী-কালের বিগ্রহ। প্রাচীন বিগ্রহ এই রণছোড় রায়জী।

ডাকুর থেকে মা এলেন বরোদায়। দর্শন করলেন শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরের স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে নয়নগোচর করে মুগ্ধ

হলেন এবং হৃদয়াপ্লুত শ্রদ্ধায় নমস্কার করে বললেন,—'মা, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে আছ। তবুও এখানে সকলকে নিয়ে একটু প্রসাদ পেয়ে গেলে আমরা কৃতার্থ হতাম।'

মা অমনি স্বাভাবিক মধুর হাসি হেসে বললেন,—'বাবার দেখা পেয়েছি, বাবার মুখে সৎকথা শুনেছি ইহাই ত প্রসাদ!'

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বললেন,—ব্যবহারিক দিক থেকে তোমায় এ কথা বলছি। তোমাকে কিছু বলা না বলা একই কথা কারণ তুমি বিষয়ের জগতের অনেক ঊর্ধে বিচরণ করছো। তোমার ঐ ভাবাবস্থা কজনে বুঝতে পারে?

অবশেষে অন্নকূটের (ঠাকুরের ভোগ) পর নামগান শুরু হোল। মা ভক্তবৃন্দসহ কৃষ্ণকীর্তনে মাতলেন। স্থানীয় লোকেরা মায়ের ঐ ভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলো। বরোদার শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্লাবিত হয়ে উঠলো মায়ের কণ্ঠ নিসৃত কৃষ্ণকীর্তনে। সকলেই জগজ্জননী-রূপে মাকে প্রণাম করলেন। বরোদার লীলা সাঙ্গ করে মা আবার ফিরে এলেন নর্মদাতীরের তীর্থে। কর্ণালীতে। আনন্দময়ী মা'র অলৌকিক আকর্ষণী শক্তিতে দুই একদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়-গুজরাটী স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে ফল মিষ্টি নিয়ে এসে মা'কে দিচ্ছেন, দর্শন করছেন আর অভিভূত হয়ে মা নর্মদে! মা মহেশ্বরী! বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

একজন ভক্ত অভিভূত হয়ে বলছেন,—'মা, কত মহাপুরুষের জীবনী পড়েছি। কিছু কিছু সাধু সন্যাসীও দেখেছি, কিন্তু এমন আর দেখি নাই। শুনিও নাই। মা! তুমি যে কি তা বোঝা আমাদের সাধ্য নাই। তোমাকে কোনো দেব দেবী বললেও ছোট করা হয়।'

নর্মদার ওপারে আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। পরিপূর্ণ, আলো-ঝলমল। নদীর উপরে ম্লান কুয়াশা চাঁদের আলোয় হয়ে উঠেছে রূপালী। আকাশে চাঁদ ও নক্ষত্রের আলোক স্পন্দনের উত্তরে মাটিতে পতঙ্গরা অবিরাম গুঞ্জন করে চলেছে। পতঙ্গের গুঞ্জন নয়। সঙ্গীতের সুর। নদী তীরের ভগবানের নাট্যশালা হতে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে সেই সঙ্গীতের সুমধুর সুর। রাত্রির এই মহাসঙ্গীতের সুবিশাল জলসায় দূরের নক্ষত্র ও চাঁদের আলোক স্পন্দন হতে অন্ধকারে পল্লবের মৃদু পত্র মর্মর পর্য্যন্ত কত না বিচিত্র তন্ত্রীতে নিত্য উঠছে কত না বিচিত্র সুর। নর্মদার তীরে ভগবানের সেই নাট্যশালায় বসে মা আনন্দময়ী সুমধুর কণ্ঠে গান ধরলেন:

—আমি কি তার সঙ্গ ছাড়া হই,
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে আমায় মা কই মা কই ?
হৃদয়ে জাগায়ে তাঁরে, নামে প্রাণ মাখা থাকে,
আর কিছু না দেখে চোখ, এ ব্রহ্মাণ্ডে আমা বই।
অন্য কথা কয় না মুখে, ব্যথিত হয় সে ব্যথিত দেখে
সমান থাকে সুখে দুঃখে, লোকের নিন্দা শোনে কই ?
শিশু যেমন মাকে ডাকে, মা ডাকে তাঁর আঁখি ঝরে,
পারি কি আর থাকতে দূরে, অমনি এসে কোলে লই।
আমি কি তার সঙ্গ ছাড়া হই—

'ভগবানের দিকে মন বিশেষভাবে রাখতেই হবে। সত্যানুসন্ধানে ভগবানকে নিয়ে থাকাই তো মানুষের কাজ। আর অভাবের ভিতর দিয়েই ভগবানের উপর নির্ভরতা। নির্ভরতাই অনুকূল। নিজেদের তো জানা নেই কিসের ভিতর দিয়ে ভগবান টানেন।

ধ্যান করা চাই। যদি সেই ব্রহ্মধ্যান না আসে, প্রথমে আসনে বসে মূর্তি ধ্যান, তারপর মূর্তি আসনে স্থাপন করে প্রণাম। যে রূপ আসে তাঁকেই ধ্যান করো। দেখো, ভগবান কোন্ রূপে প্রকাশ হন। আসলে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করা চাই।

নিত্য অনর্গলভাবে থাকতে থাকতে কে জানে কখন অর্পণ হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়। তাঁর দয়ায়। এইজন্য সর্বদা অর্পণ বুদ্ধি রাখতেই হবে।'

মা আবার বলছেন, ভক্তপ্রবর শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে। কাশীতে। উঠেছেন ধর্মশালায়। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। তখনও কাশীর আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় নি। শ্রীযুত ভট্টাচার্য মহাশয় জিগগেস করছেন—'মা শান্তি কিসে হয় ?'

মৃদু হেসে মা বলছেন; 'দূর অস্ত হলেই শান্ত হয়। সংসারে কখনও শান্তি হয় না। সংসার ! সং-কে সার করলে কখনও শান্তি হতে পারে ? বিষয় বিষ হয়। অর্থাৎ যেখানে বিষ উৎপন্ন হয়। বাসনা মানে সংসার। সংসার:

মানে দুঃখ। জগৎ-গতাগতিতে সুখ হয় না। বিষয়ের সংসারে বিষয়ের মধ্যে মন রেখে মানুষ কোনদিনই পরম সুখ পায় না। ঈশ্বর চিন্তায়ই একমাত্র শান্তির আশা।'

আবার সাধক ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে বলছেন,—'ধৈর্য ও সহ্য সাধনার মেরুদণ্ড। তুমি মাটির মত সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয়। প্রাণে গঙ্গাবারি ধারণ করতে পারবে। লোকের পূজা পাবে যেমন ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। ঘটকে পূজা করে তেমনি।

আরও বিশদ হওয়ার জন্য মা কাব্যায়িত করে 'ঘটের আত্মকাহিনী' নামে সুন্দর একটা গল্প বললেন।

'একজন পূজা করবার সময় ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছিল। হঠাৎ ঘট কথা বলতে শুরু করলো। ঘটটি বললো, দেখ আমি অনেক সহ্য করেছি তাই আজ পূজা পাচ্ছি। অনেকে আমার গায়ের উপর দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে হেঁটে যেত। কেউ আবার আমার উপর মলমূত্র ত্যাগ করতো। সবই নীরবে সহ্য করতাম। একদিন একটা লোক এসে কোদাল দিয়ে আমাকে কাটতে লাগলো। তাও সহ্য করলাম। তারপর আমায় টুকরীতে ভরে মাথায় তুলে নিয়ে এক জায়গায় রাখলো। কিছুক্ষণ পর একটা লাঠি এনে আমায় খুব পিটলো। তারপর আমার গায় ঠাণ্ডা জল ঢাললো। ঢেলে চলে গেল। প্রাণে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি পেলাম। আবার আমাকে সে পা দিয়ে লাথি মেরে ডলতে লাগলো। হাত দিয়ে আমাকে খুব মললো। গোল একটা পিণ্ডী বানালো। পরে কুমোরের চাকার উপর চড়াল। এবারে আমাকে বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগল। হাত দিয়ে যত্ন করে আমাকে ঘট বানাল। আস্তে করে আমাকে নামিয়ে রাখল। আমি ঐ অবস্থায় রোদে কয়েকদিন পড়ে রইলাম। কখনো ঠাণ্ডায়, কখনো গরমে। নানা অবস্থায় আমাকে রাখা হলো। এরপর আমাকে আগুনের উপর চড়ালো। কি বিরাট অগ্নিকুণ্ড আর তার কি ভীষণ গরম শিখার জিহ্বা। আগুনে পুড়ে পুড়ে আমি যখন লাল শক্ত পাকা হলাম তখন আমাকে পরিষ্কার করে তুলে রাখলো। একদিন আমাকে বাজারে নিয়ে গেল অনেকগুলি ঘট কলসীর সাথে। যে কিনতে আসে সেই তুলে নিয়ে আমাকে টং টং করে বাজায়। শেষ পর্যন্ত একজন পয়সা দিয়ে আমাকে কিনে নিল। আর এখন আমি গঙ্গাজল বুকে পেটে ভরে বসে আছি। দেখ এমন সহনশীল হলে পরে তুমিও প্রাণে গঙ্গাবারি ধারণ করতে পারবে। আমার মতন ধৈর্যশীল হও, তবে তুমিও আমার মতন

লোকের পূজা পাবে। তোমাতেও ঠিক ঠিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।' গল্প শেষে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাসির উচ্ছলতায় রস ও রহস্যে ভরপুর হয়ে উঠলো কাহিনীটি।

কাশী থেকে মা যাত্রা করলেন হরিদ্বারের পথে। পূর্ণকুম্ভের যোগস্নান উপলক্ষে। ১৩৪৪ সাল, ফাল্গুন মাস। মা এসে উঠলেন ধর্মশালায়। কিন্তু মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত ডাক্তার পীতাম্বর পন্থের একান্ত অনুরোধে, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দময়ী সেবাশ্রমে' চলে এলেন। ডাক্তার পন্থ এটোয়ায় সিভিল সার্জন ছিলেন। পেন্সন নিয়ে হরিদ্বারেই বাস করছেন। স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেকদিন। সন্তান সন্ততিও নেই। গঙ্গার উপরে নিজের বাড়ীটিকেই সেবাশ্রম বানিয়েছেন।

ধর্মশালায় মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রক্তশূন্যতা, হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দও চিন্তিত। সেবাশ্রমে এসে ডাক্তার পন্থের চিকিৎসায় রইলেন। কিন্তু অবস্থার কোনরূপ উন্নতি দেখা গেল না। একদিন ডাক্তার পন্থ হাত জোড় করে মাকে বললেন,—'মা, এমন রুগী আমি আরজীবনে পাই নাই। আমার ওষুধে কিছু হবে না। আপনার শরীরের চিকিৎসায় আমার আর কিছুই করবার নেই। আপনি নিজে সুস্থ হবার ইচ্ছা করুন, এই আমার প্রার্থনা।'

মা মৃদু হেসে বললেন,—'ওষুধ যখন খেয়েছি তখন রোগীর সব লক্ষণই প্রকাশ পাওয়া চাই ত? তাই ওষুধ খাওয়ার পরই শয্যা নিতে হয়েছে। ইহা ত হইবেই। যা হইবে পূর্ণ ভাবেই হওয়া চাই ত!

ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার শরীরে অস্বাভাবিক যৌগিক ক্রিয়া আরম্ভ হলো। ঔষধে জ্বর বন্ধ হলো সত্য, কিন্তু আবার আরম্ভ হলো হৃৎকম্প। যে ঔষধ যে রোগের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেই রোগই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠলো। খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা। ডাক্তার পন্থ বিচলিত হলেন। ভক্তবৃন্দ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। মা কিন্তু ধীর স্থির। হেসে হেসে মৃদু কণ্ঠে বললেন,—'নিভিতে গিয়াও বাতি জ্বলিয়া উঠিল। ভালই ত হইয়াছে। আমি ত সকলকেই বলি, বাহির ছাড়িয়া অন্তরে যাইতে চেষ্টা কর। তাই ওষুধও অন্তরকে (হার্টকে) ধরিয়াছে। এ তো ঠিকই হইয়াছে। আমি বলি, বাহির ভিতর এক কর। তাই বাহির ভিতর এখন এক হইয়াছে।' এই কথা কয়টি বলে মা আবার শিশুর মত সরল হাসি হাসতে লাগলেন।

মা আবার বলছেন, এই শরীরটা কি রকম জানো? ভিতরের সব গ্রন্থিই

খোলা, তাই যা কিছু ব্যারাম হয় পূর্ণভাবে হয়। সমস্ত শরীরে ব্যারামগুলিও সাময়িকভাবে বেড়াবার সুযোগ পায়। আবার ওষুধ যখন খাওয়া হয়েছে তাও ঐ রকম সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া গেছে। শরীরটা ত ওষুধ খায় না, তাই শরীরটাকে ওষুধের অধীন করে নিতেও সময় লাগে ত ?

সব কিছু শুনে ভক্তপ্রবর ডাক্তার পন্থ আবার হাত জোড করে বললেন,—'মা, আমি আর ওষুধ দেবো না। আপনি নিজে নিজেই ভাল হন। এই প্রার্থনা আপনার কাছেই করছি।'

এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো হরিদ্বারে আনন্দময়ী সেবাশ্রমে। দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হয়। মা একদিন ভক্ত অভয় ও ভ্রমরকে বললেন সকাল সন্ধ্যায় নাম করে দেখ তো হার্টটা একটু ভাল হয় কিনা। মায়ের কথায় আনন্দিত চিত্তে অভয় ও ভ্রমর নামগান শুরু করলেন।

ভজ শ্রীগোবিন্দ মুখ-চন্দ্র
নিত্যানন্দ জপ রে।
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর নিত্য
চিত্তে স্মর রে ॥

কৃষ্ণনামে মুখরিত হয়ে উঠলো গঙ্গাতীরের সেবাশ্রম।

আবার একদিন কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার পন্থকে বললেন,—'বাবা! একলক্ষে চল, হিসাব করিও না।' এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

একজন লোক শুনেছিলো যে একলক্ষ জপ করলে ব্রহ্মানুভূতি হইবেই। সে স্থির করলো একলক্ষ জপ করবে। জপেও বসলো। কিন্তু মনের স্থিরতা নেই। জপ করে আর একটা টিকটিকির শব্দ পেলেই মনে করে এই বুঝি আমার অনুভব হতে আরম্ভ হলো! এইভাবে তার লক্ষ জপ পূর্ণ হলো কিন্তু কিছুই অনুভব হলো না। কারণ তার মন শুধু চারিদিকের শব্দের মধ্যেই ছিল। আর 'এই বুঝি অনুভব হলো',—এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিল। তাই ফললাভ আর হলো না। তাই বলা হয়,—'পথ চলিয়া যাও, ফলের দিকে চাহিও না।' রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফলের হিসাব করতে গেলেই সেই সময়টুকুই পিছিয়ে গেল। তাই এই শরীরটা বলে, 'এক লক্ষ্যে চল, হিসাব করিও না।'

শিবরাত্রির দিন পূর্ণকুম্ভের প্রথম স্নান। সাধুরা দলে দলে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে চলেছেন। বাদ্য বাজনা ও সাধুদের মুখনিঃসৃত স্তোত্রাদির মধুর তরঙ্গ বয়ে চলে হরিদ্বার—হর কী প্যারীর গঙ্গার জলের উপর দিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের

মেলায় মুখরিত চতুর্দিক। চলেছেন নাগা সন্ন্যাসীরা এক দলে, অপর দলে সন্ন্যাসিনীরা। আবার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা ও কোন কোন মোহন্ত চলেছেন হস্তীপৃষ্ঠে করে যোগস্নানে। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথও ভক্তবৃন্দসহ কীর্তন করতে করতে চলেছেন। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য!

মা বললেন স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে, 'তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদের দলে একত্র হয়ে এই মহাকুম্ভের স্নানে গিয়ে যোগ দাও।'। মায়ের আদেশে স্বামী অখণ্ডানন্দজী গুরু মঙ্গলানন্দ গিরির আশ্রমে কংখলে চলে গেলেন।

হরিদ্বারের আকাশে ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। দিল্লী থেকেও ভক্তবৃন্দ এসেছেন। বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসীরাও এসেছেন মা'কে দেখতে। মা ধীরে ধীরে কথা বলছেন,—'প্রথমে শুদ্ধ কর্মাদির আশ্রয় নিয়ে অশুদ্ধ সংস্কারগুলি নষ্ট করতে হয়। পরে আবার শুদ্ধ কর্মাদিও থাকে না। যেমন গায়ে ময়লা পড়লে সাবান দিতে হয়। সাবানও কিন্তু ময়লা। সাবান মেখে ময়লা উঠান হলো। পরে আবার জল দিয়ে সাবান ও ময়লা দুইই ধুয়ে ফেলা হলো। পাপ কর্ম ত করবেই না। যাতে চিন্তাও না আসে তার জন্য শুভ চিন্তার আশ্রয় নেবে। ভাল মন্দ বিচার করে চলবে। যেগুলি সহায়ক, গ্রহণ করবে, আর যেগুলি অসহায়ক তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করবে। মনের চঞ্চলতা না বাড়িয়ে স্থিরতা বাড়াবার সহায়কগুলি কেবল খুঁজে খুঁজে নেবে। সর্ব অবস্থার মধ্যে সেই সুন্দর রসস্বরূপকে একটু ভাবতে পারলে ভক্তিরস আশা।' মা আবার গৃহস্থ ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছেন,—'তোমরা ত সব সংসারী, তোমাদের বলি, তোমাদের কাছে যখন রোগ শোক-গুলি আসবে, তোমরা মনে কোরো 'অতিথি'। অতিথি মনে করে একটু যত্ন কোরো। সহ্য কোরো। যেমন অতিথি বাড়ি আসলে কাজকর্ম বেশী পড়ে, আরও হয়তো কত রকম অসুবিধা হয়। তবুও গৃহস্থের কর্তব্য আনন্দিত মনে অতিথিকেও শান্তভাবে সহ্য করে যাওয়া।'

মা একদিন বললেন মায়ের স্নেহধন্য ভক্ত অভয়কে আসন প্রাণায়াম ও গ্রন্থিভেদ সম্বন্ধে। —'ভাব অনুযায়ী আসন হয়ে যায়। এক এক আসনে এক একটা ভাব প্রবল হয়। যেমন খাবার সময় এক রকম আসন হয়। ঘুমোবার সময় যে শুয়ে থাকা হয় তাও আসন। আবার বিষয় চিন্তা করবার সময় শরীরে যে এক প্রকার ক্রিয়া হয়, সেও আসন। শ্বাসের গতিও ভিন্ন রকম হয়ে যায়। দেখলেই বোঝা যায় বিষয় চিন্তায় মগ্ন। ঐ ভাবে বসলে তার বিষয় চিন্তার সুবিধা হয় তাই বসবার নমুনা ঐরূপই হয়ে গেছে। এই

রকম আধ্যাত্মিক চিন্তার সময়ও আপনা আপনিই আসন হয়ে যায়। কুম্ভক রেচক পূরকও আপনা আপনিই হয়ে যায়। এইভাবে যখন আসনাদি আপনা আপনিই হয়ে যায় তখনই বুঝতে হবে গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে।'

'কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে নাভিমূলে যে সব গ্রন্থি আছে তা খুলতে আরম্ভ করে। এইসব গ্রন্থিভেদ হলেই নানারকম শব্দ শোনা যায়। জ্যোতি দেখা যায়। গ্রন্থিভেদ হলে যে শব্দ শোনা যায় তাকেই বলে অনাহত ধ্বনি! সর্বদাই হচ্ছে কিন্তু চিত্ত স্থির না হলে শোনা যায় না। জগতের এমন কোনো ধ্বনি নেই যার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে। অথচ জগতের সমস্ত ধ্বনিই এখান থেকে উৎপন্ন। সেই রকম অন্য এক গ্রন্থি ভেদ হলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। এ জ্যোতিঃ ও অপার্থিব। জগতের কোন আলোর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। সংস্কার অনুসারে নানারূপও দর্শন হয়। আবার সমস্ত রূপ একরূপেই লয় হয়ে যায়। জগতের সমস্ত বস্তুই এক মূল থেকে উৎপন্ন। গ্রন্থিভেদ হলেই এসব বুঝতে পারা যায়। যার সমস্ত গ্রন্থিভেদ হয়েছে সেই বুঝতে পারে জগতের সৃষ্টি স্থিতিও লয়ের কারণ।'

কিন্তু 'আমার কুণ্ডলিনী' এই বোধ যতদিন থাকবে ততদিন কলকুণ্ডলিনী তো জাগবে না! ধ্যানও হবে না। ধ্যান করা এক কথা আর ধ্যান হওয়া আর এক কথা। যখন সত্য সত্যই ধ্যান হয় তখন সাধক বুঝতে পারে এ দুটির মধ্যে কত প্রভেদ। সাধন ভজনের লক্ষ্যই হচ্ছে অহঙ্কারকে চূরমার করে দেওয়া। অহং বোধই সর্বনাশের মূল। সবকিছু সুকৃতি অহঙ্কারে নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মলাভ হয় না।'

—'দেখ আম পাকলে বলে না, 'আমি পাকিয়াছি, তোমরা আসিয়া দেখ।' তার রং দেখে ও গন্ধ পেয়েই সকলে বুঝতে পারে আম পেকেছে। তেমনি ভিতরে শুদ্ধভাব জাগলে, কাকেও বলে দিতে হয় না। ব্যবহারে ও চেহারাতেই ধরা পড়ে।'

● ● ●

নানা দেশীয় লোক মা'কে দর্শন করতে এসেছেন। নানা রকমের লোক। কয়েকজন সন্ন্যাসীও এসেছেন। একজন সন্ন্যাসী শাস্ত্রকথা বলতে খুব আনন্দ পান। তাই মা'ও তাঁকে ভাল ভাল কথা শোনাতে বললেন। তিনিও মহানন্দে শাস্ত্রকথা বলতে শুরু করলেন। অনেকেই বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন, কারণ তাঁরা মায়ের কথা শুনতে এসেছেন। অপর দিকে ঐ সন্ন্যাসীর বক্তব্য মা'র কানে কতখানি যে পৌছাচ্ছিল তা মা'ই জানেন।

কারণ মা ত অধিকাংশ সময়ই তদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন। কোন কোন ভক্ত এ বিষয়ে মা'কে বললে, মা বললেন, —'বলিতে দাও, উনি শাস্ত্রের কথা বলিতে ভালবাসেন। শাস্ত্রের কথা ত ভগবানেরই কথা। কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই।'

অবশেষে শুরু হোল কীর্তন। দিল্লীর ভক্তরা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে, 'জয় মা—জয় মা' বলে কীর্তন আরম্ভ করলেন।. আবার শুরু হোল কৃষ্ণ-কীর্তন। সাধু সন্ন্যাসী গৃহস্থ ভক্ত সকলেই কীর্তনে যোগদান করলেন। নাম ধ্বনি গঙ্গার কুল কুল ধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে যায়। সেই মিলনের সঙ্গীত বাতাসকে করে ফেলে আচ্ছন্ন। নৃত্যের ছন্দের মত গঙ্গার জলে ওঠে তরঙ্গ। সেই জল-তরঙ্গের ছন্দ ভক্ত হৃদয়ে দেয় দোলা। আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ ছাড়া আর কিছু নাই এ বিশ্ব ভুবনে।·· ওগো মহানন্দ, অনন্ত, অপার!

কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে মা আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। এখন আর রুগ্ন চেহারার লেশমাত্র নেই। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, ললাটে প্রশান্ত ঔদার্য। দৃষ্টি স্নিগ্ধ। এক অপ্রাকৃত মাধুর্য যেন ফুটে উঠেছে সর্ব-অঙ্গে। মা বললেন, 'তোমাদের কীর্তনই এ শরীরটাকে ভাল করিয়া দিয়াছে।'

—সর্বচিন্তা পরিহারি
কেবল বল হরি হরি!
তাঁকে ভরসা করি
দেও ভব পাড়ি!

গানের মত সুর করে সুমিষ্ট কণ্ঠে মা বলছেন ভক্তদের। দেরাডুনে। মা এখন দেরাডুন আশ্রমে রয়েছেন। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাস। ভোলানাথ অসুস্থ। হরিদ্বার থেকে ভোলানাথ দেরাডুনে এলে, মা ভোলানাথের দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন,—'বিপদ আসিতেছে'।

কলকাতা ও ঢাকার ভক্তরা চলে যাচ্ছেন। মা'কে প্রণাম করতে এসেছেন

সকলে। অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হয়ে মাতৃমূর্তি নয়গোচর করছেন। প্রাণহরা মা কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছেন। অপরূপ জ্যোতির্ময়ী এক মাতৃমূর্তি যেন!

মা সান্ত্বনা দিয়ে ভক্তদের বলছেন, —'আমি হাসিতেছি, আমার জন্ত কি কাঁদিতে আছে? যখন যে অবস্থায় থাক ভগবানের চিন্তাটি যেন ভুল না হয়। প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে যত সময় দিতে পারো ততই শান্তি পাওয়ার দিক।'

—'দিন যায় গো! এদিক উদিকের ভাবনা ছেড়ে এখন নিজের চিন্তা কর নিজেকে খোঁজ। আপনাকে না পেলে শান্তি নাই। নাই। নাই। তাঁকে নিয়ে থাকলেই যে একমাত্র শান্তি।

তাইতো সর্বদাই এ শরীরটা বলে, — আত্মচিন্তা কর। সংসারের গতি তো এইরূপই। কাঁদতে হয় ভগবানের জন্য কাঁদ। ভাবতে হয় তাঁকেই ভাব। কথা কইতে হয় তাঁর কথা কও। আবার গান গেয়ে বলছেন,

—হরি ভজন করো ভাই,
হরি ভজন বিনা অন্য গতি নাই।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অতি গুরুভার ছন্দে দিন আসে রাত্রি যায়। আবার সেই রাত্রি প্রভাত! নব-উষা!

কিন্তু ভোলানাথের শরীরের আর উন্নতি হোল না। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। দিনে দিনে শরীর অবনতির দিকেই যেতে লাগলো। অবশেষে সেই বিপুল বেদনাভরা দিনটি ক্রমে ক্রমে নিকট থেকে নিকটতর হয়ে এলো।

অকস্মাৎ একদিন ভেঙে গেল দেরাদুন আশ্রমে আনন্দমেলা। ১৩৪৫ সালের ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার, জ্যোস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ। চিরসন্ন্যাসী ত্রিব্রতানন্দ-তীর্থ। পরম একটি ভাগবত জীবনের হোল অবসান। একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ আচ্ছন্ন করে ফেললো দেরাদুন আশ্রম বাড়ীর পরিবেশকে। ভক্তরা শোক ভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখলেন তাঁদের পরম আরাধ্য পিতাজীর দেহ নিষ্কম্প. দৃষ্টি স্থির, বদনমণ্ডল অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বিচলিত হলো তাঁদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়।

কিন্তু শ্রীশ্রীমা তখনও ধীর স্থির অবিকৃত, অচল অটল। স্তব্ধ গৃহের নীরবতাকে ভঙ্গ করে মা শুধু কবিরাজ মহাশয়কে বললেন,—'কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত?'

স্তম্ভিত হৃদয়ে কবিরাজ মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন,—'হ্যাঁ মা।'

এইভাবে নিঃশব্দে বাবা ভোলানাথ যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে। ভক্তরা দিব্যদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন মহাতীর্থ হরিদ্বারে। জল-সমাধি দিলেন হরিদ্বারের গঙ্গায়। নিশ্চিদ্র তমসার সাগর অভিমুখে নিদ্রার তরীতে নীরবে ভেসে চললো বাবা ভোলানাথের দেহ। সুরধুনীর পূতধারা বরণ করে নিল বিশ্বপিতার দিব্যদেহ।

* * *

পরবর্তীকালে মা ভক্তদের বলেছিলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথের মৃত্যু-পূর্ব ঘটনার ইতিহাস। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়।

—'মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে ভোলানাথ বলিলেন, ভাত খাইতে ইচ্ছা করে। রাত্রি, তাই তখন দেওয়া গেল না। পরদিন ভোর বেলাতেই ভাতের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু যখন যোগেশ সেই ভাত ও মুগের জুস মিলাইয়া সরবতের মত করিয়া খাওয়াইতে গিয়াছে তখন বলিলেন,—'মা খাইয়াছে? আমি মা'র প্রসাদ ছাড়া খাইব না।' যোগেশ তখন আমার মুখে একটু দিয়া দিতেই কাতরভাবে ভোলানাথ এই শরীরকে বলিলেন,—'তুমি আমাকে এই প্রসাদ খাওয়াইয়া দিবে?' এ শরীরের ত হাত ঠিক থাকে না। আচ্ছা দিতেছি। বলা হইল। তারপর এই শরীরই তাঁকে খাওয়াইয়া দিল। খুব তৃপ্তির সহিত সবটা খাইলেন। তারপর বলিলেন,—'আমি তোমাকে একটু স্পর্শ করিব।' এ ভাবটাও—শিশু যেমন মা'কে ধরিতে চায়, একেবারে সেই ভাব। অবশেষে তিনি দুই হাত দিয়া এ শরীরের হাত ধরিলেন। কিন্তু তখনই কাঁপিতে কাঁপিতে হাত পড়িয়া গেল। আবার বলিলেন,—'তোমাকে দেখিব।' প্রথমে পরিস্কার দেখেন নাই, পরে পরিস্কার দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, 'দেখিযাছি।' এই বাসনা জাগিবে এই শরীর জানিত। তাই কবিরাজকে পূর্ব হইতেই বলা হইয়াছিল, —'চোখটায় মাখন দিও। সাবধান মত সর্বদা লক্ষ্য রাখিও।'

একবার জিজ্ঞাসা করা হইল,—'তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে?' বলিলেন, হ্যাঁ—হইতেছে। তবে কোথায় হইতেছে কিছুই বুঝি না।' সে সময় ভোলানাথ কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। এ শরীর ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না। হঠাৎ খেয়াল হইল, এ শরীরের হাত দিয়া দুই তিনবার ভোলানাথের মাথা হইতে সর্ব শরীর হাত বুলাইবার মত হইয়া

গেল। এর পূর্বে ত আর অসুখ অবস্থায় ধরা ছোঁয়াও বড় হয় নাই। সকলকে দিয়া সেবা করাইয়া নেওয়া হইতেছিল মাত্র। কিন্তু এখন এইভাবে একটা ক্রিয়া হইয়া যাওয়ার পর, দেখা গেল ভোলানাথের ভাবটা বেশ আনন্দপূর্ণ। আর যেন কোন যন্ত্রণা নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল,—এখন কোন কষ্ট আছে কি? হাসিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন,—'আনন্দ।' আমায় বলিলেন,—'আমি যাই?' এ শরীর বলিল,—'আসা যাওয়া কি আছে? ও কথা বলিতে নাই।' তখন বলিলেন,—'তুমি ত চিরদিনই আমাকে এ আশা দিয়া আসিতেছ।' সন্ধ্যার পূর্বেই গোলা একছড়া মালা দিয়া গিয়াছিল। সে অবশ্য রোজই দিত। আজ খেয়াল হইল—মালা ছড়া নিয়া ভোলানাথের ঘরে রাখিয়া দিলাম। কারণ এ শরীর জানিত রাত্রিতেই মালার দরকার হইবে। তখন ত আর মালা পাওয়া যাইবে না। শান্তি বলিয়াছিল সে মালাটি ছুঁইতে গিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। তাহার নাকি মনে হইতেছিল মালাটি জীবন্ত। ভোলানাথের শরীর ত একেবারে উলঙ্গ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বলিলেন,—'আমার শীত করিতেছে।' তখন তাঁহারই একটা গেরুয়া রঙের কাপড় দিয়া তাঁহার শরীর ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কিছুদিন পূর্বে যখন সন্ন্যাস নেওয়ার কথা হয়, তখন ভোলানাথ একবার এই শরীরকে বলিয়াছিলেন,—'তোমার উপর ত আমার মাতৃভাব আছেই, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না। যদি সন্ন্যাস নেই তবে প্রথম তোমাকে সকলের সম্মুখেই 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তোমার হাত হইতেই প্রথম ভিক্ষা নিব।'

এ শরীর দেখিতেছিল ঘটনাচক্রে তাহার সে কথা পূর্ণ হইয়া গেল। অন্ন ও বস্ত্র শেষ এই শরীরের হাত দিয়াই নিল। সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করা হইল,—'তুমি ত কীর্তন ভালবাস, একটু কীর্তন শুনিবে?' বলিলেন, —'আচ্ছা'। তখন যোগেশকে ডাকিয়া কীর্তন করিতে বলা হইল। কিছুক্ষণ কীর্তন হইল। এ শরীর জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি সন্ন্যাস মন্ত্র মনে আছে?' বলিলেন, 'আছে।' এ শরীর দেখিতেছিল প্রণব ও মন্ত্র বাহিরে উচ্চারণ না হইলেও ভিতরে যে হইতেছিল তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল। সন্ন্যাস মন্ত্র যদিও তিনি মানস সরোবরের তীরে শুনিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসের ক্রিয়াদি তাঁহাকে কুম্ভ স্নানের দিন করিতে বলা হইয়াছিল। এই অনুসারে তিনি নিজে নিজেই সেইদিন ক্রিয়াদি সব করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষের এবং ভোলানাথের দুইজনেরই দেখিলাম সন্ন্যাস নেওয়ার

পর আর বেশীদিন শরীর রহিল না। দেহত্যাগের কিছু পূর্বেই ভোলানাথের মাথায় (ব্রহ্মতালুতে) এ শরীরের হাত রহিয়াছিল। এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐভাবেই হাত রহিল। সরাইয়া লইবার খেয়াল হইল না। এ শরীর ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না—হইয়া যাইতেছিল। শেষ নিঃশ্বাস পড়িলে এ শরীর কবিরাজকে বলিল,—'কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত?' সে স্তম্ভিতভাবে এ শরীরের মুখের দিকে চাহিয়া ভোলানাথের দিকে চাহিল, ও বলিল,—'হ্যাঁ-মা!' এইভাবে নিঃশব্দে সব হইয়া গেল।' ভোলানাথের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল।

—'ওরে, এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।'

ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।—'দুখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁকে কোনও রহস্যময়ী আশ্রয় ভেবো না। মনে রেখো তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন। শুভমতি দিয়ে কর্ম করো। কর্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা। সব কাজেই তাঁকে ধরে থাকা। তাহলে আর কিছুই ছাড়তে হবে না। তোমার কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। লক্ষপতির সন্ধানও সহজ হবে। মা যেমন শিশুকে যত্নের দ্বারা বড় করেন, দেখবে তুমিও তাঁরই কৃপায় বড় হয়ে উঠছো। তাইতো এ শরীরটা বলে, '—যখন যে কোন কাজ করবে এক মনে সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে। তাহলে কর্মে পূর্ণতা আসবে।' আবার বলছেন, 'আমি' তো 'তুমিই'। একমাত্র তিনি আছেন বলেই ত 'আমি'। মাত্র একটিবার বিশ্বাস শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে সে বলতে পারবে—মাগো! তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না। তবে সত্য সত্যই মা নিজ স্বরূপে তাকে দেখা দেবেন। তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তাকে তুলে নেবেন।

* * *

আমি কারে বা এখন ডরি
(আমি) বাহিয়া চলেছি তরি॥

হোক্ না কেন তুফান ভারি।
ডুববে না হয় তরি॥
যাঁর যাত্রি তাঁরই তরি।
আমি তাঁর ভরসাই করি॥
(আমি কারে বা এখন ডরি)

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে আনন্দময়ী মা গান করছেন। রায়পুর আশ্রমে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর পদ্মপলাশ নেত্রদ্বয়। ভক্তরা মায়ের সেই ভাবমগ্ন অপরূপ মূর্তি নয়নগোচর করছেন আর শুনছেন তাঁর কণ্ঠনিসৃত সুমধুর সঙ্গীত। সঙ্গীত নয় যেন কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিনী। একটা ক্লান্তিহীন অনির্বাণ উৎসাহের প্রেরণা। কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধ করুণা যেন তাঁর ভিতর থেকে উথলিয়ে উঠছে। কি আনন্দ! মা যে আনন্দময়ী! দিবসের খর আলো স্নিগ্ধ মৃদু হয়ে আসে। বাতাস স্বচ্ছ অমলিন। আশ্রমগৃহের বুকে নামে দিনশেষের ধূসর ছায়া। পাখীরা ঘরে ফিরে আসে। চারিদিকে ডাকতে থাকে ঝিঁঝিরা। গৃহাভ্যন্তরে জ্বলে প্রদীপের আলো। শিখাময়! স্নেহময়! আর সেই আলায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আনন্দময়ী মা'র হাসিভরা মুখ।

সৃষ্টিলীলার অপার বিভূতি যে মাতৃভাবের দ্যোতনায় জগৎ চরাচর দীপ্তিমান হয়েছে, সেই অখণ্ড মাতৃভাবের সর্বতোমুখী প্রকাশ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সকল কথা ও কার্য্যে, সকল লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়। ভক্তজনের নিকট শিশুকন্যার মত আব্দার। শরণাগত আর্তের প্রতি মাতৃরূপে অভয় প্রদান, জিজ্ঞাসুর নিকট বাণীরূপে অন্তর্জগতের সত্য জ্যোতি প্রকাশ করা সকলই এক মহাশক্তির লীলা বিলাস।

শ্রীশ্রীমা তাঁর কণ্ঠনিসৃত অপূর্ব কথামৃত পান করাচ্ছেন ভক্তদের। মা লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাঁর অনুভূতিলব্ধ কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে সরল ভাষায় বলছেন,—জ্ঞানরাজ্যের চরম কথা।

—'প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সুখ দুঃখ। প্রকাশ হবার জন্যই তাঁর কৃপা প্রার্থনা, তাঁর নামরূপ চিন্তা। বিষয় চিন্তা—মৃত্যু চিন্তা। বিষয় চিন্তায় যে শক্তিক্ষয়, ভগবচ্চিন্তায় শক্তিবৃদ্ধি। তাঁর কৃপা স্মরণ। নাম স্মরণ। রূপ স্মরণ। অনুক্ষণ তাঁর স্মরণই অমৃতত্ত্ব।

শ্রেষ্ঠ দান—ভগবানকে আত্মসমর্পণ। নির্ভরতাও যে এ পথের অনুকূল। পারছি না, পারবো না, এদিকেই যাবো না। এ ভাব নয়। 'আমি পারবই। তিনি যেভাবে রাখেন সেইভাবেই থাকবো।' যাঁর সৃষ্টি, যাঁর দেহ, তাঁকেই

তা সমর্পণ করে, শান্তভাবে থাকা।······নামময় হয়ে যাওয়া। নাম কর। নাম কর। শুষ্কতা অবসাদ আসলেও ওষুধ গেলার মত তাঁরই স্মরণ, তাঁরই চিন্তন করা। নাম নিয়ে পড়ে থাকা। অনুকূল সাহায্য আসবেই। একসময় শুনতে পাবে মহাসমুদ্রের আওয়াজের মত অবিশ্রান্ত সেই নাম মালা একমাত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরের গুণগান করছে এবং জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্রই সেই ধ্বনিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেই বলে নামময় হয়ে যাওয়া। এই জন্যই সাধন ভজন তপস্যা করা।

আবার দেখ ভগবান লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে যে তাপ-সহন করতে হয় সেই তাপ সহন দ্বারাই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। যেমন দেখ না যজ্ঞ করতে গিয়ে আগুনের তাপ সহন করছো, আবার সেই অগ্নিতে সব আহুতি দিচ্ছ। জপ করতে বসলে জপ করতে ইচ্ছা করে না। অধৈর্য সত্ত্বেও যে চেষ্টা করছো, তাইতো হলো তাপ সহন করা। আবার উদয়াস্ত কি অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ করবে সঙ্কল্প করে নাম আরম্ভ করছো। নাম যজ্ঞে কি করছো? না, বাজে চিন্তা, বাজে কথা, নামরূপ যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছ। অসহনীয় হলেও সঙ্কল্প রক্ষার জন্য তাপের মত সহ্য করেও নাম করে যাচ্ছো। নামের আনন্দ আর সাধারণ লোকের কতটুকু সময় থাকে? কিন্তু এই যে ভগবৎ কৃপালাভের জন্য যে তাপ সহন করা হচ্ছে তাই আবার ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। একেই তপস্যা বলে।

তাঁকে পাবার জন্য যে অস্থিরতা বা মনের চঞ্চলতা তাহাই তাঁকে পাওয়ার পথের সহায়ক। চঞ্চল মন নিয়ে তাঁর পূজা, তাঁর নাম জপ-এতে কি ফল হবে? ইহা ভাব কেন? লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক তাঁর জন্য যে কর্ম করা, উহাও এক রকমের তপস্যা। অলক্ষিতভাবে তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। কারণ সৃষ্টি স্থিতি লয় সব সময়ই হয় কি না। এই যে সংসারে যে তাপ মনে করা হয় তাও কিন্তু তপস্যা। যেমন রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেও ছেলেরা পড়বার জন্য স্কুল কলেজে যাচ্ছে, বড়রা চাকুরী করতে যাচ্ছে—এ সবই তপস্যা। অবশ্যই ভগবানের জন্য বা ভগবৎমুখী কর্ম হওয়া চাই।

বাসনাতেই তো কর্মের সৃষ্টি। ভগবান লাভের বাসনাকে বন্ধনের কারণ বলে না। জাগতিক কর্মের অনিচ্ছার ভিতর যদি 'ভগবৎ প্রাপ্তি কর্ম ইচ্ছা থাকে তবে তা বন্ধনের কারণ হয় না। কাজেই ভগবৎ কর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন।'

মা আবার বলছেন, 'দেখ, তোমার ভিতরেই সব আছে। তুমি যে আনন্দ

চাচ্ছ তাও তোমার ভিতরেই আছে। তোমাদের বাহির ভিতর আছে কিনা তাই ভিতর বলা হয়। সদ্‌গুরুর কৃপাতেই তার প্রকাশ। কর্ম থাকতে গুরু-শক্তি উপলব্ধি হয় না। তাই কর্ম শেষ করার জন্য পুরুষকারের দরকার।কর্ম করেই কর্ম শেষ করতে হয়।পুরুষকার মানে কি ? পরমপুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা।

পুরুষকারের মূলে ইচ্ছাশক্তি এবং কৃপার মূলে গুরুশক্তি। গুরুশক্তি ইচ্ছাশক্তিরও মূল। গুরুশক্তি থেকেই ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা গুরুশক্তির ওপর নির্ভর করে। গুরুশক্তি মহাশক্তি। আবার মহাশক্তিতে ইচ্ছাই নেই। ইচ্ছাহীন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা। গুরুশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই দুই ক্ষেত্রেই একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ মহাশক্তিই কাজ করে থাকে। মূলে একমাত্র মহাশক্তির স্বভাবই খেলা করছে। গুরুভাব স্বীকার করলেই ইহা যেমন সত্য, গুরুভাব অস্বীকার করলেও ইহা তেমনই সত্য।

তোমার গুরু যিনি জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি তোমারই গুরু তিনি। তাইতো বলা হয়, গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে গুরুদত্ত বীজ জপ করা, ইষ্ট ধ্যান করা, ইষ্ট নিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশের দিকে যাওয়া। তুমি দুর্বল নও। তোমার ভিতরেই সব। তুমি যে অমৃত। অমর। সেটা প্রকাশ কর। অমর পথে চল। অমরপন্থী হও। মৃত্যুপন্থী হয়ো না। মনুষ্য জন্ম পেয়েও যদি সেই পথে যাওয়ার চেষ্টা না কর তবে পশুপক্ষী হতে প্রভেদ কী ? আপনার প্রকাশের জন্যই নিজের কল্যাণের দিকে, ভগবানের দিকে যাওয়া উচিত। ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজই। মন্ত্র জপ করো। কোন্ মন্ত্র ? গুরু যা বলবেন তাই শ্রেষ্ঠমন্ত্র। ঠিক ঠিক গুরুমন্ত্র জপ করলে প্রকাশ ছাড়া হতেই পারে না। ভগবানের রাজ্য এমন সুন্দর ! তিনি নিজে যদি পড়ান তবে পাশ না হয়েই যায় না। গুরুশক্তি প্রকাশ হলে ফেল আর হয় না। আগুনে প্রবেশ করলে জ্বলবেই। সর্বনাম সর্বরূপ আবার অনাম অরূপ। তিনি সসীম আবার তিনিই অসীম। তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও তিনি। যে নাম ভাল লাগে, সর্বনাম সর্বরূপ ত আছেই। আবার যদি নিরাকার ভাল লাগে তবে অনামী অরূপ। তাঁর সঙ্গে দোকানদারী ব্যাপার বৈশ্যবৃত্তি না রাখা। এতদিন ধরে ধ্যান করলাম, কত জপ করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না এ বুদ্ধি রাখতে নেই। ধৈর্য ধরে প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা। তিনি যে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, আপনের আপন, পরম বন্ধু। জীবের একমাত্র দাতা। প্রকাশ না হয়েই যায় না। নাম নিতে নিতে সর্বনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ, তাহা প্রকাশ হয়।

উপলব্ধি হয়। তা কি বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায়? তিনিই স্বয়ং গুরুরূপে এসে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দেন। প্রকাশিত হয়ে যান। ভিতরেই সব, বাহিরে কিছু নেই। আসলে খোঁজ আস্‌লে আসল প্রকাশ হয়।

তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না, ইহা তো হইতেই পারে না। রাস্তা লম্বা কি ছোট এ প্রশ্ন মনেও স্থান দিতে নাই। আমাকে পাইতে হবেই। এই ভাবনাই রাখ। তোমার পূর্ণ শক্তি তুমি লাগাও, তবেত তুমি পাবে। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা এই বোধ রাখতে হয়: তিনি কি প্রকাশ না হয়ে পারেন?

একজন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করলেন,—'মা সংসারের কাজের মধ্যেই ত ডুবে আছি, কখন নাম করবো?

মা হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে সুর করে বললেন,

মনমে হরিকা নাম
হাতমে দুনিয়াকা কাম
ইস্‌সেই মিলেগি পরমাত্মা রাম।

এই ভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো রায়পুর আশ্রমে। মা অধিক রাত্রিতেই শয্যা গ্রহণ করলেন।

আবার রাত্রি প্রভাত! নব উষা! প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ কিরণ এসে নৃত্য করতে শুরু করে দেয় আশ্রম গৃহের দেয়ালে। সুললিত কণ্ঠের উচ্চারণ ধ্বনি গৃহাভ্যন্তর হতে উত্থিত হয়। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে সে ধ্বনির মধুর তরঙ্গ বয়ে চলে। ভক্ত সাধু সিং সুর করে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করছেন

তীরথ্‌ নাবা, জে তুদ্‌ ভাবা, বিন ভাঁনে কি নাই করি।
জেতী সিরসঠ্‌ উপাই বেখা, বিন্নু কর্‌মা কি মিলে লই।
মত্‌ বিচ রতন্‌, জবাহার মাণিক,
যে ইক গুরাকী শিখসুনী, গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই।
সভন্‌ জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই॥*

---

*শ্লোকের অর্থ='পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্থে কেহ স্নান করতে সমর্থ হয় না। অনুভব ভিন্ন ঐ তীর্থলাভ করবার অন্য উপায় নাই। যত প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে, তার আত্মকর্ম ভিন্ন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। সকল মনুষ্যের জ্ঞানরূপ মণিমাণিক্যাদি বিরাজ করছে। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন প্রকাশ হয় না। নানক বলছেন, পরমাত্মার অনুভব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সদ্‌গুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহলাভ হয়। পরমাত্মা যে সকল জীবের একমাত্র দাতা তাহা কখনও ভুলিব না।'

*　　　*　　　*

ধর্মপ্রাণ সাধু সিং শিখ ধর্মাবলম্বী। অনেকদিন হলো মায়ের সংস্পর্শে এসেছেন। তিনি মাকে বলেন,—"মা, আমি দেখি আমাদের 'গ্রন্থসাহেবের' ভিতর যাহা লিখা আছে, আপনার মুখ হতে সেই সেই ভাবের কথা শুনতে পাই। আমার ইচ্ছা আপনার কাছে একটু গ্রন্থসাহেব পাঠ করি।" মা মৃদু হেসে বল্লেন, 'বেশ তো তোমার ইচ্ছা হয়েছে পড়বে।' তাই প্রভাতে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করে ভক্ত সাধু সিং মা'কে শোনাচ্ছেন। মা যে বিশ্বজননী! হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী মানুষেরই মা। আনন্দময়ী মা বিশেষ কোন দেশের জাতির বা বিশেষ কোন সঙ্ঘ-জননী নন। সর্বকালের সর্বদেশের সকল জাতির, প্রতিটি জীবেরই যে মা! মা হলেন পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা!

ভাবানন্দময়ী মা গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনতে শুনতে ভাবস্থ হলেন। ভাব-সমাধি। ভাবে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্ত সাধু সিং।

১৫

—'আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করছো, কেন করছো?'

আনন্দময়ী মা জিগগেস করছেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে। দক্ষিণেশ্বরে। পঞ্চবটীতে।

তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের ৩রা কার্তিক, (ইংরাজী ১৯৩৮ সন) বৃহস্পতিবার। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দ সহ এসেছেন বাংলার তপোভূমি দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুও এসেছেন। বসেছেন মায়েরই কাছে। পঞ্চবটীতে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ধীর ভাবে বললেন সুভাষচন্দ্র—'আনন্দ পাই।'

মা আবার জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা ইহা কি নিত্য আনন্দ, না খণ্ড আনন্দ?'

প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন,—'তা' ত বলতে পারি না।'

এবারে মা মৃদু হেসে বললেন,—'এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটিও একটু করিও বাবা! যদিও তোমরা বলতে পারো, এই কাজ ত নিজের জন্য করছিনা। সকলের উপকারের জন্য। কিন্তু এই শরীরটা বলে' এই কথা বলেই মা আবার বলছেন,—দেখ বাবা, এই শরীর তো আর লেখাপড়া কিছুই জানে না, তোমরা যা বলছো, তাই বলা হয়ে যাচ্ছে। তবে এই একটা কথা, সবই কিন্তু নিজের জন্য। কর্ম করার মধ্য দিয়েও মানুষ সেই আনন্দই চাইছে। সকলেই সেই এক অখণ্ড আনন্দ চাইছে। কেন চায়? কারণ সেই রসটা যে সকলের ভিতরেই রয়েছে, আর জানা আছে বলেই ত আবার চাইছে। তাঁকে পাওয়াই ত পরম পাওয়া। তবে তোমরা বলতে পারো যে, এই সব করে কি হবে? তাইতো এই শরীরটা বলে,—বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায়, মানুষের যদি আত্মদর্শন হয়, নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তার দ্বারা জগতের অনেক উপকার স্বভাবত হয়ে যায়। যেমন এম. এ. বি. এ. পাশ করে শিক্ষকরা কত মূর্খকে বিদ্বান করে দিচ্ছেন।'

মা আবার মিষ্টি হেসে বললেন,—'বাবা! তুমি ত কত যায়গায় বক্তৃতা টক্তৃতা দেও। এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।'

সুভাষচন্দ্রও মৃদু হেসে বললেন,—'আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি মা, আমি এসেছি শুনতে। আপনার কাছ থেকে কিছু শুনে আনন্দ পেতে।'

মা অমনি বলে উঠলেন, 'তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?'

প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন,—'চেষ্টা করবো।'

আনন্দময়ী মা বললেন, 'শুধু বাইরের দিকে লক্ষ্য রেখো না বাবা, একটু ভিতরের দিকেও লক্ষ্য করো। তাহলে সেই পথের সন্ধান পাবে। তোমার ত শক্তি আছে।'

সুভাষচন্দ্র জিগগেস করলেন, 'সেই পথ কি?'

মা বললেন, 'সেবা। বাস্তবিক সেবার ভাব জাগলে, সেই পথ দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যায়।'

আনন্দময়ী মা যেন শোনাচ্ছেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে সেই প্রাচীন যুগের ঋষিদের কথা। মানব সভ্যতার প্রভাতে ছায়াচ্ছন্ন তপোবনে ঝঙ্কৃত সেই শাশ্বত মন্ত্র:

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * *

'হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ !. শ্রবণ কর, আমি. পথ পাইয়াছি। যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায় ।'

* * *

অবশেষে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ভবিষ্যতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভক্তি-বিগলিত চিত্তে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মা'কে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থেকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে হৃদয় তাঁর ভরে উঠলো দিব্যানন্দে।

* * *

—'মার বুঝি এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়লো?' বলছেন শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। বালানন্দ আশ্রমের মোহন্ত। বৈদ্যনাথ ধামে।

মা হঠাৎ কলকাতা থেকে এসেছেন দেওঘরে। বৈদ্যনাথ ধামে। ভক্ত প্রবর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মাকে আশ্রমে নিয়ে এলেন। কামধেনু মাতার মন্দিরে মা'র থাকবার ব্যবস্থা করলেন। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে আছেন। গুরুপ্রিয়া দেবীও আছেন। বাইরে দিবসের পীত আলোক ম্লান হয়ে আসে। ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মা'র গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা, ফল পুষ্পাদি দিয়ে প্রণাম করলেন পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'কে। তারপর আবদারের সুরে বললেন, "—এবার কিন্তু শীগ্‌গির মা'কে ছেড়ে দেবো না। এগারো বছর পর ছেলেকে মনে করে এসেছো। একবার এখানে এসেও দেখা না দিয়ে চলে গিয়েছিলে। এবার কিছুদিন থাকতে হবে কিন্তু মা।"

মৃদু হেসে স্নেহময়ী জননী বললেন, '—জানই ত এই মেয়েটার মাথা খারাপ, কখন যে কি খেয়াল হয়। এত যে তোমরা আদর যত্ন করছো অনুরোধ করছো, কোনো দিকে যেন লক্ষ্য নাই। মাথা খারাপ কিনা বাবা—কি বল ?'

আশ্রমের অন্যান্য ব্রহ্মচারীরাও শ্রীশ্রীমা'কে কিছুদিন থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আনন্দময়ী মাও মধুর বাক্য ও মিষ্টি হাসির মধ্য দিয়ে সকলকেই আনন্দদান করতে লাগলেন।

অবশেষে মা ব্রহ্মচারী মোহনানন্দজীর সাথে আধ্যাত্মিক আলোচনা শুরু করলেন। নানাকথা প্রসঙ্গে মোহনানন্দ মহারাজ জিগগেস করলেন,—'আচ্ছা

মা, প্রাণবায়ু স্থির করবার উপায় কি ?' প্রত্যুত্তরে মা বললেন, '—দেখ বাবা ! প্রাণবায়ুরও তরঙ্গ আছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মন মন্ত্র শ্বাস এক করতে হয়।'

'—তিনি অনন্ত। তাঁর পথে যাত্রা করলে যাত্রাও ত অনন্তই হবে ? তবে কি এ যাত্রার শেষ নেই ? আবার প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মচারী মহারাজ।

মা সহজ করে সরল ভাষায় বলছেন,—'অন্তের মধ্যে অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যে অন্ত সবই যে আছে। দেখ, অনন্তের কথাটা যে তাও অনন্ত। কতটুকু কথায় হবে ? আর বাইরেই বা কতটুকু শোনা হবে ? সাধনার গতিও অনন্ত। তোমরা সে অনন্ত বলে থাক তোমাদের কাছে অনন্তত্ব কখন প্রকাশ পায় ? যখন অনন্ত বোধ আসে তখনই ত ? বোধে এলেই স্বরূপের প্রকাশ। অনন্ত যাত্রার সফলতা। তুমি নিজেই যে অনন্ত। তুমি নিজেই এক। স্থূলতঃ কি দেখতে পাচ্ছ ? না। স্থূলত কি দেখছো ? তোমার হাত ধরলে—ও কে ? বল আমি। পা ধরলেও বলবে আমি। যে কোন অঙ্গ ধরবো বলবে—'আমি'। দেখ তোমার শরীর রূপে যে প্রকাশ পাচ্ছে, তোমার সৃষ্টির কারণ ত বলতে পারবেই না। তোমার জন্মটা বাদই না হয় দিলাম। শৈশবের প্রথম জ্ঞানের সাথে সাথে কি কি করছো সব বলে দিতে পারবে ? তাও বাদ দিলাম। গত পাঁচ বৎসরের কথাই বল ত ? তোমার জীবনের কি কি ঘটনা হয়েছে বলতে পারবে না। এক বছরের কথাই বল। এক মাসের কথাই বল। একটা দিনের কথা। অন্তত আজ সকাল বেলাটা হতেই বল ত ? আচ্ছা তাও ছেড়ে দিলাম, গত পাঁচ মিনিটের কথাই বল ত ? তোমার মনটা কোথায় গিয়েছিলো তাও ঠিক ঠিক বলতে পারবে না। স্থূলতঃ তোমার এই শরীরের মধ্যেও মুহূর্তে মুহূর্তে কত সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়ে যাচ্ছে তারও সংখ্যা দিতে পারবে না। সামান্য মনের গতিই যখন এই রকম, অন্ততঃ এখন দেখ। যাত্রাটা যদিও অনন্ত, আবার একের গতির ধারাও ত রয়েছে। কোন্ মুহূর্তে সেই জ্ঞানের যোগ আসবে কে বলতে পারে ? কাজেই নিজের খোঁজেই নিজের যাত্রা করা। আসল কথা নিজেকে জানা। আমি অনন্ত গতিরূপে আমিই এক। আবার আমিই বহুরূপে প্রকাশ। জাগতিক যে সব তোমরা বহুরূপে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু যেখানে রূপ অরূপের দ্বন্দ্ব নাই সেই চিরশান্তত্ব অবস্থাটা চাওয়াই জীবের স্বভাব। যেমন জঙ্গলের মধ্যে থেকে জঙ্গল কেটে রাস্তা করে বের হওয়া হয়। তোমরা সব সময়ই-জাগতিকের মধ্যেই আছ কিনা তাই অস্থিরত্ব। কিন্তু তরঙ্গশূন্য যে স্থিরত্ব

তার আভাস পেতে হলে সব সময়ই তোমাদের সেই তরঙ্গরূপী শ্বাস প্রশ্বাস, তার দিকে স্থির লক্ষ্যে মনটা রাখলে সহায়ক হয়। এ সবকিছুই এক। নিজ স্বরূপ জানাই হলো লক্ষ্য।'

মা আবার ব্রহ্মচারীজীকে লক্ষ্য করে বলছেন,—'বাবা! তুমি ত সাধক। মনের দ্বারাই সাধকরা একত্বে পৌঁছুবার যাত্রী হয়। গুরুর কৃপায়ই খণ্ডত্ব ও অখণ্ডত্ব, সীমা ও অসীম, অনন্ত গতি, অনন্ত রাস্তা, অনন্ত ভাব, সবই নির্দ্বন্দ্ব-রূপে তার কাছে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সৃষ্টি স্থিতির মধ্যে যতক্ষণ থাকবে—এসব কথা আসবেই। আর আসাটাও মঙ্গলকর। এই সব বিচারে না আসলে নির্দ্বন্দ্বরূপে বাক্ নির্বাকাতীত হবে কিরূপে?'

কথা শেষে মা তদ্‌ভাবে বিভোর হলেন। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ আনন্দময়ী মা'র মুখনিসৃত কথামৃত পান করে তৃপ্ত হলেন।

এই ভাবে মা আনন্দময়ী দেওঘর বালানন্দ আশ্রমকে প্লাবিত করে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে।

*　　　*　　　*

শরতের নিস্তব্ধ প্রভাত! আকাশে নির্মল নীলিমা। সূর্যদেব উদয়াচলের পথে। কিন্তু মাঠে তখনও শিশির বিন্দু ঝক্ ঝক্ করছে। সুপ্ত প্রান্তর থেকে মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীর ধীরে ধীরে আসছে ভেসে। আর্দ্র নীরব বনভূমিতে বিহঙ্গদলের প্রভাত-কল-কাকলী।

নব-উষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বিন্ধ্যাচলের আশ্রম গৃহ। মা এখন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে অবস্থান করছেন। গৃহান্তরাল থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে মাতৃকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের স্বর। অপরূপ স্বপ্ন সৃষ্টিকরা সে সঙ্গীত! দিব্য সঙ্গীত! ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ী গাইছেন,

—গোকুল বিহারী, দয়াময় হরি,
বৃন্দাবন বনচারী।

প্রভাতে মাতৃকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতে ভরে যায় শূন্য দিগঙ্গনা।···আনন্দ··· আনন্দ···আনন্দ ছাড়া কিছুই নাই এ বিশ্বভুবনে।· ওগো মহানন্দ·· অনন্ত অপার ··।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। ব্রহ্মানন্দময়ী মা ভাবে বিভোর হয়ে নামগানে মেতে উঠেছেন। মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢুলু ঢুলু। দুই চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। অপূর্ব দীপ্তি স্ফুরিত হয়ে চলেছে সর্ব অঙ্গ দিয়ে। লীলাময়ী মা

আনন্দময়ী সঙ্গীত শেষে সমাধির গভীরতায় ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে বসে আছেন, ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী, ভক্ত অভয়, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। মা আনন্দময়ীর সেই লোকাতীত মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে মা মৃদু কণ্ঠে বলছেন,—'দেখ ভক্তি সাধনার দ্বারা যদি উন্নত হতে চাও তবে অখণ্ডভাবে কীর্তন করা চাই। নাম কর। নামেই সবকিছু হয়।' আবার বলছেন 'অমৃতের সন্ধান কর।'

একজন ভক্ত জিগগেস করলেন, কোন্ পথে চলবো? প্রত্যুত্তরে ধীর কণ্ঠে মা বলছেন,—'দরজা খুলে ত বের হও। রাস্তা দেখা যাবে। রাস্তা কি করে দেখবে? দরজা বন্ধ করে যে আছো। যে-কোন প্রকারে একবার দরজা খুলে ত বের হও। সেই রাস্তায় চলতে থাক। দেখবে পথের সাথীই তোমাকে বলবে এই রাস্তা ঠিক নয়, ঐ রাস্তায় চলো। চলতে চলতেই পথ নির্দেশ পেয়ে যাবে। এই রকমই হয়ে যায়। তুমি শুধু সেই লক্ষ্য ধরে চলতে থাকো। দেখবে কেউ না কেউ এসে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে যাবে। তোমার যতটুকু শক্তি তাই নিয়ে শুধু চেষ্টা করে যাও। সাহায্য পাবেই।

দেখ সংসার কি রকম জানো? যেন কাঁটার মধ্যে গিয়ে ঢুকছো। চারিদিকে কাঁটা লেগে যাচ্ছে। একদিক ছাড়াতে অন্যদিকে লাগছে। কিন্তু চেষ্টা করে চলেছো। তোমার এই অবস্থা দেখে একজন এসে তোমাকে সাহায্য করে কাঁটা ছাড়িয়ে বের করে দিলো। এই রকম হয়। তুমি যদি নিষ্ঠা নিয়ে চেষ্টা করতে থাকো, সাহায্য মিলবেই।'

সকাল গেল, দুপুর গেল, ধীরে ধীরে আকাশে স্বর্ণআভা গেল মিলিয়ে, নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। নীরবে মা এসে বসলেন বিন্ধ্যাচলের আশ্রম-গৃহের বারান্দায়। অর্ধ-নিমীলিত চোখ। অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা। দৃষ্টি বিষণ্ণ, শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়। মা যেন মায়া উপকূলে বসে মায়ারই রহস্য উপলব্ধি করছেন।

সম্মুখের নির্জন উদাস প্রান্তর বনভূমি অন্ধকারে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মাথার উপর নক্ষত্র ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আর সেই অন্ধকারকে অপসারিত করে দূরে জঙ্গলের মাথায় ধীরে ধীরে উঠতে থাকে চাঁদ। আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে আশ্রমগৃহটি অপরূপ অপার্থিব এক সৌন্দর্যের মূর্তি ধারণ করে উদাস করে তোলে ভাবানন্দময়ী মা

আনন্দময়ীকে। মা আবার হলেন ভাবস্থ। ভাব-সমাধি।

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হতে থাকে স্তোত্র। স্তোত্র নয় যেন অমৃতধারা নির্গত হলো মাতৃকণ্ঠ হতে।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি
ওঁ শ্রদ্ধার্থানং শঙ্কটা উবাচ
নৈস্ংহ্ উগ্রতা নমে।
নরৌরূপ ভ্রমন্বয়েঃ
সং স্তিচং ভ্রূতপাঃ মহৎ মায়ায়াং
ইষ্টাসনা রুদ্রং পিবস্ব মে॥

শুভ্রবসনা মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তবৃন্দের সম্মুখে দেবীমূর্তিতে প্রতিভাত হয়ে উঠলেন। সেই অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। মা শয্যা গ্রহণ করলেন। নিদ্রাদেবী এসে মা ও তাঁর ভক্তদের আচ্ছন্ন করলেন।

৩৫

গোপাল বল গোবিন্দ বল।
রাধারমণ হরি গোবিন্দ বল॥

মধুর কণ্ঠে কীর্তন করছেন ভক্ত অভয়। দিল্লীর কালকাজীতে।* ভবিষ্যতের আশ্রমগৃহের জমিতে কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লীর ভক্তরা মা'কেও নিয়ে এসেছেন! অপূর্ব রমনীয় প্রভাতকালে মা আনন্দময়ী পদার্পণ করলেন কালকাজীর সেই জমিতে। তখন কৃষ্ণনাম গোপাল গোবিন্দ নামে মুখরিত চতুর্দিক। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠেছে

* দিল্লীর কালকাজীর সন্নিকটস্থ শ্যামনগর গ্রামে ১৯৫৪ সালের ২৬শে আগষ্ট নব নির্মিত আশ্রমগৃহে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা, পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীহরিবাবা সহ প্রথম প্রবেশ করেন। শ্যামনগরের এই আশ্রমই কালকাজীর মা আনন্দময়ী আশ্রম নামে সুপরিচিত।

কালকাজীর আকাশ বাতাস। দলে দলে আসছে দিল্লীর ভক্তরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকলেই মা'কে দেখবে। মা'র চরণ দু'খানি। চরণেই যে শাশ্বতী স্থিতি। শুধু তাই নয়, প্রণাম করবে। পূজা করবে। আর শুনবে শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী।

মা'ও ভক্তসনে লীলা করছেন। সকলের সঙ্গেই শিশুর মত মা, বাবা ডেকে কথা বলছেন। আনন্দ বিতরণ করছেন।

একজন ভক্তিমতী স্ত্রী ছল ছল চোখে বললেন, 'আচ্ছা মা, তোমার জন্য যে আমাদের প্রাণে কি রকম অস্থিরভাব হয় তা কি তুমি বোঝ না?'

আবার একজন স্ত্রীভক্ত বলছেন—'মা গো! এ যে দেখছি গোপীনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা!'

ভক্ত দেবেন্দ্রবাবু জিগগেস করছেন,—'মা উপনয়নের পর হতেই ত সন্ধ্যা আহ্নিক করছি। একটু একটু বসি কিন্তু কিছু উন্নতি হয়েছে বলে ত মনে হয় না। অফিসে যে পদোন্নতি হচ্ছে তার অর্থ অফিসের চিন্তাই বেশী করা হচ্ছে।—কি হলো মা?'

মৃদু হেসে মা বলছেন,—'দেখ বাবা। তোমরা ওষুধ খাও সত্য কিন্তু কুপথ্য কর, তাই ওষুধে ফল দেখা যায় না। ওষুধ হলো নাম। পথ্য হলো সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়? যতই ওষুধ খাও ফল দেখা যায় না। শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নাম করে যাবে। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সাধনার অঙ্গ। নামেই সব হবে।'

একজন স্ত্রীভক্ত অভিভূত হয়ে বলছেন,—"মা আমি গোপালকে বড় ভালবাসি। সেই মূর্তিই আমি চিন্তা করি। কিন্তু যেদিন থেকে তোমায় সিমলায় প্রথম দেখি, তারপর থেকেই জপে বসলে, গোপালের চিন্তা করলে, তোমার মুখখানিই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি ২২ বৎসর যাবৎ গোপালের সেবা ও ধ্যান করছি। এখন এরূপ হয়ে গেল কেন? মা, তুমি কি আমার গোপাল? আমি যদি গোপালের দুধে চিনি না দেই ভিতর হতে আসে,—'তুমি চিনি দেও নাই। চিনি দাও।' এখন এ কি হলো? মাগো! বল বল তুমি কি? তুমি কে?"

মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে মা বললেন,—'তুমি যা বলো মাগো, এ শরীরটা তাই।' পরমুহূর্তেই সেই ভক্তিমতী মহিলাটি অভিভূত হয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রু ঝরতে লাগলো তাঁর দু চোখ বেয়ে।

—এ অশ্রুর আস্বাদ কি দুঃখ না সুখ, কে বলবে?

মহাষ্টমীতে মা পূর্ণ করলেন ভক্ত-মনোবাঞ্ছা। দিল্লীর ভক্তরা ১০৮ পদ দিয়ে মায়ের ভোগ দিলেন।

ভক্ত দুর্গাদাসবাবু বলছেন, 'মা আমাদের সপ্তমীতে বাসন্তী। অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা। আর নবমীতে শ্রীরামচন্দ্র।' ওদিকে মন্মথবাবু মায়ের পূজা ঘটে করছেন। ভক্ত সমাগমেরও বিরাম নেই। দেরাদুন, সিমলা, মিরাট ও দিল্লীর আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা এসে মিলিত হয়েছেন।

দিল্লীর বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীঅমল সেন, শ্রীজিতেন দত্ত, চারুবাবু, সিধুবাবু, অনাদিবাবু, দুর্গাদাসবাবু, মন্মথবাবু ও রায় বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস পূজান্তে জ্যান্ত মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলেন। মা আনন্দময়ী তখন তদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে পাথর প্রতিমার মত বসে রয়েছেন। যেন বসন্তকালের বাসন্তীমূর্তি! সেই নম্র স্বর্ণাভা, সেই স্থির নির্মল প্রশান্তি। আননমণ্ডলে এক লোহিত লাবণ্য। প্রতিমার মুখে যেমন রক্তদ্যুতি থাকে তেমনি। অমিয় সৌভাগ্যবান ভক্তরা জানলো চিনলো ধারাবারিসমা করুণাকে। শিবভাবিতা অনন্তমায়াকে। মাধুর্যময়ী কৃপাসাগরী মা আনন্দময়ীকে। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমাকে।

ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। বসন্তের মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলে। মানুষের মনে এনে দেয় পরমানন্দের আবেশ। জাম দেবদারু গাছের সুউচ্চ শাখাগুলি যেন ভবিষ্যতের আশ্রমবাড়ীকে আত্মপ্রসারিত করে রয়েছে। কী যেন ওরা শুনছে কান পেতে। মায়ের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাটি কি মধুর! শান্তিময়!

রায়বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস মা'কে কীর্তন শোনাচ্ছেন। তিনি শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুরের* শিষ্য। মা আনন্দময়ীর পরম ভক্ত। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরাও নাম ধরলেন,

---

* শ্রীশ্রী ঠাকুর হরনাথ। ভক্ত ও শিষ্যদের নিকট 'পাগল হরনাথ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম আন্দোলনে 'পাগল হরনাথ' নাম সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর অগণিত শিষ্য ভক্ত ছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে বাংলা ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজী ৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেমভক্তির সাধনার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। কৃষ্ণ হতেও কৃষ্ণনাম বড় ও গুরু-বস্তু। বিনা শ্রদ্ধাতেও নাম লইলে বৃথা যায় না।' ['পাগল হরনাথ'—কার্ত্তিকচন্দ্র রায়]

—হরি হরয়ে নমঃ
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ
কৃষ্ণ কেশবায়ও নমঃ

*　　　*　　　*

'যেমন তুমি আমি আছি, তেমন ঈশ্বরও আছেন। তাঁর মাধুর্যের রসে ডুবে যাও। আপনার জন বলে মনে হবে। ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না। ভগবান যে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন।'

মা বলছেন একজন ভক্তকে। ডাঃ জে· কে· সেনের বাড়ীতে মা এখনও দিল্লীতে অবস্থান করছেন।

মায়ের ভক্ত সুকুমার বোস I. C. S.-এর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে কীর্তনের আয়োজন করা হযেছে। সুকুমার বাবুর জননী শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী (বেবীদি) মায়ের পরম ভক্ত। মা নাম দিয়েছেন গৌরীপ্রিয়া। গৌরীপ্রিয়াও মুগ্ধচিত্তে মায়ের মুখনিসৃত কথামৃত পান করছেন। মায়ের উপস্থিতিতে পুত্রশোকও ভুলেছেন।

মা আবার বলছেন,—'তোমরা সব মাটির জিনিষ নিয়ে মজে আছো। মা-টি ছাড়া কিছুই নাই ত! মাটির লতা পাতা ফল মূল খেয়ে থাকো। আবার দেখ, ঘাস খেয়ে গরুর যে দুধ হয় তাই খাও। এই ত শরীর। আবার মজা দেখ এই শরীর নষ্ট হলে মাটির জিনিষ গাছ দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। তাও আবার মাটিই হয়ে যাবে। তবেই দেখ মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই এই শরীরটা বলে ক্ষুদ্র নশ্বর ক্ষণস্থায়ীকে ভালবেসে আনন্দ পাওয়া যায় না। যে ভালবাসা অসীম শাশ্বত সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যা মানুষকে দেবদেবী বা ভগবানের প্রতি ভক্তিমান ও অনুরক্ত করে তোলে সেই ভালবাসাই চিরস্থায়ী হয়। শাশ্বত চিরসুন্দরের প্রতিই অনুরক্ত হওয়া। তাতেই ত মানব জীবনের সার্থকতা। আর এই সংসারের দাবানল থেকে যদি অব্যাহতি পেতে চাও, তাহলে সেই ভগবানেরই শরণাপন্ন হও। জাগতিক সম্বন্ধকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে চেষ্টা কর। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু ভেঙ্গে ফেল। মনকে ভগবানের দিকে অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত করে দাও। ঈশ্বরকে অনন্ত প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করবার জন্যই জপ তপ ধ্যান ধারণা নাম সাধনা করে যাও। যখন তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে সেই অসীম পরম প্রেমাস্পদের মধ্যে হারিয়ে ফেলবে তখনই তুমি অখণ্ড আনন্দের আস্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। ব্রজগোপিনীদের

মত কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা হয়ে যাও। তবেই ত ঈশ্বরের ধারণা জন্মাবে। তাঁকে জানবে। দেখবে। ঈশ্বর প্রেমের অপার্থিব দিব্য জ্যোতি তোমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।'

অবশেষে শুরু হোল কৃষ্ণকীর্তন। কীর্তনে শ্রীশ্রীমা'ও মেতে উঠলেন। মহাপ্রভুর মত দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন। সারাদেহ ভূমানন্দে ঢল ঢল। পলকহীন প্রশান্ত নেত্র। মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জল। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মূর্তিতে প্রতিভাত হলেন ভক্তবৃন্দের সম্মুখে।

আবার একদিন দিল্লীর লীলা সমাপন করে মা এসে উপস্থিত হলেন হরিদ্বারে।

* * *

১৩৪৫ সালের ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, রাত্রি শেষ প্রহরে মোক্ষদাসুন্দরী সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। হরিদ্বারে। শ্রীশ্রীমঙ্গলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমে।

গিরিমহারাজ সন্ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। পুত্র কন্যা আশা বাসনা কাম ক্রোধাদি সব স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিলেন। যজ্ঞ শুরু হোল। পুণ্য সলিলা গঙ্গার তীরে। বিস্তীর্ণ নীল আকাশ তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। চাঁদ ডুবে গেছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। চারিদিক নির্জন। নিস্তব্ধ। শুধু গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে আসছে মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দোময় অপূর্ব এক ধ্বনি। স্বামীজীর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে আর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে এক অনির্বাচনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হলো।

সেই অনির্বচনীয় পরিবেশের মধ্যে গিরিমহারাজ মোক্ষদাসুন্দরীকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। পরিধানের জন্য গেরুয়া বস্ত্র দিলেন। সন্ন্যাস নাম হলো 'মুক্তানন্দ গিরি'। খেওড়া গ্রামের ছোট্ট ভট্টাচার্য পরিবারের কুলবধূ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের স্ত্রী। গৃহবধূ। একমাত্র পুত্র মাখনের জননী ছোট্ট নির্মলার গর্ভধারিনী জননী। আর আনন্দময়ী মায়ের ভক্তদের দিদিমা মোক্ষদাসুন্দরী আজ গেরুয়া বসন পরিধান করে হলেন সন্ন্যাসিনী। চিরসন্ন্যাসিনী মুক্তানন্দ গিরি। মুগ্ধ বিস্মিত আর অভিভূত হয়ে ভক্তবৃন্দ সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

আনন্দময়ী মা মোক্ষদাসুন্দরীকে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাজিয়ে বললেন,

দিন দিন লোকে সংসারে জড়িয়ে পড়ে। কয়জনের ভাগ্যে ঐরকম বাহির হওয়া হয়? এখন থেকে শুধু সেই একের, সেই প্রেমময় ভগবানের চিন্তাতেই থাকতে চেষ্টা কর। জ্ঞান ও স্বরূপ লাভ না হলে কিছুই হলো না।'

তারপর মধুর কণ্ঠে মা আনন্দময়ী গান ধরলেন :

—'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন।'

*　　　*　　　*

মা আবার যাত্রা করলেন উত্তরে কাশীর পথে। সঙ্গে ভক্ত কমলাকান্ত, রুমা দেবী, গুরুপ্রিয়া দেবী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, ভক্ত অভয়, শিশির ব্রহ্মচারী কানু আর খেরেশ।

দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়ে পথ। পথের পরপথ পেছনে ফেলে, দুর্গম গিরি বনভূমি প্রান্তর অতিক্রম করে, 'বলডিয়ানা' ছাড়িয়ে মা ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন। কখনও ডাণ্ডিতে, কখনও পদব্রজে। শৈলমালা-বেষ্টিত পথের গভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে মা কৃষ্ণনামে মুখরিত করে তুললেন আকাশ বাতাস। হিমালয়ের বন-বনানী, বন্যফুলশোভা, পাখীর কুজন, ঝরণার কলমর্মর, নির্জনতা। গম্ভীর সৌন্দর্য আর রহস্যপূর্ণ নীরবতা মানুষের মনে এনে দেয় গভীর এক শান্তি। আধ্যাত্মিক আনন্দ। আর সৃষ্টি করে উদাস চিন্তার। তপস্যা ও মহাজিজ্ঞাসার এই পুণ্যময় ভূমিতে পদার্পণ করে শ্রীশ্রী-আনন্দময়ী মা'ও মহাভাবে বিভোর হলেন। যেন প্রেমময়ের তৃষ্ণায় বিভোর। শ্রীগৌরসুন্দরের ভাব।

সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যাও হয়ে এলো নিবিড়। ভক্তদলসহ মা এসে পৌছুলেন ধরাসুতে। উনিশে বৈশাখ, তেরশো ছেচল্লিশ সাল। ইংরাজী ১৯৩৯ সাল। গঙ্গার তীরেই চটি। মনোরম স্থান। ভক্তদল মহানন্দে সেই চটিতেই শ্রীশ্রীমা'র জন্মোৎসব প্রতিপালন করলেন। পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। মনে হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কে যেন পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা দিয়েছে সাজিয়ে। মুক্ত জ্যোৎস্না শুভ্র গঙ্গার তীরে মায়ের পূজা শুরু হোল। বন্য ফুলের সুবাসে গঙ্গার তীর ভরপুর। ভক্ত কমলাকান্ত ও অভয় পাহাড়ে ঘুরে নিয়ে এলেন বিল্বপত্র ও বন্যফুল। গুরুপ্রিয়া দেবী বসলেন মাতৃপূজায়। সে এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত। মহাভাবানন্দময়ী মা ভাবস্থ হয়ে জ্যোতির্ময়ী অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি ধারণ করলেন। এমন রূপ একমাত্র পার্বতীরই ছিল। আর ছিল শ্রীমতীর। প্রেমপাগলিনী রাধারাণীর। তাইতো ভোলানাথ হলেন

'রমা-পাগলা'। আর স্বয়ং শিব হলেন ভোলানাথ।

ধীরে ধীরে রাত্রিও হয়ে এলো গভীর। মা শয্যা গ্রহণ করলেন। হিমালয়ের সেই শান্ত নিস্তব্ধ স্বপ্নময় পরিবেশের মধ্যে নিদ্রাদেবী এসে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আবার সেই রাত্রিরও হলো অবসান। অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে নব-উষার হলো উদয়। ধীরে ধীরে আলোয় আকাশ হয়ে উঠলো আলোকিত। পর্বতের চূড়ায় জমায়িত মেঘের উপর সূর্যের আলো পড়ে রূপোর মত জ্বলতে লাগলো। অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত হয়ে উঠলো হিমালয়। মহিমময় হিমালয়।

আবার শুরু হোল পদযাত্রা। গঙ্গার তীরে তীরে পথ। চারিধারে সুউচ্চ শৈলচূড়া। মাথার উপর বৈশাখের মেঘে ভরা আকাশ। আশে পাশে ঘন অরণ্যানী। গম্ভীর নিস্তব্ধতা। গঙ্গার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গম্ভীর নিস্তব্ধতাকে আরও যেন রহস্যপূর্ণ করে তুলেছে। জলমর্মর নয যেন হিমালয়ের গভীর হতে নিয়ত উত্থিত হচ্ছে সেই ওঁঙ্কার ধ্বনি। গম্ভীর সৌন্দর্যমণ্ডিত, গিরি নদী অরণ্যসঙ্কুল এই হিমালয় যুগ যুগ ধরে সেই একই রকম আছে।

শত শত সাধকের সাধনার পুণ্যভূমি মহিমময় এই হিমালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে ভক্তদলসহ মা আনন্দময়ী পথ চলতে লাগলেন। অবশেষে মা একদিন এসে পৌঁছুলেন উত্তরাখণ্ডের কাশীতে। শিবের লীলাভূমি আর সাধকদের তপোবন এই উত্তরকাশী। মা এখানে স্থাপন করেছেন ৺কালীমূর্তি। কালীমায়ের মন্দির। ভক্তদল নিয়ে মা উঠলেন এই মন্দিরে।

আনন্দময়ী মায়ের আগমনে আবার উত্তরকাশী প্লাবিত হয়ে উঠলো। দিকে দিকে প্রচারিত হলো মায়ের আগমন সংবাদ। ছুটে এলেন স্ত্রী পুরুষ ভক্ত সাধক তরুণ ও বৃদ্ধের দল। এলেন মায়ের ভক্ত সন্ন্যাসী স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি। সকলেই শ্রদ্ধাভরে মা'কে প্রণাম নিবেদন করলেন। শঙ্করানন্দ গিরি হলেন স্বামী দেবীগিরি মহারাজের শিষ্য। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গৃহস্থ মানুষ, দুটি সন্তানের জনক, পূর্ণ সংসার। হঠাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হলে, সংসার বিরাগী হয়ে পথে বের হয়ে পড়লেন। অবশেষে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিতও হলেন। কিন্তু পূর্ণশান্তি লাভ হল না। অবশেষে হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভে অকস্মাৎ একদিন আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে যোগাযোগ হোল।

শ্রীশ্রীমা'ও স্বামীজীকে দর্শন করেই হাসতে হাসতে বললেন,—'এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাদের জন্যই ত এসব স্থান। উত্তরকাশী যাবে?' অভিভূত স্বামীজী দ্বিরুক্তি করেন নি। মাতৃ-আদেশ মস্তকে ধারণ করে চলে এলেন উত্তর কাশীতে। সেই থেকে শীত-গ্রীষ্মে সমান ভাবেই উত্তরকাশীতে অবস্থান করছেন। ধ্যান ধারণা তপস্যার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করছেন।

লীলাময়ী 'আনন্দময়ী মা' এবারে ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে মেতে উঠলেন নাম গানে। উদয়াচল কীর্তন চললো। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ভাবেরও নেই বিরাম। মহাভাবে বিভোর হয়ে যেন আনন্দ বিগ্রহের প্রীতিরস আস্বাদনে নিরত। হরি হরে ভেদ নেই এই তত্ত্বই যেন মা প্রচার করছেন—শিবের লীলাভূমি উত্তর কাশীতে। হরিনাম গান আর মৃদঙ্গের সুমধুর ধ্বনির মধ্য দিয়ে। মা অবশ্য বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচার করেন না। ভক্তরা কেউ বলেন মা স্বয়ং কালী, আবার কেউ কেউ বলেন মা পরম বৈষ্ণবী। আবার কোন কোন জ্ঞানী ভক্তরা বলেন 'মা' সব কিছুরই উর্ধ্বে। মা—মাই। মা অবর্ণনীয়। মা বলেন, 'বাবারা তোমরা যে যেমন বুঝ—যা বলো এ শরীরটা তাই।' আবার কথনও বলেন, 'এই শরীরটা তোমাদের ছোট্ট মেয়ে।' তুমি কী? এ প্রশ্নের উত্তরে মা অনেক সময় বলেন, 'যা'—তা'। এক সময় শ্রীঅরবিন্দ আনন্দময়ী মা'র ফটো দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'মা আনন্দময়ীর স্থিতি সচ্চিদানন্দে'।

মা বলেন, '—একই সব। সবই এক। সেই এক ব্যতিরেকে কোন অস্তিত্বই নেই।'

আবার শুরু হলো পথচলা। চলার আর শেষ নেই। পথেরও নেই শেষ। পথের পর পথ পেছনে ফেলে মা এগিয়ে চলেছেন সম্মুখের দিকে। পথ ভয়ানক দুর্গম। মা হাঁটছেন, ভক্তরাও হাঁটছেন। মায়ের উপস্থিতিতে তাঁরাও পথের ক্লান্তি ভুলেছেন। অবশেষে মা এসে পৌছুলেন 'ধরালী'তে। সাধুদের তপোভূমি। মায়ের আগমন সংবাদে ছুটে এলেন ন্যাংটা সাধুরা। গ্রামবাসীরা। এলেন যোগীবর কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। পরিধানে ভূর্জপত্রের ছোট্ট নেংটি। উলঙ্গ প্রায়। শীত গ্রীষ্ম একইভাবে থাকেন। তিন চার ঘণ্টা গঙ্গার ঠাণ্ডাজলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। যখন বরফ পড়ে তখনও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মা শুনে মন্তব্য করলেন, '—ধৈর্য্য ও সহ্য সাধনার মেরুদণ্ড।'

তারপর আবার একদিন দুর্গম পাহাড়জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ভৈরবঘাট ছাড়িয়ে মা এসে পৌঁছুলেন দশ হাজার ফিট উচ্চে গঙ্গোত্রীতে। নির্জন স্থান। এই পুণ্যময় স্থানের সুগম্ভীর নির্জনতা মানুষের মনে এনে দেয় অপূর্ব শান্তি। পরমানন্দের আভাস। সাধকের দুর্গম তপোভূমিতে পদার্পন করে আনন্দময়ী মাও হলেন মহাভাবে বিভোর। এই স্থানেই মা'কে দর্শন করে বৈদান্তিক সাধু* ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী পরমানন্দ আনন্দময়ী মা'র ভক্ত হয়ে পড়লেন। মায়ের আদেশে ইনিও উত্তরকাশীর কালীমন্দিরে অবস্থান করে কিছুকাল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও সাধন ভজন করেছিলেন। এই পরমানন্দ স্বামীই পরবর্তীকালে মায়ের অন্যতম পার্ষদ হয়ে মায়েরই সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ উঠলেন গঙ্গাতীরের কালীকম্বলী বাবাজীর ধর্মশালায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলস্রোত বয়ে চলেছে কুলকুল করে। শান্ত স্তব্ধ দিগন্তলীন হিমালয়। সুপ্রাচীন হিমালয় আর তার বনানী। সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মানুষের মনকে সহজেই উদাস করে তোলে। এই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমিতে এসে মা বসলেন ভক্তবৃন্দ সহ। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। বন্যফুলের গন্ধে ভরা নিস্তব্ধ সে সন্ধ্যা। তখন গাছের বড় বড় পাতার আড়ালে জলজ্বল করছে শুক্র ও বৃহস্পতি। কি অনির্বচনীয় সে পরিবেশ! সর্বসৌন্দর্য নিলয়া আনন্দময়ী মা গঙ্গাকে দেখিয়ে ভক্তদের বলছেন,—'সেবা হলো পুষ্প, অনুরাগ চন্দন, বিল্বপত্র প্রেম, আর ভক্তিই হলো গঙ্গাবারি।'

*'ব্রহ্মজ্ঞ মা'র পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীকাদম্বিনী দেবী। জন্ম বাংলা ১২৮৬ সনের ৯ই ফাল্গুন। শুক্রবার। ত্রিপুরা জেলার বিতারা গ্রামে। পিতার নাম শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্তী। বাল্যকালে বিবাহ হয় এবং দশ বৎসর বয়সেই বিধবা হন। মৃত্যুচিন্তার মধ্য দিয়েই তিনি আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হন। কেবল বিচার ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের দ্বারাই আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হন। তিনি বলেন, 'ঠিক ঠিক জ্ঞান বিচার চাই। ঠিক বুঝ্ হইলে ছাড়িবার ধরিবার কিছুই থাকে না। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নাই। প্রকৃত শান্তি পাইতে হইলে জ্ঞান চাই।'…'জ্ঞানে এক, প্রেমে দুই, কামে বহু। 'অহম্' ভাবে এক জ্ঞান থাকে, প্রেমে ভক্ত ভগবান দুই। আর কামে—আমার দেহ, আমার স্বজন, আমার গৃহ ইত্যাদি বহু।' ['ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের কথা'—লেখক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সেন। 'শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের জীবন কথা'—লেখক শ্রীরসিক চন্দ্র বসু।]

গঙ্গার অপর পারে ছোট্ট কুটিরে থাকেন একজন সাধু। উলঙ্গ। মৌনী। নাম কৃষ্ণাশ্রম। পরমযোগী সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রম। শীত-গ্রীষ্মে একই স্থানে একই ভাবে সাধনায় রত। তীব্র শীতে যখন বরফের ঝড় প্রবাহিত হয়ে চলে তখনও তাঁর সাধন ভজনের নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।

হিমালয়ের স্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে শুধু কানে ভেসে আসে গঙ্গার জলকল্লোল। মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের সাধন কুটিরও সেই জলমর্মরে মুখরিত। ঠিক জল-কলরোল নয়, মোহময় অদ্ভুত এক স্বরধ্বনি যেন! ঠিক স্বরধ্বনিও নয়, ঈশ গুণগান! মানুষের মনে এনে দেয় পরম শান্তি। পরমানন্দ। স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অতীতের মুনিঋষিদের কণ্ঠনিসৃত অপূর্ব মধুর ভগবৎ ভাবে পূর্ণ সামগানের কথা। সামগানের মধুর স্বরধ্বনিও নয়, এ যেন নাদধ্বনি! সেই ওঁঙ্কার ধ্বনি প্রতিনিয়ত উত্থিত হচ্ছে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের সাধন কুটির হতে।

ধীরে ধীরে রক্তিম রাগ-রঞ্জিত তরুণ তপন পূর্বাকাশে তাঁর প্রথম স্বর্ণরশ্মি শৈলশিখর, অরণ্যানী আর এই মহাত্মার কুটিরে ছড়িয়ে দিলেন। এমনই সময় অকস্মাৎ মা আনন্দময়ী এসে উপস্থিত হলেন মহাত্মার কুটিরে। এ যেন জগজ্জননী দর্শন দিলেন আপন সন্তানকে। নবসূর্যবিনিন্দিত দিব্য জ্যোতিষ্মান এক তপস্বীকে। জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন স্বামীজী। মস্তক অবনমিত হলো। মা'ও ভালবাসা মিশ্রিত শ্রদ্ধা জানালেন মহান তপস্বীকে।

পুণ্যভূমি গঙ্গোত্রীতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা দুই দিন অবস্থান করে আবার ফিরে চললেন উত্তরকাশীর পথে।

দুর্লভ ভজন হেন
নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম,
নাহি দেখ বেদ-ধর্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণ পদদ্বয়ে।

আনন্দময়ী মা মধুর কণ্ঠে গান করছেন। সিমলায়। কালীবাড়ীতে। সোলন থেকে সিমলার ভক্তদের আহ্বানে মা এসেছেন সিমলাতে। ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীজিতেন দত্ত, শ্রীঅমল সেন প্রভৃতি পুরানো ভক্তরা নাছোরবান্দা। তাই মা'কে সিমলাতে আসতেই হোল। ভাইজী'র তিরোধান তিথি উৎসব উপলক্ষে মা এসেছিলেন সোলনে ভক্তপ্রবর শ্রীদুর্গা সিংহজীর (যোগীভাই) প্রাসাদে। এবারে সিমলার ভক্তরা মা'কে ঘিরে কীর্তনানন্দের আনন্দে মেতে উঠলেন। অবশেষে মা আনন্দময়ী ভাবানন্দে বিভোর হয়ে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন। ঠিক যেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নয়! মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীরাধারাণীর ভাব! রাধাভাবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেন! মা আনন্দময়ী যে মূর্তিমতী সাক্ষাৎ মহাভাব। তাইতো তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা সংকীর্তনে বিভোর হয়ে রইলেন। কীর্তনের সঙ্গীত রসধারা নয়! যেন মধুর হৃদয়সুধা ঢেলে দিয়ে ভক্তদের তাপিত প্রাণে এনে দিলেন শান্তি। পরম শান্তি। পরমানন্দের আভাস! অনির্বচনীয় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করলেন সিমলার কালীবাড়ীতে। সাধারণ ভক্ত মানুষের হৃদয়তরী দুলতে লাগলো হরিনামের অমৃত সিন্ধুতে। কলিযুগে নামামৃত ছাড়া আর মৃতসঞ্জীবনী কোথায়?

আবার একদিন সিমলা থেকে সোলন হয়ে মা ফিরে এলেন ডেরাডুনে। ডেরাডুনের রায়পুর-আশ্রমে।

নানা কথা প্রসঙ্গে মা বলছেন দেশসেবক ভক্ত মানুষ শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজকে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি আনন্দময়ী মা'কে দর্শন করতে

এসেছেন। জহরলাল নেহেরু তখন ডেরাডুন জেলে ছিলেন। শেঠজী জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দময়ী মা'কে দর্শন করতে এসেছেন। প্রথম দর্শন। নিত্যতৃপ্তা সদানন্দা আধ্যাত্মিক ভাবের সারভূতা প্রাণমন্ত্ররূপিনী এক জীবন্ত প্রতিমাকে যেন দর্শন করছেন। অভিভূত হলেন শ্রীযুত যমুনালাল। আরও অভিভূত হলেন সর্বক্লান্তিহরা মায়ের মুখের হাসিটি দেখে। বিস্মিত হলেন কথা শুনে। গভীর স্নিগ্ধ সহজ সুরের কথা। কথা নয়, এ যেন কথামৃত!

মা বলছেন,—'পিতাজী জেলেই ত আছো। তুমি বুঝি ভেবেছো মুক্ত হয়েছো? আসল মুক্তির জন্য—তাঁর জন্য একটু একটু সময় দিতে চেষ্টা করো।—'তাঁরই সেবা, তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন।' যদি এই ভাবটি রাখা যায়, তবে আর বন্ধনের কারণ হয় না। তা না হলেই বন্ধনের কারণ হয়। প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভাব জেগে ওঠে। এই ভাবনা—কামনা বাসনাই মানুষকে চিরদিন অতৃপ্ত করে রাখে। আবার দেখ, কে কার সেবা করে? মা'র সেবাই বা কে করে? নিজের সেবা নিজেই করছে। আবার তাঁর সেবা তিনিই করছেন। সেবাও তিনি, সেবকও তিনি, সেব্যও তিনি। এক ভিন্ন দুই ত নাই। আপনাকে জানলে আর ভয়ের কিছু থাকে না। নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় আবার কি? আমিই সমস্ত, আমিই সর্ব্বাংশ। কেবল নির্ভর কেবল স্মরণ। এক ছাড়া দুই কই? অনন্ত প্রকাশ ত!

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে সত্যের অনুসন্ধান করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। সত্য ত্যাগ ব্রহ্মচর্য এবং সংযমাদির সহায়তায় শ্রীগুরুদত্ত বিষয়ের আশ্রয়ে থেকেই সবকিছু করণীয়। শুধু বাকসংযম করে থাকলেও ধীরে ধীরে শান্ত-ভাবের অনুকূল হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে ইসারা করা বা লেখাও ঠিক না। আর দেখ এই ভাবের সংযম করলেও মিথ্যা কথা, কটু কথা বাজে কথা ইত্যাদি বলা বন্ধ থাকে। বেশী কথা বললেই শক্তি ক্ষয় হয়। তাই শুধু বাকসংযমেও ভিতরে একটা শক্তি হয়। অন্তরে কিন্তু যথাশক্তি ধ্যান জপের চেষ্টা রাখা দরকার। তবেই অখণ্ড শান্তিলাভের আশা!'

গান্ধীজীর অনুগত সর্বত্যাগী দেশসেবক যমুনালাল বাজাজও প্রথম দর্শনেই মায়ের ভক্ত হয়ে পড়লেন। মা তাঁর নাম রাখলেন 'ভাইয়া'। ধীরে ধীরে শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ আনন্দময়ী মা'র ভক্তদলের মধ্যে 'ভাইয়া' নামে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।

যমুনালাল বাজাজের সন্তান ভাব। বাৎসল্যরস। শিশুর মত সরলভাবে

বলছেন—'মা, আমার বড় ভাল লাগছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না।'

তারপর সমস্ত দিনটিই আশ্রমে কাটালেন। পরবর্তীকালে যমুনালালজী বলেছিলেন,—'অনেক স্থান ঘুরেছি। অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ হয়েছে। কিন্তু মাতাজীর মত এমন জীবন্ত সাধুর দর্শন লাভ আর হয় নি।'

ভক্তপ্রবর যমুনালাল জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত মাতৃনামে বিভোর হয়ে ছিলেন এবং পত্নী জানকীবাঈ ও পুত্র কমলনয়নও শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন।

মহাত্মা গান্ধীও পরবর্তীকালে মা আনন্দময়ীকে বলেছিলেন, 'যমুনালাল আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলেছে যে আমার নিকট হতে যে শান্তি সে পায়নি, আমি যে শান্তি তাকে দিতে পারিনি সেই শান্তি সে তোমার নিকট হতে পেয়েছে।'

মা'ও ভক্তদের বলেছিলেন, 'সকলে ত এই শরীরের সব কথা ধরে কাজ করতে পারে না। কিন্তু যমুনালাল তোমাদের 'ভাইয়া' অনেকটা করেছিলো।

এই শরীরটার সঙ্গে সে এত অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে শিশুর মত মিশে ছিলো। এরকমটা সাধারণতঃ দেখা যায় না। মা বলেন,—'এ জগৎ একটি মৃদঙ্গের মত। এর বাদক একজন। সে যখন যে বোল বোলায়, সে বোল বলে। কীর্তনে কি দেখতে পাও না, মৃদঙ্গের তালে তালে বহু লোক নাচে গায়। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বা বাদকের প্রতি কয়জনের লক্ষ্য থাকে? সংসারে যার আনন্দের কণা নিয়ে সকলে সুখে দিন কাটায় তাঁকে কেউ জানতেও চায় না। সকল বিষয়ের মূল রূপে যিনি বর্তমান, তাঁরই অনুসন্ধান করো। ইহাই তপস্যা—ইহাই সাধনা।

* * *

১৩৪৮ সন, ৮ই ফাল্গুন। শুক্রবার। ইংরাজী ১৯৪১ সাল। আনন্দময়ী মা এসেছেন মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রমে। সমস্ত আশ্রম প্লাবিত হয়ে উঠলো মাতৃ-আগমনে। মহাত্মা গান্ধী—'আইয়ে, মাতাজী—আইয়ে' বলে সাদরে আহ্বান জানালেন আনন্দময়ী মাকে। মা'ও পিতাজী পিতাজী বলতে বলতে মহাত্মা গান্ধীর ঘরে প্রবেশ করলেন। মহাত্মাজী সাদরে আনন্দময়ী মা'র মাথাটি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা'ও ছোট্ট মেয়েটির মত মহাত্মাজীর বুকের মধ্যে হাতখানি রেখে বসে রইলেন।

মহাত্মাজীই প্রথম কথা বললেন, 'মাতাজী! আমাকে তোমার কথা প্রথম কে বলে জান? কমলা নেহেরু। সেই আমাকে বিশেষ করে

বলেছিলো আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি। তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,—'কমলা এঁকে গুরুর মত মানতেন।'

মা'ও হেসে হেসে বললেন, 'পিতাজী, আমি কারু গুরুটুরু নই। আমি ত ছোট বাচ্চি।'

মহাত্মাজী হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা! আচ্ছা!' তারপর মাকে অনুরোধ করে বললেন, 'দেখ, তুমি যেন যাবার কথা বলো না। অন্ততঃ দুদিন আরও এখানে থাক। যমুনালালের বিষয় নিয়ে আরও দুদিনের কাজ আছে। তুমি থাকলে জানকীবাঈ ও কমলনয়ন খুবই শান্তি পাবে।'

প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে মা বললেন, 'পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটার মাথাটা কিছু খারাপ। সব সময়ে সব কথা রাখতে পারে না। তার কি করবো পিতাজী? তোমার স্বভাবই ত মেয়েটা পেয়েছে।'

এই কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠলো মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমগৃহ। মহাত্মাজী বললেন, 'এরা সকলেই হাসছে। বলবে কোথা থেকে এক পাগল মেয়েকে এনেছে, তাকে বুঝিয়ে রাখতে পারলো না। সকলেই তখন আমাকে উপহাস করবে।' হেসে হেসে মা বললেন, 'বেশ ত, আমার বাবাকে নিয়ে লোকে যদি একটু আনন্দ করে হাসে, হাসুক না। আর আমার বাবা ত এই সব ছোটখাট কথা গ্রাহ্যই করেন না। বাবার এইসবে কিছুই আসে যায় না।'

এবারে মহাত্মাজীও হাসতে হাসতে বললেন,—'আমি ত অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলছো ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলে ফেলেছি।' মহাত্মাজীর কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। এইভাবে মহাত্মাজী আনন্দময়ী মা'র সাথে সরল রসিকতায় মেতে উঠলেন।

গান্ধীজী আবার বলছেন,—'যমুনালাল জেলে বসে সুতা কেটে সেই সুতা দিয়ে এক জোড়া কাপড় বানিয়ে মাতাজীর জন্য রেখে গেছে। মাতাজী তার মধ্যে এক টুকরো আমাকে, এক টুকরো জানকীবাঈকে, এক টুকরো বিনোবাজীকে আর এক টুকরো নিজের জন্য রেখেছেন।'

মা'ও মিষ্টি হেসে হেসে বললেন, 'পিতাজী আমিও একবার নিজের হাতে সুতা কেটে এক জোড়া কাপড় বানিয়েছিলাম। আমি চরকায় সুতা কাটতে জানি। আর আমি ত পিতাজীরই কাপড় পড়ি।'

গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ যেখানে যেখানে খদ্দর বানানো হয়, সব আমারই কাপড়।'

এবারে কমলনয়ন বললেন, 'বাপুজী, মাতাজীকে আপনার কাছে রেখে যাই ; তবে আর মাতাজী যেতে পারবেন না।'

গান্ধীজীও আগ্রহভরে বললেন, 'বেশ জানকীবাঈ ও মাতাজী এখানেই থাকুন। শোবার বন্দোবস্ত করে দেবো।' ইতিমধ্যে কস্তুরীবাঈ এসে আনন্দময়ী মা'কে প্রণাম করে বললেন,—'খুব ভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আপনাকে দর্শন করবার। আজ তা সার্থক হলো।'

এবারে গান্ধীজী শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যোশী, তুমি কি মাতাজীর সঙ্গেই আছো ? হরিরাম যোশী বললেন, 'মা আমাকে কাশী থেকে তার করে আনিয়েছেন।'

এই কথা শুনে মহাত্মাজী মা'কে বললেন, 'আমার কাছে তোমার একা আসতে ভয় করে নাকি ?

মা'ও হেসে হেসে বললেন, 'ভয়ের ত কথা নেই। ও বলেছিলো, এদিকে এলে খবর দিতে। তাই খবর দিয়েছিলাম।'

এবারে মহাত্মাজী মজা করে হাসতে হাসতে বললেন,—'আচ্ছা, তুমি হুকুমও চালাও ?'

এইভাবে নান রকম কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমস্ত দিনটি অতিক্রান্ত হলো। ভক্তবৃন্দ, গান্ধীজীর সেবক-সেবিকারা, সেবাগ্রাম আশ্রমের বাসিন্দারা বাপুজী ও মা আনন্দময়ীর কথোপকথন শুনে বিমল আনন্দ উপভোগ করলেন। নীরস দার্শনিক আলোচনা বা ধর্মজগতের গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা হলে তাঁরা এমন নির্মল পবিত্র আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন না। এও মায়েরই ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হোল।

আনন্দময়ী মা গান্ধীজী ও কস্তুরীবাঈকে দর্শন দিয়ে গান্ধীজীর আশ্রমে রাত্রিবাস করে পরদিন ভোরবেলা পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেবাগ্রাম আশ্রম—ওয়ার্ধা ত্যাগ করে মা আবার সম্মুখের পথে অগ্রসর হলেন। চলার আর বিরাম নেই। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা এগিয়ে চলেছেন সম্মুখের দিকে। অসীমের সন্ধানে।

১৮

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য জেগে উঠলো আলমোড়ার চতুর্দ্দিকে। চঞ্চল হয়ে উঠলো নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের অন্তর। তিনিও স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন মাতৃ-সন্নিধানে। সপরিবারে। আলমোড়াতেই আছেন। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নৃত্যশিল্পীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়।

১০ই বৈশাখ, শনিবার, বাংলা ১৩৫০ সন (ইং ১৯৪৩ সাল)। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌঁছুলেন আলমোড়ায়। এসে উঠলেন পাতালদেবীতে। ভাইজীর সমাধি মন্দিরে। স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। বেলা হেলে পড়েছে। হলদে রোদ তখন পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে পাহাড়ের চূড়ায় দূর বনের মাথায়। অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া ভাইজীর সমাধি মন্দিরকে যেন আরও গম্ভীর রহস্যময় সৌন্দর্যদান করলো। এমনই এক পরম বিচিত্র মুহূর্তে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসে উপস্থিত হলেন ভাইজীর সমাধি মন্দিরে।

প্রথম দর্শন। ভাবময়ী আনন্দময়ী মা'কে দেখছেন জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছেন। রিক্তা, নিরাভরণা দীনবেশা এক সন্ন্যাসিনীর মুখের প্রতি। কি অদ্ভুত এক আনন্দ ফুটে রয়েছে ঐ মুখের উপর। যেন কোটি সঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছেন। শান্তি ও আনন্দের প্রতিমূর্তি। বিরাট শান্তিতে মৌনী হয়ে রয়েছেন। মৌনী মা নন। আনন্দের আধার আনন্দময়ী মা। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

বিহ্বল হয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন শিল্পী উদয়শঙ্কর, শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। জগজ্জননীকে। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, '—মাগো, আমার বড়ই ইচ্ছা করছে ঐ চরণকমল স্পর্শ করতে। কিন্তু আপনি ত তা দেবেন না। আমার হৃদয়েই রইলো ঐ চরণকমল দুটি।' মা মৃদু হেসে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ভক্ত উদয়শঙ্করে রূপান্তরিত হয়ে যেন নবজীবন লাভ করলেন। অবশেষে শুরু হোল কীর্তন। নাচের স্কুলের ছেলেমেয়েরা মিলিত কণ্ঠে মা'কে শোনালো কীর্তন।

কীর্তন শেষে উদয়শঙ্কর ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের লক্ষ্য করে মা বললেন,—'দেখ, পৃথিবীতে সবই নাচিতেছে। এই যে কথাবার্তা হচ্ছে এও নাচেরই একটা তরঙ্গ ছাড়া আর কি? দেখ কি তামাসা! এই শরীরটার ভিতর যখন সাধনার খেলাটা চলছিলো তখন তিন দিন আরতির ভাবে ঐ শরীরটা দিয়ে কত ক্রিয়াই যে বয়ে গেছে তা আর কি বলবো। ওগুলিকে তোমরা নাচই বল আর যাই বলো। কখনও দেহটা পড়ি পড়ি করেও পড়ে যায় নি। কখনও বা আঙুলের উপর ভর দিয়ে কখনও বা হাত পা ঘাড় মস্তক ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একভাবে ক্রিয়া করতো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতিও হয়ে যেতো পরিবর্তিত। একদিন ভোলানাথকে বলা হলো, 'তুমি বস, আমি আরতি করি।' সে বসলে এমনভাবে আরতির ক্রিয়া শরীরে হতে লাগলো যা দেখে ভোলানাথ ত অবাক! সে বলে উঠলো,—'এসব কি হচ্ছে?' তখন পর্য্যন্ত নৃত্যাদির কথা শুনাও হয় নি। দেখা ত দূরের কথা। দেখ সকলের ভিতরেই সব আছে। শুধু ফুটাইয়া তোলাই হোল আসল কথা'। আবার বলছেন,—'দেখ নাচটা কি? না, তরঙ্গ। যেমন বীজ বুনলে তার মধ্যে একটা স্পন্দন বা তরঙ্গ না থাকলে বীজ ফেটে গাছ হতে পারে না। যেমন জলাশয়ের জলে বাতাস না লাগলে ঢেউ হয় না। সেই রকম সৃষ্টি স্থিতি লয় সবতাতেই আছে তরঙ্গ। এই তরঙ্গই হলো নাচ। যেমন রান্না করতে গেলে, এই বাসনটা এই রকমভাবে রাখলে, তারপর রান্না করতেও এইভাবে বসলে, হাতটা এইভাবে নাড়লে তবে রান্না হলো। এই সবই নাচ। নৃত্যেরই তালে তালে সব কিছু। গতি এবং স্থিতি একসঙ্গেই আছে। যেমন জলাশয়। একটা জলাশয় একভাবেই আছে। এ হলো স্থিতি। আবার ঐ জলাশয়ে তরঙ্গ আছে এ হলো গতি। আবার দেখো নাচের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও সম্বন্ধ আছে। যদি ওই ভাবটা নিয়ে কাজ করা যায় তবে সহায়তা হবেই। এই নাচের তরঙ্গ তারপর নিস্তরঙ্গ ভাবে গিয়ে শেষে তরঙ্গ নিস্তরঙ্গের উপরে চলে যাওয়া। যা হতে এই সবই আসছে। সেই মূলে যাওয়া চাই কি বল?'

নৃত্যশিল্পের অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কর, প্রভাত গাঙ্গুলী, ফরাসী মহিলা সিমকী, সতীদেবী ও অন্যান্য শিল্পীরা।

উদয়শঙ্কর আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন,—'হ্যাঁ মা, এই ত নৃত্য। আপনি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন।' তারপর প্রভাত গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য করে বললেন,

—'দেখ, এতদিন যে আমরা এই বিদ্যার আলোচনা করে আসছি, আজ মা'র মুখে শুনলে ত তার সুন্দর ব্যাখ্যা। মা ত আর নৃত্যকলা-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। কিন্তু দেখো, কি আশ্চর্য্য! কি সুন্দর সঠিক ব্যাখ্যা করলেন। নৃত্যকলার এমন সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। আমি মায়ের নিকট চিরঋণী হয়ে রইলুম।'

এইভাবে আনন্দময়ী মা দিনের পর দিন ধ্যানমৌন হিমালয়ের কোলে অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসে ভক্তসনে লীলায় মত্ত হয়ে রইলেন।

১৯শে বৈশাখ, সোমবার। আনন্দময়ী মা'র জন্মদিবস প্রতিপালিত হলো মহাসমারোহে। আলমোড়ায় পাতালদেবীতে। এ যেন হিমালয় কন্যা পার্ব্বতির জন্মোৎসব গিরিরাজ হিমালয়ের কোলেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভক্তপ্রবর উদয়শঙ্কর তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দসহ নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে এই জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানকে সুষমামণ্ডিত করে তুললেন।

আবার একদিন শ্রীশ্রীমা'কে নিয়ে এলেন তাঁদের নৃত্যশিল্প সাধনার মন্দিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে। শৈলমালায় ঘেরা নির্জন পরিবেশ এই সাধনার ক্ষেত্রটি। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত পাহাড় আর বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁরা তাঁদের নৃত্য-গীত সাধনা করে চলেছেন।

গুরু হলেন নটরাজ শিব। তাই উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠা করেছেন শিবের মন্দির। উদয়শঙ্কর বললেন, 'শিবের মূর্তিটি হঠাৎ এখানে পাওয়া গেল। তাই স্থাপন করলাম। 'শিব হলেন আমাদের গুরু।' মা'ও মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'স্থাপন করবার জন্যই তোমাকে নিয়ে এসেছেন।' শিবের মন্দির দর্শন করে মা আনন্দিত হলেন।

অবশেষে শুরু হোল নৃত্য-গীত। ছাত্রছাত্রীরা কয়েকঘণ্টা ধরে নৃত্যগীত করলেন মায়ের সম্মুখে। এই পাহাড় আর পিয়ালবনের সুরে বাঁধা ওদের গান শুনে আর নৃত্যনাট্য 'রামলীলা' দর্শন করে শ্রীশ্রীমা মুগ্ধ ও আনন্দিত হলেন। আনন্দিত চিত্তে মা সকলকেই আশীর্ব্বাদ করলেন।

আবার শুরু হোল লীলা। ভক্ত ও ভগবানের লীলা। হিমালয়ের অপূর্ব গম্ভীর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরে আনন্দময়ী মা বসে আছেন একখানি উপলখণ্ডের উপরে। আর ভক্তরা মা'কে ঘিরে বসে শুনছেন মায়ের শ্রীমুখের কথা। মা বলছেন,—'দেখ, একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। নীরব ও নির্লিপ্তভাবে যারা পরমপুরুষের সাধনা করতে চায়,

হিমালয় তাদের পক্ষে বড়ই অনুকূল স্থান। চারিদিকে প্রকৃতি গুরুগম্ভীর ও শান্ত। এঁর ক্রোড়ে বসে অনন্তের চিন্তা বা আত্মবিচার স্বভাবতঃই সহজ। ভাবকে লক্ষ্য করে যার সাধনা, সমুদ্রতীর তার উপযোগী। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাবের হিল্লোল এসে ভাবময় সীমাতীত ভাবে তাকে ডুবিয়ে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যার মন সবেমাত্র সাধন পথের পথিক হবার জন্য উন্মুখ হয়েছে কোন নিভৃত রমণীয় স্থান তার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণ গৃহধর্মীর পক্ষে ঈশ্বর চিন্তার জন্য অন্ততঃ ঘরের কোণায় একটি নির্দ্দিষ্ট শুদ্ধ স্থান করা আবশ্যক। যে ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, যার চোখে ভগবান সর্ব্বময় তার স্থান সর্ব্বত্রই সুলভ। মনকে নিয়মিত করে সকল অবস্থার উপরে উঠবার চেষ্টা করো। তাহলে স্থান অবস্থানের দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।

শরণাগত ভক্ত হতে হলে ভাষা ও ভাব থেকে 'আমি'র মূলোচ্ছেদ করে বুদ্ধি বিচারটা একেবারে ভেঙে দেওয়া আবশ্যক। শিশু হাগে মুতে আবার তাই গায়ে মাখে, তাতেই গড়ায়। এবং অবিচারে আবার মায়ের কোলে আসতে হাত বাড়ায়। তাই অবুঝ বলে মা তাকে ধুয়ে মুছে সর্বদা হাসিমুখে কোলে তুলে নেন। এই হলো নিঃস্বার্থ স্নেহ ও প্রেমের বিধান। এইরূপ আত্মহারা একটা সাধনার জন্য কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। এমনি হবার চেষ্টা করো। তাহলে সহজেই মায়ের কোলে যেতে পারা যায়। বুদ্ধির খেলা খেলবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো অঘা না হলে ভগা'কে পাওয়া যায় না।'

অকস্মাৎ মা মুক্তিবাবাকে উদ্দেশ্য করে ছেলেমানুষের মত খুব উৎসাহ ভরে হাসি হাসি মুখে বললেন,—'এইসব স্থানে দেখি কি বাবা! এই মাটির মধ্য দিয়ে জটাজুটধারী সাধুরা উঠছেন, আর উঠে উঠে চলে যাচ্ছেন। একজন নয় অনেকজন। আবার একদিন দেখি অনেক সাধু মহাত্মা এখানে বসে আছেন। এই শরীরটাকে দর্শন দিতে এসেছেন।' ভক্তবৃন্দ মুগ্ধচিত্তে মায়ের মুখনিস্থত কথামৃত পান করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীসত্যদেব ঠাকুরের শিষ্য রামবাবু হঠাৎ জিগগেস করলেন—'আচ্ছা মা কাজ করতে বসলেই লক্ষ্য করি, বাইরের দিকে কে যেন মনটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি?'

মা সহজভাবে বললেন,—'তাও জান না বুঝি। বাসনার বীজ টেনে আনে। তবুও তাঁর দিকেই লেগে থাকতে হয়। যেমন দেখ না সমুদ্রের ধারে যখন নেমে স্নান করতে যাও, সমুদ্র পারের দিকেই ঠেলে দেয়। আরও যদি ভিতরের দিকে যেতে থাকো তবে দেখবে সমুদ্র নিজের ভিতরের দিকেই

নিয়ে যাচ্ছে। এও তাই।' আবার বলছেন, 'বাসনার বীজই আসা যাওয়ার মূল। রিটার্ণ টিকেট কাটছো। আসা আর যাওয়া। একের মধ্যেই যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। এক ছাড়া ত দুই নাই। আমরা যে এক ঘরেরই সব। এই বাসনার বীজ নষ্ট করতে হলে নামাশ্রয় করে থাকতে হয়।'

এই ভাবে সমস্ত দুপুর অতিক্রান্ত হলো। বৈকালের রোদ রাঙা হয়ে এলো উত্তুঙ্গ শৈলচূড়ায়। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। মা ভক্তবৃন্দসহ চলে এলেন সমাধি মন্দিরে পাতালদেবীর আশ্রমে। শুরু হোল কীর্তন। ভক্তবৃন্দ কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন পাতালদেবীতে—ভাইজীর সমাধি মন্দিরে।

মা বলেন,—'নাম করতে করতে কীর্তনের ভাব আসে। আর কীর্তন করতে করতেও জপ ধ্যান ধারণা আসে। পূজা অর্চনাতে যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ে কর্মাদির বিধান আছে, কীর্তনও সেইরূপভাবে করা আবশ্যক। এক স্বর এক তাল হলেই ভাল। যাঁকে নিয়ে কীর্তন তাঁকে স্মরণে রাখা। নইলে কেবল বাদ্যোৎসব হবে, নাম কীর্তন নয়।'

*   *   *

শ্রীশ্রীমা এখন এলাহাবাদে। এলাহাবাদের কৃষ্ণকুঞ্জে দুর্গাপূজা। তাই মা এসেছেন। ভক্ত কানাইয়ালালের আহ্বানে আনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা। তাই ত বসে গেছে আনন্দের হাট। কৃষ্ণকুঞ্জের হলঘরটি কৃষ্ণের ছোট বড় নানারূপের ছবি দিয়ে সাজানো। প্রতিদিন কীর্তন ও আরতি হয়। তাই দুর্গাপূজার দিনেও মা কৃষ্ণপূজা করালেন।

পূজার সময় মা এসে বসলেন প্রতিমার পাশে। নিমীলিত নেত্র, স্থির হয়ে বসে আছেন। শিলাময়ী দুর্গামূর্তির মত। এ যেন মহামায়া স্বয়ং তাঁর করুণা ও প্রসন্নতা নিয়ে ভক্তসমীপে এসে বসেছেন। প্রতিমা ও মা'তে কোন প্রভেদ নেই। যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মত সম্মিলিত হয়ে আছেন। অপরূপ সে মূর্তি। দেবী মূর্তি। রিক্তা, নিরাভরণা কোন সন্ন্যাসিনীর মূর্তি নয়। রাজরাজেশ্বরী লোহিতবরণা ত্রিনেত্রা দশভূজা দেবী দুর্গার মূর্তি যেন! এই অপরূপা মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তরা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। পূজক নিজেও যেন কি এক উন্মাদনায় মায়ের পূজা করে চলেছেন। ভক্তপ্রবর হরিরাম যোশী অভিভূত হয়ে চণ্ডীপাঠ করছেন। অনির্বচনীয় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

নবমীপূজার দিন মা এলেন শ্রীশ্রীসত্যদেব ঠাকুরের 'সাধন-সমর' আশ্রমে। সত্যদেব ঠাকুরের শিষ্য গোপাল ঠাকুর মহাশয় মহাভাবময়ী মাতৃমূর্তি নয়ন-

গোচর করে ভাবের আবেশে আনন্দময়ী মা'কে দুর্গাদেবী রূপে পূজা করলেন। গোপাল ঠাকুরের এক শিষ্যা যমুনাদেবী অভিভূত হয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। চোখের জলে সিক্ত হয়ে বলতে লাগলেন, মাগো, কতদিনের আশা তোমায় দেখবো। কত কথা বলবো ভেবেছিলাম কিন্তু এখন তোমায় কাছে পেয়ে সব ভুলে গেছি। চোখ খুলেও তোমায় দেখছি। চোখ বন্ধ করেও তোমার অপরূপ মূর্তি নয়নগোচর করছি। মাগো! আজ আমার আনন্দ যে আর বুকে ধরছে না। আমি সহ্য কবতে পারছি না, একি আনন্দ! আনন্দ, আনন্দ ওগো আনন্দময়ী! অভিভূতা যমুনাদেবীর গায় মাথায় হাত বুলিয়ে মা তাকে শান্ত করলেন।

আবার একদিন এলাহাবাদের লীলা সাঙ্গ করে মা চলে এলেন শ্রীশ্রীহরিবাবার আশ্রমে। পাঞ্জাবে। ভিরাউটিতে। শ্রীশ্রীহরিবাবা যোগী ও সিদ্ধপুরুষ। পাঞ্জাবই তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আশ্রম আছে। সম্প্রতি মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলাও শিখেছেন। সর্বদাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। স্বপ্নাবেশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং এসে তাঁকে কৃষ্ণনাম শুনিয়ে গেছেন। আনন্দময়ী মা'ও তাঁকে বাবা-বাবা বলে ডাকেন।

অবশেষে ভক্তবৃন্দসহ মা এসে পৌছুলেন ধনারী ষ্টেশনে। এখান থেকে ভিরাউটি যেতে হবে। শ্রীশ্রীহরিবাবা হাতী নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে হাতীতে বসিয়ে হরিবাবা স্বয়ং ভক্তবৃন্দসহ কীর্তন করতে করতে মাকে নিয়ে চললেন আশ্রম অভিমুখে। দলে দলে গ্রামের লোক এসে কীর্তনে যোগ দিল। পবিত্র প্রাণস্পর্শী সে কীর্তনের সমারোহ।

আশ্রমটি একটি বড মাঠের মধ্যে। দূরে দূরে কয়েকটি কুটির করা হয়েছে। আশ্রমে চৈতন্য মহাপ্রভুর ষডভুজ মূর্তির ছবি আসনে বসান হয়েছে।

মায়ের কুটিরটি একটি নিমগাছের নিচে। গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁধানো। হরিবাবা ও উড়িয়াবাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কুটির। এ ছাড়া তাঁবুও ফেলা হয়েছে। উদয়াস্ত নাম চলছে। কৃষ্ণকীর্তন। মা'কে নিয়ে সে যেন এক মহামহোৎসবের সমারোহ। মায়ের আগমন উপলক্ষ্যে বহু মানুষের মেলায় মুখর হয়ে উঠলো হরিবাবার আশ্রম। ভিরাউটি গ্রাম। সুহাস্যমণ্ডিতা মা আনন্দময়ী আশ্রমে এসে বসলেন মখমলের বিছানায়। মাতৃউৎসব জেগেছে কীর্তনের সুমধুর ধ্বনিতে, ধূপের সৌরভে আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেরা এসে মা'কে আরতি করলেন। মাল্যে

চন্দনে ও তিলকে আরও অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করলেন মা আনন্দময়ী। এইভাবে মা'কে ঘিরে পূজা আরতি নামগান নিমাইলীলা রাসলীলা চললো কয়েকদিন ধরে।

অবশেষে আনন্দময়ী মা শ্রীশ্রীহরিবাবা'র সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে লাগলেন। কোথাও পদব্রজে, কোথাও গরুর গাড়ীতে আবার কোথাও হাতীতে চড়ে। এ যেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। 'তোদের হাতে ধরি, পায়ে ধরি, একবার বল্ রে, এমন মধুমাখা হরিনাম, একবার বল্ রে। বিনামূল্যে হরিনাম একবার বল্ রে॥'

পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো কৃষ্ণনাম, গৌরাঙ্গ নাম আর মা আনন্দময়ীর নাম। ভক্তিমতী পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা আনন্দময়ী মা'কে শ্রদ্ধাভরে আদর করে বলে, 'বাঙ্গালী মাতাজী' আনন্দমাই, দুর্গামাই। মা যে আমাদের জগজ্জননী! পরমাপ্রকৃতি আনন্দময়ী মা!

ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে মা বলছেন,—'জগতে সকলেই এক পরম পিতারই সৃষ্ট বলে কারো সঙ্গে কেউ ভিন্ন নয়। যে রকম এক পরিবারে বহু ছেলে-পিলে হলে জীবনযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য দশ রকম ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে দশ জায়গায় দশখানি বাড়ী করে তারা বসবাস করে তেমনি মূলে সকলে এক হলেও কর্মশৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে বহুভাবে বহুরূপে দলবদ্ধ হয়ে সবাই রয়েছে মাত্র। জগতে যেমন রোগের প্রতিকারের জন্য অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজী ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে, যার যেটি উপযোগী সে সেই চিকিৎসা গ্রহণ করে, তেমনি ভবরোগীর জন্য শাস্ত্রবাক্যে ও ও সাধুমুখে নানা বিধান নানা উপদেশ রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। হিন্দু মুসলমান শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিভিন্ন পথগুলি তাঁর দুয়ারেই পৌঁছেছে। রেল স্টেশনে ঢোকবার পথেই যত গোলমাল, যত ঠেলাঠেলি, প্ল্যাটফরমে গেলে যার যার গন্তব্যস্থান নির্দিষ্ট।'

আবার বলছেন দেখ, জগতে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার বস্তু কিছুই নেই; তিনি অনন্তভাবে অনন্তরূপে অনন্তলীলার খেলা খেলছেন। বহু না হলে এ খেলা কি করে চলে? দেখো না আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ, আগুন ও জল কেমন করে একই শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। মনে রাখবে শুদ্ধ ভাবের সঙ্গেই সাধনা। আমরা যতই অশুভ বা সঙ্কীর্ণ চিন্তার প্রশ্রয় দিই, ততই আমরা জগতের অমঙ্গলের কারণ সৃষ্টি করি। পরের কি আছে না আছে তোমার

বিচারের দরকার কি? নিজে তৈরী হও। নিজে সুন্দর হয়ে সুন্দর হৃদয়-আসনে চিরসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সবই সুন্দর দেখতে পাবে।'

ভগবান যে প্রেমময়। প্রেমের ঠাকুর। তাঁর কাছে যেতে হবে। খুব কাছে। তাঁকেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁকে ভালবাসতে পারলেই সব ভালবাসার সফলতা।

—'ভাবের গভীরতা চাই, তাতে ডুব দেওয়া চাই। নতুবা কেবল ভেসে বেড়ালে শক্তির ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হয় না। বহু জন্মের সংস্কারগুলি বট অশ্বত্থের শিকড়ের মত দেহ মনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের উৎপাটন করতে হলে ভিতরে বাইরে কঠোর কুঠারাঘাতের দরকার। রোজ রোজ যতক্ষণ পারো বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করে তাতে একটু লেগে থাকবার চেষ্টা করবে।'

'শুধু অনুষ্ঠানের ঘটায় সাধন ভজনে স্থিরতা আসে না। মনে রাখা উচিত ভাবহীন অনুষ্ঠান প্রকৃত ধর্মের সহায়ক নয়। তপস্যা মানেই তাপ সহ্য করা। ত্রিতাপের যে জ্বালা তার চেয়েও বেশী তাপিত না হলে তপস্যা হয় না। সকল ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণ সংযম চাই। যতদিন অপূর্ণতার লেশমাত্র থাকবে ততদিন পূর্ণের দর্শন পাওয়া কঠিন। যাঁর ইঙ্গিতে জগৎ চলছে, তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করা। বিষয়ভোগের তৃষ্ণা আপনা হতেই ছেড়ে যাবে।'

'বাতাস উঠলে যেমন নদী তড়াগের জল স্থির থাকে না, সেরূপ চিন্তা থাকলে মন কখনও স্থির হয় না। দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তাশূন্যতা বা শান্তভাবের অভ্যাস করা। মাঝে মাঝে মৌনব্রত অবলম্বন করা। তাতে মনের শক্তি বাড়ে। যেই দেখলে বিষয়চিন্তা এসে তোমাকে পুনঃ পুনঃ অস্থির করে তুলছে, যে কোন উপায়ে তাকে সরাবার চেষ্টা করা। কলকৌশলের দ্বারা যেমন বড় বড় খাল বিল জলশূন্য করা হয়, তেমনি একনিষ্ঠ অভ্যাসের দ্বারা বাসনা কামনার সিন্দুকটিও খালি করা যায়। ঈশ্বর চিন্তার স্পর্শে চিত্তের সংস্কার বা মলিনতা দূরীভূত হয়।'

কঠিন তত্ত্বকথা নয়, কাব্যময় কথামৃত। রসাস্বাদন করছেন ভক্তবৃন্দ। বিন্ধ্যাচলে। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সব রকমের ভক্তই আছেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একজন সাধু এসে উপস্থিত হলেন। সাধুটি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত। শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেই ভক্তিতে আপ্লুত হলেন। মা'কে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে শোনাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। মা সম্মতি দিয়ে, শিশুর মত হয়ে গেলেন এবং আনন্দিত চিত্তে সাধুটির পাঠ শুনতে লাগলেন। মায়ের লীলা দেখে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। এইভাবে মা আনন্দময়ী ভক্তসনে লীলা করে আবার একদিন চলে এলেন বারানসীধামে। কাশীতে। সেই কাশী—'কাশতে তত্ত্বং' মাত্র,—যেখানে নিরন্তর তত্ত্বের প্রকাশ হচ্ছে। তত্ত্বময়ী মা আনন্দময়ী সেই শুদ্ধ তত্ত্বময় স্থান কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন। ভক্তবৃন্দ মা'কে ঘিরে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রইলেন। মা ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গাবক্ষে নৌকা বিহারে বহির্গত হলেন। সমস্ত রাত্রি নৌকাতেই অবস্থান করলেন। নৌকা বৎসরাজ ঘাটে বাঁধা হলো। রাত্রি গভীর হয়ে এলো। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু একটানা জল-কলরোলের শব্দ। আর মাঝে মাঝে শোনা যায় মায়ের মুখ-নিসৃত অমৃতনিস্যন্দী সুরের কথামৃত। জলকলরোলের শব্দ নয় যেন নামধ্বনি উঠছে। আর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে তারই মধুর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন ভক্তবৃন্দ। অবশেষে সেই রাত্রিরও হলো অবসান। ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গঙ্গাতীরের মন্দিরাদি। বৃক্ষরাজি। সমগ্র বারানসীধাম। ভোরের বাতাস বয়ে নিয়ে এলো মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, আর স্নানার্থী ভক্ত সাধুদের মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দোবদ্ধ সুমধুর স্বর। ধীরে ধীরে উদিত হলেন সূর্যদেব। প্রভাত কিরণে চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। প্রকৃতিদেবী যেন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মুখে হলেন বিরাজিত। মা আনন্দময়ীও অপরূপ অনির্বচনীয় এক ঐশীমূর্তি ধারণ করলেন।

* * *

'হ্যাঁ, তুই-ই সেই 'মাধব পাগলা।' এখন হইতে তুই নিজেকে 'মাধব-পাগলা' বলেই মনে করিস্।'

—'মা, আমি কি সেই মাধব-পাগলা?' এই প্রশ্নের উত্তরে মা আনন্দময়ী বললেন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের শিষ্য শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায়কে। মা এঁকে গোপাল বলেই ডাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। কাশীতে বিধবা মা'কে নিয়ে রয়েছেন। মাতা-পুত্র উভয়েই রামঠাকুরের

দীক্ষিত শিষ্য। ওঁর পূর্বজন্মের ইতিবৃত্ত, 'মাধব' শব্দ নিজস্ব অনুভূতি, ও স্বপ্ন-দর্শনের নানা ঘটনাবলি শুনে মা দৃঢ় কণ্ঠে ওঁকে 'মাধব-পাগলা' বলেই নির্দেশিত করলেন।

কিন্তু এখনও ওঁর সংশয় যায় না তাই বললেন,—'মা, তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে বৃথা নিজেকে 'মাধব-পাগলা' বলে ভাববো কেন?'

এই কথা শোনামাত্র আনন্দময়ী মা'র মুখের ভাবের পরিবর্তন হলো। ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—'কি, এ শরীরটার কথা মিথ্যা? না মিথ্যা নয়, তুই এ শরীরটার কথাকে বিশ্বাস করিস্। তুই-ই সেই 'মাধব-পাগলা।'

—'আচ্ছা মা, মাধবকে আমার কথা রাখতে হয় কেন?' এবারে আনন্দময়ী মা'র মুখে চোখে এক দিব্য প্রসন্নভাব খেলে গেল। শান্ত সহানুভূতির সুরে মা বললেন,—'হ্যাঁরে রাখবে না? এর আগের বারে এত ডাক ডেকেছিস্, এত সেবা করেছিস, তোর কথা সে রাখবে না? তোর কথা কি সে না রেখে পারে?'

'মাধব পাগলার' নিজের ভাষায়,—'মায়ের মুখে এ কথা শুনিবামাত্র মাধবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। পুলক শিহরণে আমার দেহ মনে এক বর্ণনাতীত অবস্থার সৃষ্টি হইল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মা'কে প্রণাম করিয়া আশ্রম ছাড়িয়া রাস্তায় চলিয়া আসিলাম। আর পূর্বজন্মের মাধবের কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

'এই ঘটনার পর হইতে শ্রীশ্রীমা ও আশ্রমবাসীরা আমাকে 'মাধব-পাগলা' নামে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ মায়ের সহিত যখন আমার পূর্বোক্ত কথাবার্তা হইতেছিল তখন সেখানে অনেক ভক্ত শিষ্য এবং মায়ের দর্শনার্থী বাহিরের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে সকলের নিকট মা আমার 'মাধব-পাগলা' নাম প্রচার করিয়া দিলেন। মায়ের আদেশে তখন হইতে আমিও নিজেকে 'মাধব-পাগলা' নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করি।'*

শাস্ত্রানুসারে দেখা যায় সন্ন্যাস নিবার সময় গুরু শিষ্যের একটি নামকরণ করে দেন। এখানেও ঠিক যেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা গৃহস্থাশ্রমের শৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায়কে তাঁর অবধূত অবস্থায় 'মাধব-পাগলা' নামকরণ করলেন। এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রেরণা দান করলেন।

পরবর্তী জীবনে 'মাধব-পাগলা' সাধন জীবনে খুবই উন্নত হয়েছিলেন।

* 'শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব-পাগলা'—লেখক—মুক্তানন্দ।

এক সময়ে কাশীতে 'অবধূত মাধব পাগলা' নাম সাধারণ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তিনি দীর্ঘদিন কাশীর পাতালেশ্বর মহল্লার এক মসজিদে বাস করেন। শীত গ্রীষ্মে একখানি কাপড় লুঙ্গির মত দুই ভাঁজ করে পরিধান করতেন। খালি গায়ে, খালি পায়ে, পরমানন্দে থাকতেন। যেন আনন্দের মূর্ত প্রতীক। বাংলা ১৩০৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে কাশীতেই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের নিকট থেকে দীক্ষালাভ করেন। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র কৃপায় তিনি নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হন।

কাশীধামের বিখ্যাত ভাগবত পাঠক ও পরিব্রাজক শ্রীমৎ অনাদিচৈতন্য ব্রহ্মচারী, অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলা সম্বন্ধে বলেছেন: 'শ্রীমৎ মাধব-পাগলা ভক্তিশক্তির সাক্ষাৎকার করেছেন। এই অবধূতপ্রবরের সান্নিধ্য লাভ করে আমি কৃতার্থ হয়েছি। ইনি এক বিশেষ শ্রেণীর সাধকভক্ত এবং উত্তমা ভক্তির অধিকারী পুরুষ ছিলেন।'

* * *

কাশী থেকে সারনাথে এসে বুদ্ধমন্দিরের সম্মুখে বসে ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা বলছেন,—'নেই বললে কিছুই নেই। আর আছে বললে সবই আছে। দেখো না কেউ বলছে জগৎ মিথ্যে আবার কেউ বলছে সত্যি। অনেকে বলে দেবদেবীর কোন সত্তা নেই। আবার কেউ বলে নিশ্চয়ই আছে। এমন কি ডাকাডাকিতে এঁদের দর্শন লাভও হয়। এঁদের কথাও কানে শোনা যায়। শিশুর কাছে মাটি বা রবারের পুতুল জীবন্ত মানুষের মত সত্যি। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সে দৃঢ় ধারণা অসত্যে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই দেখা যায় প্রত্যেকের সাময়িক ভাবের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিষয়ের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিরূপিত হয়। প্রকৃত ভাব যখন একমুখী হয়ে জমতে জমতে ঘনীভূত হয়, তখন কারো কারো চিত্তে সংস্কার বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মহৎ ভাব প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং বাণীরূপে প্রকাশ পায়। একনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্তগৃহে এসব নৈমিত্তিক উৎসব মাত্র। অধ্যাত্মপথে চলতে চলতে ঈশ্বর চিন্তার প্রবাহ ধরে যখনই আপনাকে হারানো যায় তখনই এইরূপ বিবিধ খণ্ডবিভূতির স্বতঃসিদ্ধ দর্শন-লাভ ঘটে। এরা অসহায়সূচক হলেও কদাচ সাধকের শেষ লক্ষ্য নয়। জল থেকে বাষ্পাকারে মেঘ জন্মে, কিন্তু এ মেঘের কোন সার্থকতা নেই যে পর্য্যন্ত না বর্ষিত হয়ে জগৎকে তৃপ্ত করে। তদ্রূপ মহাসত্তায় ডুবে পূর্ণ স্থিতি-

লাভ না করা অবধি সাধনার পূর্ণাহুতি হয় না।'

ধীরে ধীরে নেমে এলো অপরাহ্ন। অদূরাগত সূর্যাস্তের ম্লান আলোর ক্ষীণ আভা এসে মন্দির গাত্রে নৃত্য করতে শুরু করে দিল। সেই সময় বুদ্ধমন্দিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতীব মনোরম। অবর্ণনীয়। সেই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে মা আনন্দময়ী আবার বলছেন,—'সূর্য চন্দ্র বা বাইরের আলো দিয়ে আর কয়দিন চালাতে পারবি? চোখ যখন দেখবে না, শরীর যখন চলবে না, বুদ্ধি যখন বিভ্রান্ত হবে, তখন যে কেবল অন্ধকারেই হাতড়াবি। সময় থাকতে থাকতে ভিতরের আলো জ্বালাবার চেষ্টা কর। মনের চুল্লিতে আত্মবিচার বা নামের আগুন ধরিয়ে দে। সাধুসঙ্গ প্রার্থনা উপাসনাদির বাতাস দিয়ে সে আগুন সতেজ রাখ। ক্রমশঃ এর জ্যোতিঃ স্থির হয়ে যাবে। তখন সে আলোতে ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে আত্মদর্শনের পথ সুগম করে তুলবে।'

—'যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন, তবুও ভাবে ও কর্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার। কেন না জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারগুলি এমনভাবে মানুষকে বদ্ধ করে রেখেছে যে তাঁর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। আগুনের তাপে যেমন ভিজে কাঠও শুকিয়ে আগুনের স্বরূপ ধারণ ক'রে, আগুনের ইন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভগবৎ স্মৃতির তীব্রতায় বিষয়বৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকলে হৃদয়ে ক্রমশঃ চিদানন্দের আভাস দেখা দেয়। কথাটা হচ্ছে এই, ধনজন প্রতিষ্ঠার উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিও অন্তরে একটু রাখতে চেষ্টা করা। সংসারটাকে ভেঙে এ শরীরটা কাউকে বনে জঙ্গলে যেতে বলে না। তোরা সকলে ধর্মের সংসার কর। অর্থবিত্তশূন্য কোষাগারের যেমন কোন মাহাত্ম্য নেই, তদ্রূপ ধর্মহীন মনুষ্যজীবনের কোনও মূল্য নেই।

'যা হবার তা হবে সম্পূর্ণ সত্য কথা। নিজের জীবন ও পরের জীবনের ইতিহাস উলটিয়ে দেখলে দেখতে পাবে যে মানুষ নিজেই বা কতটুকু করতে পারে এবং অলক্ষ্য শক্তির অদৃশ্য বিধানেই বা কতখানি সংঘটিত হয়। জগৎটা সেই পরমপিতার ইচ্ছায় সুচারুরূপে নিয়মিত এবং 'তিনি যে অবস্থায় আমাকে রাখবেন বা আনবেন তাই আমি বরণ করবো'—এ সিদ্ধান্তে যতই স্থির হতে পারবে ততই নির্ভরের ভাব দৃঢ় হবে এবং ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে প্রেমচক্ষু উন্মীলিত হবে।'

এবারে নিঃশব্দে নেমে এলো রাত্রি। সামনের বুদ্ধমন্দির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সত্য কিন্তু যিনি সমুদয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও অনন্ত আনন্দের

প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন, তাঁরই মহত্তম ও পবিত্রতম ভাবধারা মন্দিরের চারিদিকের বাতাসের মধ্য দিয়ে যেন প্রবাহিত হয়ে চলছিলো। শ্রীশ্রীমা সাময়িক ভাবে গৌতম বুদ্ধের ভাবে ভাবিত হয়ে বিভোর হয়ে রইলেন। রাত্রিতে ভক্তবৃন্দসহ বিড়লার ধর্মশালায় অবস্থান করলেন।

কাশী ও সারনাথের লীলা সাঙ্গ করে মা এসে উপস্থিত হলেন নবদ্বীপ ধামে। ভক্ত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকারের প্রার্থনায়। মায়ের জন্মোৎসবের আয়োজন হয়েছে গোবিন্দ মন্দিরে। মায়ের আগমন সংবাদে দলে দলে ভক্তরা ছুটে এলেন নবদ্বীপধামে। আনন্দময়ী মা'কে কেন্দ্র করে সমগ্র নবদ্বীপধাম যেন আবার নূতন করে জেগে উঠলো, মেতে উঠলো গৌর কীর্তনের মহিমায়। নাম গান আর মা-মা কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো গোবিন্দ মন্দির। এই সময় সাধিকা শ্রীশ্রীনির্মলা মা ও শ্রীশ্রীবিমলা মা'ও উপস্থিত ছিলেন।

মা সমাজবাড়িতে এসে দর্শন দিলেন সখীমাকে। সখীমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন,—'আমি ত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী। বের হতে পারি না। মা কৃপা করলেন বলেই মেয়েটা দর্শন পেলো।' তারপর রাধাশ্যামের মন্দির দর্শন করে মা এলেন হরিসভায়। এখানে গৌরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সেবায়েতও ভক্ত মুরারিবাবু। তিনি গৌরমূর্তিকে আনন্দময়ী মূর্তিতে সাজিয়ে রেখেছেন। মায়ের আগমনে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে বললেন,—'মা গৌর আর তুমি এক। গৌরকে পূর্ণিমার দিন যে কাপড় পরিয়ে দেবো তা তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়ে রাখবো।' মা আর কি বলবেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

পাঞ্জাবের শক্তিধর সাধক শ্রীশ্রীহরিবাবাও একদিন ভক্ত মনোহরকে বলেছিলেন, 'এবারে মহাপ্রভু গুপ্তভাবে এসেছেন। তিনিই আনন্দময়ী মা।' আবার একসময় অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন,—'আমি ডেরাডুনে গিয়ে মা'র একখানি ভাবের ফটো দেখেছিলাম ও কিছু কিছু তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিলাম। তখন পর্য্যন্ত মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিলো যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবের বিষয় যা যা শুনেছি মা'র মধ্যে যেন উহারই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। মহাপ্রভুর বিষয় শুধু পুস্তকেই পড়েছি, এবার সাক্ষাৎভাবে ঐসব মায়ের মধ্যেই দেখা গেল।'

অবশেষে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে আনন্দময়ী মা সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন শুরু করলেন :

দুর্বলের বল হরি বল হরি বল
আমি কি নিয়ে আর থাকব বল ?
মন হরি বল হরি বল।

শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠনিঃসৃত সেই দিব্য ভাবের সঙ্গীত ভক্তপ্রাণে প্রবাহিত হয়ে চললো আনন্দের ধারা। সৌন্দর্য আর আনন্দ। আনন্দ · আনন্দ আর আনন্দ। এইভাবে 'আনন্দময়ী মা' প্রেমময় গৌরসুন্দরের লীলাভূমি নবদ্বীপ ধামের লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন ঢাকায়।

বহুদিন পর অকস্মাৎ মা'কে ঢাকায় পেয়ে ঢাকার ভক্তদের আর আনন্দ ধরে না। হাজার হাজার ভক্তের আগমনে মুখর হযে উঠলো মাতৃমন্দিরাঙ্গন। শাহবাগে রমনায় কিছুসময় অবস্থান করে মা চলে এলেন ভোলাগিরি আশ্রমে। এখানে ভাইজীর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—'দেখ, সংসারে সকলেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু এ কথা খুব কম লোকেই ভাবে যে, 'তিনি' হৃদয়ে না জাগলে পূর্ণ শান্তি কিছুতেই পাওয়া যায় না। ধনে শান্তি হয় না। পুত্র পরিজনে ও প্রতিষ্ঠালাভেও শান্তি হয় না। কারণ সাংসারিক ভোগমাত্রই দিনরাত্রির মত পরিবর্তনশীল। আসতে আসতে চলে যায়। এই যে গতি, গতির মধ্যে কি করে স্থিতির ভাব আসবে ? জগতই গতিশীল। আজ শিশু, তারপর যুবা, পরে বৃদ্ধ, এই ত অবস্থা। এই সংসারে শান্তির আশা করা যেতেই পারে না।

এই কারণে এমন ধনে ধনী হওয়া আবশ্যক, যার আর ক্ষয় নেই। এবং যা পেলে সকল আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিটে যায়। সে ধন একমাত্র ভগবান। যিনি সকলের হৃদয়ে থেকেও অপরিচিত হয়ে রয়েছেন। সৎ চিন্তা, সৎ ভাব, সৎ কর্মাদির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার দূর হলে, সেই পরম সুন্দরের মোহন রূপ আপনা হতেই ফুটে ওঠে। এবং চিত্তে পূর্ণ শান্তির রাজত্ব আরম্ভ হয়।'

আবার অকস্মাৎ একদিন মা ঢাকার আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের সাধু শ্রীশ্রীহরিবাবাও কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। একদিন শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীহরিবাবাসহ দর্শন দিলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে। তাঁর বয়স ১০৮ বৎসর। বিখ্যাত পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ। শ্রীশ্রীহরিবাবাও তাঁর বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দর্শন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ও শ্রীশ্রীহরিবাবাকে নিজগৃহে পেয়ে

খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। ভাবাবেগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নানা ভাবে মায়ের স্তুতি করলেন। তারপর বললেন,—'মাগো, আমার ব্যাকুলতাই তোমাকে আমার এত কাছে টেনে এনেছে। আমি এখন বৃদ্ধ। অসুস্থ। কোথাও গিয়ে দর্শন করবার ক্ষমতা নেই। সবই তোমার কৃপা মাগো!' আনন্দময়ী মা স্নেহময়ী জননীর মত বৃদ্ধের কাছে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। আশার বাণী শোনালেন। তারপর বললেন,—'ভক্তের টানে ভগবান বাধ্য হন। ইলেকট্রিক তার যেমন স্পর্শ করলে আর হাত ছাড়ানো যায় না, ঐ দিকেই টানে, সেইরূপ আর কি!'

এইভাবে শ্রীশ্রীমা হরিবাবাসহ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ভক্তসনে লীলা করে, বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে এসে উপস্থিত হলেন আদ্যাপীঠে। মহাপীঠ আদ্যাপীঠ। শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের লীলাভূমি। রামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন ১৩২৮ সালে। আর আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৩৩৪ সালের পুণ্য মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে। পর বৎসরই শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের দেহাবসান হয় ৺পুরীধামে। আর শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুরের সহধর্মিনী শ্রীশ্রীমণিকুন্তলা দেবীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে ওঠে মাতৃ-আশ্রম। ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা সাধিকাশ্রেণীর মায়েরা এখানে অবস্থান করেন। 'সাধিকা' বিমলা মা,' 'সাধিকা নির্মলা মা' মাতৃ আশ্রমের কার্য্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুরের বিমল অমিয় চরিত্রের পূত স্পর্শে পবিত্র হয়ে বহু ভক্ত শিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে কর্মযজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হেম ভাই, আনন্দ ভাই, নিরঞ্জন ভাই, সিদ্ধেশ্বর ভাই, দয়াল ভাই, জ্ঞান ভাই ও সুধীর ভাই।

নানা উৎসবের আনন্দে মুখরিত এই আদ্যাপীঠ মাতৃ আশ্রম, ব্রহ্মচর্য বালকাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করে মা আনন্দময়ী ভাবানন্দে বিভোর হলেন।

এইভাবে আনন্দময়ী মা কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানের মঠ মন্দির ও তীর্থস্থান পরিক্রমা করে ভক্তসনে লীলা করে চলে এলেন ৺পুরী ধামে। ভক্তদের নূতন প্রতিষ্ঠিত 'স্বর্গদ্বার আনন্দময়ী আশ্রমে।'

—'মানুষ মাকড়সার মত জালের উপর জাল তৈরী করে অনন্তকালের জন্য নিজেকে ওই জালে জড়িত করে রাখতে চায়। ভোগ মোহের ভুলে পড়ে, একবার ভেবে দেখে না যে, বার বার জন্মমৃত্যুর ঘাত-প্রতিঘাত কি যন্ত্রণাদায়ক। 'বর্তমান জীবনেই কর্মবন্ধন শেষ করতে হবে।'—এই অটুট সঙ্কল্প নিয়ে সেনাপতির মত আপনার শক্তিবলে মায়াজাল ছিঁড়তে চেষ্টা কর। অথবা অবরুদ্ধ সৈন্যদলের মত বিশ্বপিতার নামে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকো। তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন। খাঁটি আনন্দ কাকে বলে জানো? যার জন্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর উপর নির্ভরের ভাব থাকে না,—যা স্বপ্রকাশ আপনাতে আপনি পূর্ণ। সত্য ও নিত্য। সংসারের রূপ-রসাদির ভোগে তোমরা সুখ পাও, কিন্তু সে তৃপ্তি আপাতমধুর বা ক্ষণস্থায়ী বলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তোমাদের ছুটাছুটি কমে না। অন্তরের আনন্দ চাই। যিনি সকল রসের আধার, দৃঢ়তা ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁর রসে রসবান হওয়ার সঙ্কল্প করো, তাহলে ইন্দ্রিয়াদির দাসানুদাস হয়ে ভিখারীর মত এ দুয়ারে সে দুয়ারে আর ঘুরতে হবে না। তাইতো এ শরীরটা বলে, নিজেকে জয় করতে না পারলে জগৎ জয় করলেও মুক্তির পথ দুর্লভ।' শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে বলছেন, আলমোড়ায়।

ভক্তসাধন ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা মা, ভগবানের কাছে আবার দোষগুণ কি? সকলই ত তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।'

মা মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'সকলই তাঁর ইচ্ছা' বলে যতক্ষণ বাইরে দোহাই দিয়ে চলবে, ততক্ষণ তোমার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে খেলছে মনে করবে। দেখো তাঁর ইচ্ছা যখন তোমার ভিতর এসে জায়গা পাবে, তখন তাঁর ইচ্ছা ও তোমার ইচ্ছা এমন মিলে মিশে থাকবে যে দুটিকে আলাদা করে চেনাই যাবে না। তোমার ইচ্ছা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিহিত কর্মাদিতে তাঁর ইচ্ছাব অনুগত হয়ে চলবে এবং ফলাফল সন্তুষ্ট মনে অকাতরে গ্রহণ করবে। ভগবৎ ইচ্ছায় অবিচারে আত্মসমর্পণ করাই শুদ্ধ প্রেমিকের ধর্ম। এরূপে এমন সময় আসবে, যেদিন তোমার ইচ্ছা বলে আর কিছুই থাকবে না। সকলই কেবল এক শক্তিময়ের খেলা বলে বাইরে ভিতরে অনুভূত হবে।

বস্তুতঃ এই বিচিত্র জগৎটির কোন উদ্দেশ্যই থাকে না, যদি না বুঝতে পারো যে আমরা সকলেই তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে অভেদরূপে মিলিত হবার জন্যই পলে পলে অগ্রসর হচ্ছি। আবার বলছেন,—'সকল কর্মে তিনি আছেন'—এই কথাও শোনায় বেশ ভাল! কিন্তু সব কাজ আমরা এমন ভাবে করে থাকি যেন তা শেষ ইন্দ্রিয় তর্পণমাত্র হয়ে পড়ে। দেখ না, এই কারণে হারজিতে আমাদের কত হাসি কান্না! যারা পরের চাকরী করে, ধনীর লাভ লোকসানে তাদের তত মাথা ঘামে না। 'কর্মে শুধু তাঁরই সেবা হচ্ছে'—এই বুদ্ধিতে যে পারে স্থিতিলাভ করতে, সে কর্তব্য শেষ করে ফলাফলের আশায় ফিরে চায় না। কর্মের আরম্ভে মধ্যে ও শেষে তাঁর স্মৃতি চোখের সামনে রেখো, তাহলে সকল কর্ম তাঁকেই অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।'

এবারে শ্রীশ্রীহরিবাবা জানতে চাইলেন ঢাকার আশ্রমের কালীমূর্তির হাত ভেঙে গহনা চুরির ইতিবৃত্ত। শ্রীশ্রীমা হেসে হেসে বলছেন, 'চুরির দিন এ শরীর কক্সবাজারে ছিলো। সেই দিন সকালবেলা হতেই নিজের শরীরের এক হাত দিয়ে অপর হাতখানা ভাঙবার বা কাটবার ভাব প্রকাশ হচ্ছিল। খুকুনি ভয়ে ভয়ে দা ছুরি লুকিয়ে রাখছিলো। এবং এই শরীরটাকে ছেলেমানুষের মত ভুলিয়ে রেখেছিলে। কথাটা হলো এই যে, চোরটার সকালবেলা হতেই ঐ ভাবটা প্রবল হয়েছিলো। অবশ্য সে চুরি করলো রাত্রিতে, কিন্তু প্রাতঃকাল হতেই চুরি করবার ভাবটা প্রবলভাবে চলছিলো। চোরের ওই ভাবটিই এই শরীরের মধ্যে এসে ঐ ভাব প্রকাশ হচ্ছিল। কারণ ঐ চোরই বা কে? ঐ চোরও যে আমিই। কে কার হাত ভাঙবে? আমিই যে আমার হাত ভেঙে গহনা নিয়েছি। এক ছাড়া দুই কই?'

কথাগুলি মা এমন সরল অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন যে কারো মনে কোনরূপ সংশয়ের উদয় হলো না।

ভক্তদের অনুরোধে মা আবার বলছেন ঢাকায় লঙ্কার গুঁড়া খাওয়ার গল্প। বাবা ভোলানাথ মায়ের প্রথম জীবনে লঙ্কার গুঁড়া খেতে দিয়ে যে পরীক্ষার প্রচেষ্টা করেছিলেন তারই রহস্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত। ভক্তরা মায়ের কথা মায়ের শ্রীমুখ হতে শুনছেন। আনন্দময়ী মা'র ভাষায়;—'ঢাকাতে যখন এ শরীরটা আর বেশী কাজকর্ম করিতে পারিত না, শরীর সব সময় উঠিত না, এই অবস্থা চলিতেছিল. তখন একটি ভদ্রলোক এ শরীরের মসলা বাটা ইত্যাদিতে কষ্ট হইবে বলিয়া নিজ বাড়ি হইতে মসলা সব ধুইয়া গুঁড়া করিয়া আনিয়া দিত। একদিন সেই ভদ্রলোক মসলা গুঁড়া করিয়া শাহবাগে নিয়া

আসিয়াছে। লঙ্কারও গুঁড়া আনিয়াছে। ভোলানাথ কথায় কথায় এ শরীরটাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, তোমার ত কিছুই লাগে না, লঙ্কার গুঁড়া খাইলেও ত লাগিবে না?' এ শরীর বলিল,—'বেশ ত তোমার যখন মনে হইয়াছে তখন খাওয়াইয়া দেখ না কি হয়। এ শরীরও দেখুক, তোমরাও দেখ। ভোলানাথ বলিলেন, 'চোখে জল আসিতে পারিবে না বা শিশাইতে পারিবে না।' এ শরীরটা তখন মুঠার ভিতর যতটা ধরে উঠাইয়া মুখে দেওয়া হইল। এ শরীরের মনে হইল যেন ছাতু খাইতেছে। কাজেই শারীরিক কোনরূপ পরিবর্তন হইল না। ঘণ্টাখানেক পরে এ শরীর উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম করিতে লাগিল। তারপর হইল কি, ভোলানাথের যেমন জ্বর, তেমনি পেটজ্বালা। আবার এই শরীরই তাঁর সেবা করে। বড় ডাক্তারেরা দেখিতেছেন, কিছুই হইতেছে না। ১৮।১৯ দিন ধরিয়া দিন রাত্রি এমনভাবে বসিয়া সেবা হইয়া যাইতেছিল যে, এক মুহূর্তের জন্যও শরীরটা ঝিমাইত না। যেমন খাওয়া বন্ধ তেমনিই ঘুম ও শোওয়া বন্ধ। একদিন রাত্রিতে যখন ভোলানাথের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল, তখন মটরী, আশু ও বাউল কাঁদিতে লাগিল। বিকার অবস্থায় ভোলানাথ উঠিয়া বসিয়াছেন, তখন মুখ হইতে বাহির হইল,—'তোমাকে কতবার বলিয়াছি, এ শরীরটাকে পরীক্ষা করিও না।' ভোলানাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—'আর করিব না'। এখন একটু ভিজা চিঁড়া জলে গুলিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথের খাওয়া একেবারেই ছিল না, অনবরত বমি হইতেছিল। চিঁড়া খাওয়াইবার পরই শুইয়া পড়িলেন। এই চিঁড়া কিন্তু পূর্বদিনই আনিয়া ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সারাদিন কিছুই করা হয় নাই। এই সময়েই বাহির করিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন হইতেই ভোলানাথের বমি বন্ধ হইয়া গেল। খুব জ্বর হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া উঠিল।'

গল্পশেষে মা বলছেন,—'তোমরা যেমন বাহির করিয়া নিতেছ, তেমনি বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার কেহ কেহ হয়তো এই সকল কথা শুনিয়া এ দেহের অসাক্ষাতে এ দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছে,—'আনন্দময়ী মা দেখি নিজের কথা নিজেই বলেন।' এই কথা বলে মা দেব দুর্লভ হাসি হাসতে লাগলেন। চিরজ্যোতির্ময়ী হাস্যমুখর এক মূর্তি ধারণ করলেন। ভক্তজনের সম্মুখে এক অপরূপ দিব্যমূর্তিতে হলেন প্রতিভাত।

আবার বলছেন হেসে হেসে,—'কিন্তু উহাদের দোষ নাই। উহারা ত বুঝিতে পারে না যে এ দেহের কাছে ভগবৎ চর্চাও যা এগুলিও তাই।'

এবার ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মায়ের পুরানো ভক্ত শ্রীমতী হিরণবালা ঘোষ গান শুরু করলেন,

'হে মাতাজী মেরা অবগুণ চিতে না ধরো।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে। ভিতরে ঘরে গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। আর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে শুধুই যেন সেই সঙ্গীতের মধুর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীশ্রীমা আত্ম-সমাহিত অবস্থায় ভক্তমণ্ডলী পরিবৃতা হয়ে বসে আছেন।

আনন্দময়ী মা এমনই এক সাধিকা-যোগিনী, যিনি সামাজিক লোক-ব্যবহারাদি রক্ষা করেও অধ্যাত্মরাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্ম সকল পথ সেই একেরই সন্ধানে রত।

* * *

বারানসীধামের সূর্যালোকে স্পন্দিত শীতের সকালে সাধু মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে মা আনন্দময়ী বলছেন,—'কর্মজগতের খেলা একরকম, ভাবজগতের লীলা আর একরকম। কর্মজগৎ প্রকাশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ভাবজগতের খেলা নীরব ও অপ্রকাশ। তা না হলে ভাবের পুষ্টি হয় না। আর এই ভাবের পুষ্টি নিয়েই চলে কর্মজগৎ। গঙ্গার উৎপত্তি স্থান লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অরণ্যে অথচ তাঁর স্নেহধারা কত দেশকে শস্যশ্যামলা করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছে। ভাবই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূল। কিন্তু যতদিন আপনা থেকে কর্মবন্ধন ত্যাগ না হয় এবং কর্মের অপেক্ষা রাখা হয় ততদিন কর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা আবশ্যক। যার কর্মস্পৃহা আছে, কর্মব্যতিরেকে তার শ্রেয়োলাভ ঘটে না।' আবার বলছেন,—'ভগবান ও জীবের নিত্য বিরহ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। ভগবান সর্বদা জীবকে কোলে করবার জন্য প্রস্তুত আর জীব আপন কর্মচক্রে পড়ে তাঁর ভিতরে থেকেও অন্ধের মত তাঁকে দেখতে পায় না, খোঁজেও না। সাধন ভজনে অনুরাগী হলে দেখা যায়, এই বিরহ বা বিচ্ছেদই মিলনের সেতু এবং এই বিরহই আনন্দের উৎস খুলে দেয়। মিলনের আশা মিলনের চেয়েও সুখকর। এবং যতই শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়তে থাকে ততই এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ব্যাকুলতা প্রার্থনা ইত্যাদি পূর্ণতায় পৌঁছায়। বিরহ বা অভাববোধ নিতান্ত আবশ্যক। অভাবের তাড়নায় যেমন প্রবল বেগে কর্মসংগ্রাম আরম্ভ হয়, কর্তব্যবুদ্ধিতে তেমন হয় না। অভাব স্মরণে রেখে সদ্ভাবে তা পূরণের চেষ্টা করো। এইভাবে সদ্বৃত্তি যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর বিরহ তোমাকে

অন্যসব কর্ম থেকে বিরত করে তাঁর প্রতি শরণাগতি এনে দেবে।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন,—'আচ্ছা মা, তিনি ত সর্বত্রই রয়েছেন, তবে তাঁকে আবার ডাকতে হবে কেন?'

প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমা বলছেন,—'তিনি সর্বত্র এবং প্রত্যেক হৃদয়ে থাকলেও উপাসনা, সৎ-সঙ্গ, সাধনভজন ও তত্ত্বালোচনাদির দ্বারা চিত্তের মলিনতা বা অজ্ঞানতা দূর করে। তাঁর অনুভূতিরূপ কৃপালাভ করবার সামর্থ্য আনতে হয়। যেমন দেখনা বহু পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা ভূগর্ভে নিহিত রত্নাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

'তাঁকে ডাকবার জন্য তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগছে যদিও তুমি তা বুঝতে পারছো না। এই অবস্থায় তাঁকে ডাকবার জন্য মনকে জাগাতে হয়। ডাকো ত নিজেরই জন্যে। ত্রিতাপের জ্বালায় দিন দিন মরে বেঁচে জীব যখন অস্থির হয়ে পড়ে, তখনই তাঁকে ডাকে। সাধ করে ডাকে কয়জন? প্রথম প্রথম ডাকগুলি দুঃখেই অনেকের বের হয়। ডাকতে ডাকতে যখন এক আধটু সাড়া মিলে, তখনই ডাকতে আনন্দ লাগে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সংসার প্রবাহে চলতে চলতে তাঁকে ডাকবার চেষ্টা করো, তাহলে আর নিরানন্দের তাডনায় জীবন ভারবহ হবে না।

—'দুর্বলতাই মানুষের প্রধান পাপ। অকারণে দেহের শক্তি যাতে অপব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলো। দেহের খাদ্য পরিমিত আহার বিহার আর মনের খাদ্য শুদ্ধভাব ও ভগবৎ চিন্তা। দেহ ও মনের কলকারখানাগুলি ঠিকমত চললেই ইহাদের চালকরূপী আত্মার সন্ধান সহজ হয়।

'শহরে চব্বিশ ঘণ্টা জল সরবরাহ করতে গেলে যেমন দিন রাত জলের কল চালাতে হয়, তেমনি হৃদয়কে ভগবদরসে পূর্ণ রাখতে হলে অবিরাম স্মরণ আবশ্যক। তত্ত্ব বিচার জপ বা ধ্যান নিয়ে থাকতে পারো ত খুবই ভাল। যদি না পারো তবে কীর্তন পূজা যজ্ঞ পাঠ দেবদর্শন সাধুসঙ্গ তীর্থভ্রমণ ও অন্যান্য সদ্‌কার্যাদি নিয়ে সতত ঈশ্বরের চিন্তা মনের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করো। 'তাঁর আদেশ শিরে বহন করে সংসার করছি,' যদি এই শুদ্ধভাবটি অন্তরে আনতে পারো তবে ত আর কথাই নাই। যে দিবারাত্রি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম বা ভাব নিয়ে চলতে পারে তারই 'অবিরাম স্মরণ' হয় এবং তার বাইরের কর্মগুলি চাবি দেওয়া কলের পুতুলের হাত পা নাড়ার মত আপনা হতেই সহজেই নির্বাহ হয়।'

এইভাবে ভক্তবৃন্দরা কাশীর আশ্রমে সাবিত্রী মহাযজ্ঞকে উপলক্ষ্য করে

দিনের পর দিন শ্রীশ্রীমা'কে নিয়ে সৎসঙ্গ ও আনন্দ কীর্তনে রইলো মত্ত হয়ে।

সাবিত্রী যজ্ঞারম্ভ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা সোলন থেকে কাশীতে চলে এসেছেন। মহাধূমধামের সঙ্গে সুরু হয়েছে যজ্ঞ। কোটি আহুতির সঙ্কল্প করা হয়েছে। ভক্ত ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ও নেপালদা যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। (এই নেপালদাই পরবর্তীকালে আনন্দময়ী আশ্রমের নারায়ণস্বামীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।) সাবিত্রী মহাযজ্ঞের আচার্য হলেন শ্রীঅগ্নিশ্বাত্ত শাস্ত্রী (বাটুদা), যজমান নেপাল দা, ব্রহ্মা—ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত।

ধীরে ধীরে অপরাহ্নের আলো হয়ে আসে ম্লান। নেমে আসে সন্ধ্যা। আশ্রমের গৃহকোণ থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে আনন্দময়ী মা'র কণ্ঠনিস্বৃত সুস্বর মুখর দিব্যসঙ্গীত।

হরি বল্‌তে কেন নয়ন ঝরে না,
শুনেছি পুরাণে সাধু গুরু স্থানে,
হরি নামের নাইকো তুলনা॥

*　　*　　*

মুক্ত বিহঙ্গমের মতন মহাশূন্যে ছুটে চলে আলোকমত্ত এই সঙ্গীত ধারা। আচ্ছন্ন করে ফেলে বাতাসকে। গঙ্গার জলতরঙ্গে বাজে উন্মাদ নৃত্যের ছন্দ। সে ছন্দ যেন বিজয়ীর মত বিশ্বকে দেয় দোলা। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয় এক মধুরিমা। তাদের অন্তর ভরে ওঠে অবিস্মরণীয় এক মাধুরীতে। দুঃখ বেদনা—কোন ক্ষুদ্রতার কোন ভার আর নাই।···নাই··· নাই, কোথাও কিছু গ্লানি· আর পড়ে নাই। শুধু আছে আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই এ বিশ্বভুবনে। ওগো মহানন্দ! আনন্দ অপার!

গান শুনতে শুনতে ভক্তদের দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। আর স্তব্ধ হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য গঙ্গার জলকলরোল। এ কেমন গান! এ কি অদ্ভুত গান! ভক্তরা অভিভূত হয়ে ভাবে মনে মনে।

আবার একদিন কাশীর লীলা সাঙ্গ করে মা চলে এলেন এলাহাবাদে ত্রিবেণী তীরে। মাঘ মেলায়। অনেকেই কল্পবাস করছেন। এখানেও মায়ের উপস্থিতিতে বসে গেল আনন্দের হাট। সর্বত্রই যে তাঁর প্রসন্ন স্থিতি। শাশ্বতী স্থিতি। মা যে মঙ্গলময়ী করুণাময়ী আনন্দদায়িনী আনন্দময়ী মূর্তি।

নৌকা করে ভক্তবৃন্দসহ মা এলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে। জামা কাপড় সহই হঠাৎ মা স্নান করে উঠলেন। অপরূপ সে মূর্তি। শ্রীবৃন্দাবন বিলাসিনী

নীলাম্বরা নীলনলিনী নয়না যমুনায় স্নানরতা শ্রীশ্রীরাধারাণীর রূপই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মাধুর্যময়ী মূর্তি। অনির্বচনীয় শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে শ্রীশ্রীরাধারাণী যেন যমুনায় স্নান করে উঠলেন। অমিয় সৌভাগ্যবান ভক্তরা সে মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

১৫

গ্রীষ্মের নূতন দিন। বাতাস ছিল ক্লান্ত। ঈষদুষ্ণ আকাশ উজ্জ্বল। হঠাৎ আকাশের বুকে বাতাস বইলো। সঞ্চালিত হলো বরফের মত সাদা পুঞ্জীভূত মেঘগুলো। মেঘের দল গেল ভেসে। পাহাড়-উপত্যকা আলোকে আঁধারে হলো অভূতপূর্ব সুস্পষ্ট। ক্ষণিক আলো ক্ষণিক ছায়া। বিহগকুল অবিশ্রান্ত কলরব কূজন শুরু করে দিলো। পাহাড়ের উপর থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে এলো বুনো ফুলের মিশ্রিত গন্ধ।

গ্রীষ্মের এমনই এক সুন্দর দিনে আনন্দময়ী মা কিষণপুর আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে ধ্যানমগ্ন। এক তন্ময়ভাবে তিনি মগ্ন। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী কার মধুর স্পর্শে যেন এক অতি সুমধুর তালে উঠলো বেজে। তাঁর মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেলো। মনে হতে লাগলো জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ চৈতন্যময় আর সে আনন্দের আধার তিনি নিজে স্বয়ং। বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বত আকাশ বায়ু জলস্থল সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ। সে আনন্দের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। সীমাহীন আনন্দ। আনন্দ · আনন্দ·· আনন্দ। এইভাবে কতক্ষণ ছিলেন তাঁর বোধ ছিল না। কিন্তু যখন তাঁর চেতনা ফিরে এলো, ধ্যান ভঙ্গ হলো, তখন দেখলেন সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীজহরলাল নেহেরু, আর বল্লভভাই প্যাটেল। মৃদু হেসে শ্রীশ্রীমা ওঁদের বসতে বললেন। ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীজহরলাল নেহেরু তখনও মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রয়েছেন আনন্দময়ী মায়ের প্রতি। বিশ্বজননীর সেই ধ্যানমগ্ন অপার্থিব মূর্তি নয়ন গোচর করে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন। এ কি মানবী না দেবীমূর্তি ?

রাজরাজেশ্বরী নয়, নিরাভরণা এক সন্ন্যাসিনীর দুই প্রশান্ত চক্ষু তখনও

তাকিয়ে আছে তাঁরই মনের দিকে। ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ণধার শ্রীনেহেরুর মনের দিকে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে জহরলালের চোখের দৃষ্টি। মনে হয়, তাঁর বুকেরই ভিতরে অনেক দিনের নির্বাসিত এক বন্দী নিঃশ্বাসের বাতাস যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজেকে নিজেই শাসন করেন। দুর্বলতা নয়। ক্ষণিকের মোহগ্রস্ত মনের দুর্বলতাও নয়। হ্যাঁ ইনিই ছিলেন কমলা নেহেরুর জীবন দেবতা। প্রাণের ঠাকুর। ধ্যান জপ মন্ত্র। সবকিছু। কমলা অনেকবার এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলো। আজ প্রথম দর্শনেই মনে হচ্ছে সত্যই ইনি দেবী। সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক।

দুর্বলতা! কিন্তু সে দুর্বলতার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না জহরলাল। বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো তাঁর দুই চোখ। এ কোন রাজনীতিবিদের চোখ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন যোদ্ধারও চোখ নয়। ভাবুকের চোখ। Discovery of India'র লেখকের চোখ, দার্শনিকের চোখ। আনন্দময়ী মা'র মধ্য দিয়ে নূতন করে আবার আবিষ্কার করলেন ভারতকে, ভারতমাতাকে। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মের শেষ বাহককে। তার ঐশ্বর্য ও উদারতাকে। তপোবনের উপনিষৎ-রচয়িতা মহাকবিকে। বিশ্বব্যাপিনী শক্তিকে। ভারত আত্মাকে। Discovery of India'র হারিয়ে যাওয়া একখানি পাতাকে তিনি আবার খুঁজে পেলেন।

পরবর্তী জীবনে শ্রীজহরলাল নেহেরু শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। সর্বদাই তিনি মায়ের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়ে নানা কার্য্যে লিপ্ত থেকেও মায়ের খোঁজ খবর নিতেন। কালকাজী আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে বসে আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করে নিজেকে আরও সজীব ও প্রাণবন্ত মনে করতেন। মাঝে মাঝে কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকেও মায়ের খোঁজ খবর নিতে পাঠাতেন। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়েরও স্নেহধারা বর্ষিত হয় কন্যা ইন্দিরাগান্ধী ও শ্রীজহরলাল নেহেরুর প্রতি।

মা বলছেন: 'মনোরাজ্যের রাজা হতে পারলে বিশ্বের রাজত্ব আপনা হতেই হাতে আসবে। ধর্মের উপরেই জগতের সত্য প্রতিষ্ঠিত। ধর্মেই জগতের জীবন।'

'জগতে সবই ত ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ও ফল। যে দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা কোন সদিচ্ছার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তারই কর্ম চৈতন্য হয়। কমারাই দৈবশক্তির অধিকারী। এক বৃত্তির অনুসরণ করে সর্বদা ভগবৎ চিন্তায় অভ্যাস

আনা দরকার। সদ্‌বৃত্তির অনুসরণ করতে করতে সে অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়ে গেলে চিত্তপটে আর বিজাতীয় বৃত্তি এসে বিক্ষেপ জন্মাবে না। কর্তব্য কর্মে জড়তা ও অসাবধানতা আসলে উহা প্রতিরোধ করার অভ্যাসই একমাত্র উপায়। কেন না মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাস করতে সময় লাগলেও হতাশ না হয়ে দৃঢ়তা ও উৎসাহের দ্বারা নিজেকে সতত ধরে রাখা কর্তব্য। সরল ও শুদ্ধভাবের অভ্যাস আত্মজ্ঞানের প্রথম সোপান।

শক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে। সময়ে তোমার ভেতর হতেই দেখা দেবে। শক্তি দাও, শক্তি দাও' বলে চেঁচালে শক্তিলাভ হয় না। যাদের কর্তব্য বুদ্ধি ও দৃঢ় সঙ্কল্প নেই· তারাই অন্যের নিকট শক্তি খুঁজে বেড়ায়। দেখ না, হাসপাতালে রোগীদের আনন্দ ও আরাম দেবার জন্য কত রকম সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা হলেও ভিতরের রোগের জ্বালা বাইরের ব্যবস্থায় কি কখনো দূর হতে পারে? ভিতরের ব্যবস্থা চাই। ইহা প্রত্যেকের নিজের কর্ম ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে সাধনা করলে শক্তি আপনিই উদয় হবে।

অন্তরের জ্বলদগ্নি প্রকাশ করে জীবন ও জগৎকে আলোকিত কর। ইহাই পরম পুরুষার্থ।'

* * *

অকস্মাৎ লীলাময়ী মা চলে এলেন কসৌলীতে। কসৌলীর ভক্তবৃন্দের আহ্বানে। শত শত নরনারী শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে মাকে অভ্যর্থনা জানালো। অবশেষে মা'কে রিকশায় বসিয়ে ফুলমালায় বিভূষিত করে ভক্তবৃন্দ নিজেরাই রিকশা টেনে প্রায় আধমাইল দূরে এক মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানেই দেবীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পুজা আরতি ও ভোগ হলো। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো কসৌলীর শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী স্ত্রী পুরুষ সকলেই। অভাবনীয় সে দৃশ্য। মায়ের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব বর্ণনাতীত। সরল ধর্মপ্রাণ কসৌলীর মানুষ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'কে জীবন্ত ভগবতীরূপে পুজা করে ধন্য হলেন।

আবার একদিন মা কসৌলীর সদ্য গড়ে ওঠা আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চিরদিনের লীলাপথে।

কানপুরের গঙ্গাতীরে একদিন অবস্থান করে লক্ষ্ণৌ নৈমিষারণ্য হয়ে মা আবার চলে এলেন বারানসী ধামে। কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমে তখন নামযজ্ঞ চলছে। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজা এসেছেন।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন করছেন। অপূর্ব মধুর সুরতান সমন্বিত সে সঙ্গীত। কি প্রাচুর্য, কি শক্তি! কি আনন্দ! নামকীর্তন শুনতে শুনতে আনন্দময়ী মা'ও ভাবস্থ হলেন। এইভাবে মা আনন্দময়ী ঝুলন জন্মাষ্টমী উৎসবে মেতে রইলেন কাশীধামে।

কাশী থেকে এলেন বিন্ধ্যাচলে। লোকালয় থেকে দূরে এক শান্ত পরিবেশের মধ্যে মা অবস্থান করতে লাগলেন। এক প্রশান্ত সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা বিন্ধ্যাচল আশ্রমের দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে বসে আছেন। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন মা হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছেন। আবার মা'ও তাঁর বধূ জীবনের নানা ইতিবৃত্ত কাব্যায়িত করে বলছেন। কথা প্রসঙ্গে সাপের গল্প উঠলো। রায়পুরে পরমানন্দ স্বামীজীকে যে সাপে কামড়াতে এসেছিলো সেই কাহিনী ভক্তরা শুনতে চাইলেন মা বলতে লাগলেন। আনন্দময়ী মা'র ভাষায়: সেবার যখন রায়পুরে উঠিতেছি তখনই মুখ হইতে বাহির হইল 'মৃত দেহ'। তারপর সেই পুরানো ঘরটিতেই থাকা হইল। এ শরীরটা এক কোঠায়, পরের কোঠাতে পরমানন্দ ও শিশির রাহা (শ্রীশ্রীশিশির ব্রহ্মচারী)। তার পরের একটি ছোট কোঠায় ভাঁড়ার ছিল। একদিন ছাদের মধ্যে একটা সাপ দেখা গেল। ঐখানকার একজন বলিল, এ শরীরটা রায়পুর আসিবার পূর্বেই একটা সাপ ঐ ঘরে ঢুকিয়াছে। প্রায় এক মাস যাবৎ এ শরীরটায় সঙ্গে ওরা আছে। মাঝে মাঝে সাপটাকে ছাদ হইতে ঝুলিয়া পড়িতে দেখা যায়। পরমানন্দ যে ঘরে থাকিত সেই ঘরেই সাপটা ছাদ হইতে ঝুলিয়া পড়িত। আবার উঠিয়া যাইত। কয়েকদিন যাবৎ এ শরীরটা কিষণপুরে যাওয়ার কথা উহাদিগকে বলিতেছিল। কেন না উহাদের ঘরেই সাপ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহারা কিষণপুরে যাইতে চায় না।

একদিন সাপটার মধ্যে একটা অস্থির ভাব দেখা গেল একবার সে এদিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিয়া গিয়া অন্য দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া পরমানন্দ সাপটা আবার বাহির হইতেই উহাকে শাবল দিয়া একটা খোঁচা দিল। সাপটার বিশেষ কিছু হইল না। উহা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। তখনই বলা হইল সাপটা আঘাত পাইল, ঠিক হইল না। রাত্রিতে সকলে শুইয়া আছে এ শরীরটার ঘুম আসিল না, কেমন যেন খেয়াল হইল সাপটা আজ নামিবে। এবং একটা কিছু হইবে। তারপর আবার খেয়াল হইল যে সাপটা যেন পরমানন্দের পায়ের বুড়া আঙ্গুলে কাটিল। আবার খেয়ালে আসিল কিছু হইবে না। তখন শুইয়া পড়া হইল।

এদিকে পরমানন্দের ঘুমের মধ্যে মনে হইল যে তাহার পায়ের বুড়া আঙুলে সাপটা কামড়াইয়া দিয়াছে। তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এবং উঠিয়া বসিয়া আঙুল পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে কিছু হয় নাই, তখন সে আবার শুইয়া পড়িল। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাহার আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছিল যে সাপটা যেন আবার আসিতেছে। চাহিয়া দেখে সত্যি সাপটা উপর হইতে নীচে পড়িয়াছে। পরমানন্দ মনে করিল যদি সাপটা অন্যদিকে চলিয়া যায় তবে আর কিছু বলিবে না। কিন্তু সাপটা ওর দিকেই আসিতে লাগিল। তখন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া শাবল দিয়া সাপটার মাথায় আঘাত করিল। ঐ আঘাতেই সাপটা মরিয়া গেল। পরমানন্দ শুইবার সময় একটা শাবল লইয়া শুইত। অভয় এ শরীরের ঘরের দরজায় ছিল। সে জাগিয়া উঠিল। কথা হইল কি জান? ঐ যে মৃত দেহ দেখা হইয়াছিল—হয় ওর (স্বামী পরমানন্দ) শরীরই সর্পাঘাতে মৃত হইয়া যাইত, তাহা না হইয়া সাপের দেহটাই মৃত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

এই রোমাঞ্চকর নাটকীয় কাহিনী শুনে ভক্তরাও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। কিছু সময় সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন, লীলাময়ী মায়ের লীলার কথা চিন্তা করে। মা যে কখন কাকে কিভাবে রক্ষা করেন তা মা-ই জানেন। মা যে করুণাময়ী! করুণাসিন্ধু!

হঠাৎ মির্জাপুর থেকে ভক্তরা হারমনিয়াম সহ এসে উপস্থিত হলেন। মহানন্দে শুরু হোল কৃষ্ণকীর্তন। ভক্তরা মেতে রইলেন আনন্দ কীর্তনে। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই। ভক্তদের সম্মুখে মা এক এক সময় এক এক ভাবে হতে লাগলেন প্রতিভাত। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এলো। মহানিশায় মা ধীরে ধীরে উঠে এসে ষষ্ঠীতলায় ধ্যানে বসলেন। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে মা ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হলেন। কয়েকজন ভক্তও মায়ের সঙ্গে এসে মায়ের নিকটে বসে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন অলৌকিক কিছু দর্শনের আশায়। অলৌকিক কিছু দর্শন না হলেও, ভক্তরা মায়ের নিকটস্থ হয়ে অনুভব করলেন বিচিত্র এক স্পন্দন। সমস্ত দেহে, মনে আত্মায়। অপ্রাকৃত এক আনন্দের বন্যা সমগ্র অন্তরকে করে তুললো আলোড়িত।... আনন্দ... আনন্দ...আনন্দ, ওগো মহানন্দ আনন্দ অপার! পরমানন্দের আভাষ উপলব্ধি করলেন তাঁরা মনে মনে। বিচিত্র সে শক্তি! বিচিত্র সে আনন্দ!

পর দিবস শ্রীশ্রীমা ভক্তদের মনোগত ইচ্ছা অলৌকিক দর্শনের কথা শুনে বলেছিলেন,—'লৌকিক অলৌকিকের কোন প্রশ্ন নাই। সৎপথে থেকে সৎকাজ করবার চেষ্টা করা। যদি এই পথে কোন মহাত্মার সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ ঘটে তবে বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করে তাঁর কৃপা ও আনুকূল্যে সৎ কর্মের চেষ্টা করা আবশ্যক। ভগবানকে সর্বদা সম্মুখে রেখে সাধু মহাজনদের উপদেশাদি অনুসরণ করে কর্ম করলেই, কর্মে সফলতা আসে। সবকিছু লাভ হয়। জীবনেও সার্থকতা আসে।'

অবশেষে শুরু হোল নাম-যজ্ঞ। আনন্দ কীর্তন। মা যখন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই বসে যায় আনন্দের হাট। ইতিমধ্যে ভক্তরা কালীখোা দর্শন করে এলেন। কালীমূর্তি হাঁ করে আছেন। দর্শন করলে মুখে কিছু দিতে হয় তাই নাম হয়েছে 'কালীখোা'। এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবীমূর্তি। ঢাকায় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'কেও ভক্তরা বলতেন 'কালীখোা', 'মানুষ কালী'।

মা আবার ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন: 'সংসারের জন্য যেমন কাঁদছো তার চেয়ে ঢের বেশী কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে যখন বাহির ও অন্তর এক হয়ে যাবে, তখন দেখবে যাঁকে একদিন এমন করে খুঁজছিলে, তিনি সকলের প্রাণরূপে অতি-নিকটেই বিরাজিত রয়েছেন।'

১৮

এলাহাবাদের ত্রিবেণী।

গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী তিন পুণ্যসলিলার মুক্ত বেণী যেখানে আবার ত্রিধারায় মুক্ত হয়ে গিয়েছে সেই স্থানের নামই ত্রিবেণী। কবিরা যাকে বলেন মুক্তবেণী। ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তা। পুণ্যকামী শত শত স্নানার্থীর কোলাহল জাগে প্রতিদিন এই ত্রিবেণীরই ঘাটে। যুগ যুগ ধরে সাধক ও পুণ্যার্থী ভালবেসে এসেছে এই ত্রিবেণীর স্বচ্ছ রৌদ্রালোক আর গঙ্গাবারিকে। শত শত সাধকের পদরেণু মিশ্রিত বালুকাসৈকত কয়েক সহস্র বছর ধরে এই মুক্তবেণীর কলরোল শুনছে। সেই বালুকাসৈকতে মা

আনন্দময়ী আজ আবার এসেছেন। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে। অনেকগুলি তাঁবু পড়েছে। অনেক সাধুসন্ত অনেক ভক্তের দল মাকে নিয়ে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে আছেন। এইভাবে দিনের পর দিন মা ভক্তসনে লীলা করে চলেছেন। কখনও আবার সাধুসন্ত ও ভক্তের দল মাকে ঘিরে বসে বেদ ভাগবত ও চণ্ডী পাঠ করলেন।

শ্রীশ্রীহরিবাবা, শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, শ্রীশ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুর, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, গুরুপ্রিয়া দেবী, ভক্তপ্রবর পান্নালালজী, যোগী শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীরা রয়েছেন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। মায়ের উপস্থিতিতে সকলেই যেন আনন্দসাগরে অবগাহন করে পরমানন্দ উপভোগ করছেন মনে মনে। মধ্যরাত্রির ত্রিবেণী তীর, নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক, শুধু কানে ভেসে আসে জলরোলের শব্দ। শান্ত সমাহিত ধ্যানমৌন অনির্বচনীয় এক পরিবেশ।

সে রাত্রিরও আবার হোল অবসান। প্রভাতসূর্যের লাল আলো নৃত্য করতে শুরু করে দিলো ত্রিবেণীরই বুকে।

মা আজ ধ্যানগম্ভীর, ভিন্ন এক মূর্তিতে হলেন প্রতিভাত ভক্তজনের সম্মুখে। সমস্ত দিনই এক তন্ময় ভাবে মগ্ন রইলেন। অনন্তের পথে··· অসীমের চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ মা কেন এমন হলেন, মা-ই জানেন মায়ের লীলারহস্য।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী শিষ্যবর্গসহ মেতে রইলেন কীর্তনানন্দে। কৃষ্ণ-কীর্তন। আনন্দকীর্তন। পুণ্যতোয়া ত্রিবেণীর বালুকাসৈকতে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর সুমিষ্ট কণ্ঠের ভাবপূর্ণ কীর্তন অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি করলো। শ্রীশ্রীমা তখনও ধ্যানস্থ। ধীরে ধীরে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। মা তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

হঠাৎ কি এক দুঃসংবাদে মুখর হয়ে উঠলো ভক্তবৃন্দের তাঁবু। মহাত্মা গান্ধী দেহত্যাগ করেছেন। নাথুরাম গডসের গুলিতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। মৃত্যুসময় রামনাম উচ্চারণ করতে করতেই দেহলীলাসংবরণ করেছেন। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা। সাধুসন্ত ভক্তের দল ছুটে এলেন মায়ের কাছে এই দুঃসংবাদ নিয়ে। স্বামী পরমানন্দ শ্রীশ্রীমাকে এই সংবাদ পরিবেশন করলেন। শ্রীশ্রীমা'র ধ্যানভঙ্গ হোল। ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন,—'যিশু

খৃষ্টের মত।' আবার বলছেন,—দেখ, শ্রীকৃষ্ণ যে দেহরক্ষা করলেন হিংসাকেও শ্রীচরণে স্থান দিয়ে দেহ ছাড়লেন। যিশুখৃষ্ট হিংসাকেও সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন করে দেহ ছাড়লেন। হিংসাকেও হিংসা করলেন না। গান্ধীজীও হিংসা-বৃত্তিকে অহিংসাবৃত্তি দ্বারা জয় করলেন। শান্তভাবে রামনাম করতে করতে হাত জোড় করে পড়ে গেলেন।' কথা শেষে মা আবার ভাবস্থ হলেন। ভাব-সমাধি। প্রভাত সূর্যের রঙীন আলোয় তখন ত্রিবেণীর আকাশ রক্তাভ। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। আনন্দময়ী মা'র ছোট্ট তাঁবু হতে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে মাতৃকণ্ঠের দিব্যসঙ্গীত :—

গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল
নন্দ দুলাল প্রেম গোপাল ॥

* * *

ত্রিবেণীর বালুকাসৈকত আবার মেতে উঠলো নামগানে : কৃষ্ণকীর্তনে। গান্ধীজীর মৃত্যু উপলক্ষে মা সমস্ত দিন উপবাসী রইলেন। সাধুদের ভাণ্ডারা হলো। সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জীবন-বেদ নিয়ে আলোচনা হলো। শ্রীশ্রীমাও আলোচনায় যোগদান করলেন। অবশেষে শুরু হোল ভাগবত পাঠ। ত্রিস্রোতা গঙ্গার জলকলরোলের সাথে ভাগবত পাঠকের সংস্কৃত শ্লোকের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ মিলিত হয়ে অপূর্ব মধুর শোনাতে লাগলো।

এই বিষাদ-মধুর দিনগুলিরও অবসান হলো। মা হঠাৎ একদিন ত্রিবেণীর আনন্দের হাটকে পিছনে ফেলে দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন।

পথে মা বলছেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে। আনন্দময়ী মা'র ভাষায় : 'আজকাল কি রকম যেন হইয়া যাইতেছে। শরীরটাও যেন কি রকম। দেখিয়া শুনিয়া রাখিবার হইলে রাখিস্। চলাফেরাও কিন্তু কি রকম হইয়া যাইতেছে। আর কথা বলিতে বলিতে বন্দ হইয়া যাইতেছে। কোনটার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতেছি না। দেখিতেছি অনেকেরই নাম মনে থাকিতেছে না—অথচ ইহারা পুরানো লোক। হয়তো এক সময় বলিয়া বসিব,—তোর নাম কি ? এই রকমই হইয়া যাইতেছে।'

শ্রীশ্রীমায়ের গুরুগম্ভীর ভাব দেখে গুরুপ্রিয়া দেবী নীরব রইলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ দিল্লীতে এসে পৌছলেন। কিছুদিন ভক্তসনে লীলা করে, মা চলে এলেন বাঁধে। হরিবাবার আশ্রমে। শ্রীশ্রীহরিবাবার একান্ত অনুরোধে। শ্রীশ্রীউড়িয়া বাবাকেও বৃন্দাবন থেকে মোটর গাড়ী করে নিয়ে এলেন। উড়িয়াবাবা সর্বদাই পদব্রজে যাতায়াত করেন। গাড়ী চড়া

তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। মা তাঁর সে নিয়ম ভঙ্গ করলেন। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীউড়িয়াবাবা আনন্দময়ী মা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—'মাইয়াকে আমি এতদিন বুঝিতে পারি নাই। আমার কাছে আসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাইয়ার ত্যাগের ভাব। এবং সর্বাবস্থায় সর্বদাই প্রসন্নতা বিরাজ করছে। ইহা দেখিয়া আমার বড ভাল লাগিয়াছে। মাইয়ার কাছে এখন আর আমার কোন সঙ্কোচ নাই। মাইয়ার কাছ থেকেই আমি শক্তি পাই। সর্বদাই আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁকে নিবেদন করে থাকি।'

শ্রীশ্রীমার আগমনে বাঁধ আবার ভগবৎ ভাবের উন্মাদনায় মেতে উঠলো। নামযজ্ঞ। কৃষ্ণকীর্তন। আর সৎসঙ্গ অবিরাম চলতে লাগলো। মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন। সর্বদাই যেন কৃষ্ণসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। কখনও কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল আবার কখনও মধুর কণ্ঠে মৃদুস্বরে কৃষ্ণগুণগান করছেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা, শ্রীশ্রীউড়িয়া বাবা, স্বামী শরণানন্দ চক্রপাণিজী, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দও শ্রীশ্রীমায়ের নয়নমনহরা এই ভাব দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হচ্ছেন।

ভাবে গদ গদ হয়ে মৃদু হেসে মা আবার কথা বলছেন। অপূর্ব কথামৃত নিঃসৃত হচ্ছে মায়ের কণ্ঠ হতে। মা বলছেন, 'ভগবানের এক নাম চিন্তামণি! তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা থাকে না। এবং তাঁর ভাবে জীব অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। অর্থকামীর অর্থচিন্তা বা পুত্রকামীর পুত্রচিন্তার মত তাঁর চিন্তাও খুব তীব্র হওয়া দরকার। জীবনযাত্রার সকল চিন্তার ভিতর তাঁকে সর্বাগ্রে রেখে চলতে চলতে তাঁর প্রতি লক্ষ্য আসে। এরূপে যদি তাঁকে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে বসানো যেতে পারে, তিনি সকল ভার নিয়ে সেবককে কেবল তাঁর চিন্তার জন্য মুক্ত করে রাখেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর ভিতর, ভোগী সংসারীর মধ্যে, এমন কি পশুপক্ষীতেও এরূপ কত উদাহরণ দেখতে পাবে। উদ্ভিদেরা পর্যন্তও তাঁর এই কৃপার অধিকারী। ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে দড়ি ধরে তাঁর শরণে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে বসে থাকো। বাতাস তাকে আপনার গতিতে চালিয়ে নেবে।'

মা আবার বলছেন,—'বসে বসে অন্ধকারে কেবল হাতড়াচ্ছো। আলোর সন্ধান করো। আলোর সন্ধান করো। কেরোসিনের ল্যাম্পে বা বিদ্যুতের বাতিতে কতদিন আর আলো করে রাখতে পারবে? তেল ফুরিয়ে গেলে বা

সুইচ খারাপ হয়ে গেলে বাতি নিবে যাবেই যাবে। এমন আলো দিয়ে সংসারটিকে আলোকিত কর যেটি আর কখনও নিব্‌বে না। সে আলো কি জানো? ভগবৎ নিষ্ঠা। ভগবৎ প্রেম।'

১৮

—'ছাদের বাগানটির দূর প্রান্তে মাতাজী ধীর পদক্ষেপে আসা যাওয়া করছিলেন। সময় সময় দাঁড়িয়ে তিনি তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে। বৈকালিক মেঘমালা প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁর চোখে। আমার মধ্যে যে ভাবোদয় হচ্ছিল তখন, যুক্তিবদ্ধ চিন্তার সীমার বাইরে তা। মেঘপুঞ্জ, বনরাজি, হিমালয়ের পর্বত-প্রবাহ, সবই সেই দৃষ্টির অতলে তলিয়ে গেছে, যেন ঐটিই তাদের আপন আবাস। বৃষ্টি জলের কাদা গোলায়, চন্দ্রের প্রতিফলনকে ছোট্ট আর অস্পষ্ট দেখায়। মায়ের চোখ আকাশের ছবিকে ধরছিল বুকে, সমুদ্র যেমন বুকে ধরে সেই প্রতিবিম্বকে, ধরে ভগিনীর মত। একই সৃষ্টি উৎস থেকে যে উৎসারিত তারা।

মাতাজীকে দেখার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সবচেয়ে অভিভূত আর হতবুদ্ধি হয়েছিলাম আমি এজন্য যে, আমার বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে—'মা আনন্দময়ীরূপ' একটি তথ্যকে কোথায় খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। একটা বৃক্ষকে যদি পায়ে হেঁটে এগোতে দেখি, তাকে যেমন আমরা খাপ খাওয়াতে পারবো না আমাদের ধারণার সঙ্গে। ভয় হবে বুঝি সমস্ত অভ্যস্ত নিয়মকে সে গুঁড়িয়ে দেবে ফুৎকারে—ঠিক তেমনি হয়েছিল আমার।

আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন 'আমি' বিহীনা মানবী। মাতা গঙ্গা বা পিতা হিমালয় যেমন। তাঁর দিকে তাকালেই মনে হয় সৎ বা অসতের অতীতে অবস্থান করেন তিনি।'

বলছেন জার্মান ঔপন্যাসিক Melita Maschmann, মেলিট ম্যাসমান। কংখলে (হরিদ্বার) আনন্দময়ী মা'কে প্রথম দর্শন করে। পরবর্তীকালে তিনি মায়ের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও রচনা করেন জার্মান ভাষায়।

* * *

শ্রীশ্রীমা আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছেন কাশীর আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে। মিস ব্ল্যাঙ্কা (মায়ের পুরানো ভক্ত) মায়ের পদতলে বসে একখানি পত্র পড়ে শোনাচ্ছেন।

পত্রখানি মিস ব্ল্যাঙ্কার কাছেই লেখা হয়েছে। লিখেছেন মিঃ হেনরী পেতিত। তিনি জাতিতে ফরাসী। আদ্দিস আবাবাতে মন্ত্রীবিভাগে কাজ করেন। ইনি প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন কাশীতেই। মায়ের সঙ্গে কথা বলবারও সুযোগ পেয়েছিলেন।

পত্রখানির বাংলা মর্ম্মার্থ হলো: 'মাত্র দুই সপ্তাহ হয় আমি আদ্দিস আবাবাতে এসে পৌছেছি। তোমাকে না বলে থাকতে পারছি না যে কাশী হতে বেশী দূরে থাকা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেদিন আমি মাকে প্রথম দেখি সেই দিনই আমার মধ্যে সব কিছু যেন উলটপালট হয়ে গিয়েছে এবং ঐ ভাব এখনও চলছে। পণ্ডিচেরী এবং জিবুতিতে আমার মধ্যে যে নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল মা হতে বিচ্ছিন্ন হবার পর হতেই উহা যেন ভীষণ ভাবে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমি আমার সমস্ত কামনা বাসনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ফেলেছি। যাতে নিজেকে মায়ের হাতের যন্ত্র করে তুলতে পারি, তাই হলো এখন আমার একমাত্র কাম্য।

মায়ের এই প্রভাব যা বিচ্ছেদ ও দূরত্ব হেতু ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে তা আমার পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছে। কেন না উহার জন্য আমি নিজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আমার সারা-জীবনের ধারণা যেন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আমি ধনবান নই, তাই বলে নিঃস্বও নই। কিন্তু আমার মনের এই অবস্থা যদি স্থায়ী হয় তাহলে মায়ের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তার ক্ষীণ নিদর্শনস্বরূপ এবং মায়ের চরণতলে বাস করবার একমাত্র আকাঙ্ক্ষায় আমি যে সরকারের উচ্চতম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছি তা সানন্দে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।

অনেকের কাছে এটা হাস্যকর এবং বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একথা আমার গোপন করা উচিত নয় যে, যতই আমি মায়ের বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় আমি শিশুর মত ক্রন্দন করে উঠি। মা'কে মনে মনে জিজ্ঞাসা না করে আমি কোন কাজে হস্তক্ষেপ করি না।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে শুধু তাঁর প্রদত্ত একটি শুষ্ক ফুলের মালা স্মৃতি-চিহ্নরূপে সঙ্গে নিয়ে বিগত ১৯৪৮ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে আমি যে

ভাবে কাশী থেকে চলে এসেছি তা মনে হলে আমার গভীর অনুশোচনা হয়।'

শ্রীশ্রীমা পত্রের বাংলা মর্মার্থ শুনে কিছুই বললেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। ভক্তরা বিস্মিত হলেন। মায়ের এই আকর্ষণ শক্তি যে কত তীব্র তা লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার পান্নালাল মাকে একবার জিগগেস করেছিলেন,—আচ্ছা মা তোমার প্রতি লোকের এই আকর্ষণ কেন?

শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে মা বললেন,—'ও, তা বুঝি জান না? নিজের হাত পা মাথা চোখ এসবের প্রতি কি আকর্ষণ না হয়ে পারে? আর এ শরীরটা যে সকলেরই ছোট্ট মেয়ে। ছোট্ট মেয়েকে কে না ভালবাসে?'

পরমুহূর্তেই মা মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলেন। মধুর মায়ের মধুর সে হাসি। ভক্তপ্রবর ডাঃ পান্নালালের মনে তখন অনাবিল আনন্দ প্রবাহ, আর প্রশ্ন উত্থিত হল না। মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মা বলেন,—'কে আবার কোথায় চলে যায়? বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা এখনও তা।'

* * *

দেরাদুনের রায়পুর আশ্রম।

শ্রীশ্রীমা আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছেন। রাত্রি গভীর হয়ে আসে। চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। মৃদু বাতাস বৃক্ষপত্রকে আলোড়িত করে বয়ে চলেছে।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আশ্রমের গৃহকোণ থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে বিখ্যাত গায়ক ওঁকারনাথজীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ধীর সুগম্ভীর স্বরের সঙ্গীত। সঙ্গীত নয়, সুমিষ্ট স্বরধ্বনি।—মাধো—মাধো—মাধো। এই নামটি তিনি নানা সুরে গেয়ে শোনাচ্ছেন মা আনন্দময়ীকে। কি সে সুর! কি ভাব! অপরূপ ধ্বনি-সঙ্গীত। গভীর রাত্রির বাতাসে সে শব্দের অনুরণন জেগে ওঠে। মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মত শ্রোতাদের অন্তরকে যেন স্নিগ্ধ ধারায় করে দেয় অভিষিক্ত। সহসা রাত্রি যেন আলোকময়ী হয়ে ওঠে। বাতাস মধুরতায় আর্দ্র হয়ে যায়। শ্রোতৃবৃন্দের মন থেকে পালিয়ে যায় জাগতিক চিন্তাধারা। ফুলের মত হেসে ওঠে অন্তর। সকলেই মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। সুরের লহরী বয়ে নিয়ে চলে পবিত্র একটি নামকে মাধো···মাধো···মাধো।

পর্য্যায়ক্রমে তিনটি ঘণ্টা মৃদু মধুর সুরে ঘোষণা করে চলে মাধবের নাম! মাধো—মাধো—মাধো। মাধবের আরাধনা। মাধবকে যেন বলছে,—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥

এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিক্রান্ত হলো। কেউ ক্লান্তিবোধ করলেন না। মধুর রসের মহাসমুদ্রে অবগাহন করে সকলেই তৃপ্ত হলেন।

মা আনন্দময়ী মাধবের বিরহে শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধিকার মূর্তি ধারণ করলেন। ভাবময়ী মায়ের সে ভাবও ছিল অতি মধুর। ওঁকারনাথজী ও ভক্তবৃন্দ মায়ের সেই বিরহিনী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। সঙ্গীত শেষে মা বললেন,—'মাধো মাধো নাম কত স্বাদিষ্ট। এত মধুর নামকে গান রস রূপে যেন সকলের মধ্যে একেবারে বিলিয়ে দিলেন।'

ওঁকারনাথজীও অশ্রুসিক্ত নয়নে ভাবে গদগদ হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

দুপুর গেলো, বিকাল গেলো, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে বলছেন,—'তোমরা যে আনন্দময়ের সন্তান। নিরানন্দে থাকবে কেন? বড় মানুষের ছেলে কি কোনোদিন গরীব বলে নিজের পরিচয় দিতে চায়? এমন কি তার পৈতৃক বিষয়-বিত্ত নষ্ট হলেও সে বড় ঘরের ছেলে মনে করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকে। আর তোমাদের সবকিছু অক্ষুণ্ণ থাকতে ফকির হয়ে দিনপাত করছো। শরীরের মেরুদণ্ড সোজা না রাখলে কি কোন কাজ হয়? ভয় উদ্বেগ হতাশা প্রভৃতিকে সব সময় দূরে সরিয়ে দেবে। যেখানে আনন্দ উৎসাহ উদ্যম সেখানেই মহাশক্তি বর্তমান। মানুষের শুভ চেষ্টার অন্তস্থলে ঈশ্বরকে দর্শন করতে শেখা। তাহলে স্থূল কর্মতত্ত্বের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে অগ্রসর হয়ে হয়ে পরমানন্দ লাভ করতে পারবে!

যার মনের হুঁশ বা আত্মচিন্তা আছে তাকেই বলে মানুষ। মানুষ না হলে অতিমানব হওয়া যায় না। সমাজ ও নীতির অনুশাসনে চলতে চলতে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয়। তারপর পরমার্থিক ভাবাদি এসে যখন মানুষকে ভাবিত করে তখন সে মোহের সীমা অতিক্রম করে অতিমানুষ হয়ে পড়ে। মানুষ করে অভাব পূরণের চেষ্টা। আর অতিমানুষ করে স্বভাবের প্রতিষ্ঠা। মানুষের কর্ম মানুষকে অভাব থেকে স্ব-ভাবে জাগ্রত করে। আর অতিমানুষের কর্ম তাকে স্ব-ভাবে ত্যাগে ও প্রেমে পূর্ণ করে। তাইতো এ শরীরটা বলে সর্বাগ্রে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো।

সর্বদা জলের স্রোতের মত একমুখী ও তরল হয়ে থাকতে পারলে কোন ময়লা তোমার ভিতরে আটকাবে না। পরের ময়লাও তোমার সংসর্গে এসে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগুন দাউ দাউ করে শিখা নিয়ে অনেক উপরে উঠে বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সেখানে শিখা আপনার স্বরূপ বা অহঙ্কার বজায় রাখতে না পেরে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। কিন্তু জলের অবিরাম গতি এমন একটানা থাকে যে নদনদীগুলি কত গাছ পাথর ঠেলে হাজার হাজার ক্রোশ অবিরোধে অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। পরমতত্ত্বের সন্ধান বা সম্মিলন লাভ করতে চাইলে নদীর মত তরল ও একলক্ষ্যে চলতে থাকা।'

ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করতে লাগলেন মায়ের মুখনিসৃত অমৃতময় বাণী। এইভাবে কিছুদিন ধরে মা লীলা করে চললেন ডেরাডুনের রায়পুর আশ্রমে।

অবশেষে একদিন ভক্তদের চিরবাঞ্ছিত চিরস্মরণীয় দিনটি এসে পড়লো। অনির্বচনীয় আনন্দের অমৃতভাণ্ডার হাতে নিয়ে। জন্মদিবসের সেই দিনটি। ১৯শে বৈশাখ। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র জন্মোৎসব। কিষণপুর আশ্রমে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তের দল এসে মিলিত হলেন। হিমালয় থেকে এলেন সাধুসন্তের দল। পাঞ্জাবের খান্না থেকে এসেছেন শ্রীত্রিবেণীপুরীজী। খুব উচ্চাবস্থার যোগী পুরুষ। শিশুর মত সরল। পরমহংস ভাব। কিন্তু মা আনন্দময়ীর নামে পাগল। সেবক চেতনপুরীজী বলছেন,—'মহারাজজী ফল ইত্যাদ খেতে চান না। কিন্তু যদি বলা হয় যে মাতাজী আপনাকে এই ফল পাঠিয়েছেন। তবে আর দ্বিরুক্তি না করে খেয়ে ফেলেন। কোথাও হয়তো যাওয়ার ইচ্ছা নাই, কিন্তু যেইমাত্র শুনলেন যে মাতাজী তাঁকে যেতে বলেছেন, অমনি বৃদ্ধ মহারাজজী উঠে রওনা দিলেন।'

ত্রিবেণীপুরীজী আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে বলছেন, 'মাকে কেহই চিনতে পারে নাই। মায়ের কোন সঙ্কল্প বিকল্প নাই। তোমরা এখনও মাকে অবতার জ্ঞানে অবতারদের মধ্যে দেখিতেছ। মা আরও উচ্চে—আরও অনেক আগে।'

শ্রীশ্রীহরিবাবা, কৃষ্ণানন্দজী, চক্রপাণিজী, রামদেবানন্দজী, স্বামী শরণানন্দ, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী, উত্তরকাশীর দেবীগিরি মহারাজ ও স্বামী শঙ্করানন্দজীও এসেছেন।

ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করছেন কুসুম ব্রহ্মচারী। ফুলের সাজে সজ্জিত হয়ে মা অপরূপ এক দেবীমূর্তিতে প্রতিভাত হলেন ভক্তবৃন্দের

সম্মুখে। অনুপম তাঁর রূপ, স্নেহসিক্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি। ধূপে দীপে গন্ধে পুষ্পে পূজিত হলেন জগজ্জননী। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলো। মা আনন্দময়ী হাত জোড করে চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। শুদ্ধাত্মা সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের এই অনির্বচনীয় রূপ যতই দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন। মা যেন স্বপাত্রুদে ডুব দিয়ে রয়েছেন।

মা বলেন,—'সেই অমৃতময় ঈশ্বরের ধ্যানেই সর্বদা প্রাণ মন পূর্ণ করে রাখা। তাঁকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সব অপ্রয়োজন। তাঁকে বিনা মানুষের চলে না। তাঁকে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ হয় না।

ভেসে থাকা পর্য্যন্তই সাম্প্রদায়িক ও লৌকিক ভেদাভেদ। যে কোন উপায়ে ডুব দিতে পারলেই দেখা যায় পরমতত্ত্ব মাত্রই এক। সত্য ভাবও এক। সবকিছুই সেই একেরই প্রকাশ।

৫৭

'ডাকতে চাই ভাবতে পারি না।'—একথা বললেই কি হলো? বাডিতে সামান্য যদি অসুখ বিসুখ করে, সময়ে অসময়ে ডাক্তার কবিরাজের কাছে কত ছুটাছুটি কর। সংসারের কোন কাজে যদি সামান্য ওলটপালট হয় অমনি শৃঙ্খলার কত বিধি-বিধান করো, আর যেই ঈশ্বর-চিন্তার পালা আসলো তখন 'পারি না' বলেই তাঁর কৃপার দোহাই দিয়ে একেবারে সরে রইলে। একি কর্মীর কথা? একবার উৎসাহের সঙ্গে জেগে ওঠ, খুব ডাকতে পারবে। নিজের শরীরটা সুস্থ সুন্দর সুঠাম করবার জন্য যেমন ভাবে যত্ন করো, তেমন ভাবে মনটাকেও তৈরী করবার ব্যবস্থা করো। দেখবে ডাকবার ভাবটি প্রাণে আসবেই আসবে। কেবল তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তদনুযায়ী কর্ম ও অভ্যাস চাই। একলক্ষ্যে কর্ম করতে করতে কর্মসিদ্ধির কৌশল আপনা হতে জানা হয়ে যায়।'

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে বলছেন। বহরমপুরে। বহরমপুরের ভক্তরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে মা'কে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত

অবনী শর্মা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মাও রয়েছেন। 'গৌরাঙ্গ মা' কলকাতায় লেডি গৌরাঙ্গ বলে ভক্তসমাজে পরিচিতা। এঁর বহু ইউরোপীয়ান ভক্ত আছেন। সর্বদাই ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। ব্রজভাষায় কথা বলেন, মধুমাখা সে কণ্ঠস্বর। রূপও তাঁর পার্থিব নয়, এ যেন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় তৃষ্ণার ঘনীভূত উজ্জ্বল বিগ্রহ। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মা'র উপস্থিতিতে সমস্ত বহরমপুর শহর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবাহে প্লাবিত হয়ে উঠলো। এ প্লাবন মধুপ্লাবন! মধুর মধুর কৃষ্ণনামের প্লাবণ ভক্তহৃদয়কে প্লাবিত করে তুললো।

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও মহারাণী নীলিমা দেবী শ্রীশ্রীমা'কে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। ফল ফুল দিয়ে পূজা ও আরতি করলেন। কোনও মানবীর পূজা নয়, এ যেন এক জীবন্ত বিগ্রহের পূজা।

বহরমপুরের বিভিন্নস্থানে লীলা করে মা আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে এসে পৌঁছুলেন মেদিনীপুরের বরদাগ্রামে। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা বিশেষ প্রার্থনা করে মাকে নিয়ে এসেছেন। মা'কে ঘিরে তাঁরা নাম যজ্ঞে মেতে উঠলেন। মহামহোৎসরের আনন্দে মেতে উঠলো ছোট্ট বরদা গ্রাম। দিবারাত্র চললো কৃষ্ণকীর্তন। এইভাবে মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করে সকলকে কৃষ্ণকীর্তনে মাতিয়ে মা আবার একদিন ফিরে এলেন কলকাতায়।

রামবাবা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু। আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে ভক্তদের বলতেন, —'ওরে ওখানে আগুন জ্বলে রে। গেলেই শুদ্ধ হয়ে আসতে পারবি।'

কলকাতার আশ্রমে ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে মা বলছেন: কন্যাকুমারীর সমুদ্র-কূলে দাঁড়ালে দেখা যায় যে ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠছে ও ভাঙছে এবং ভেঙে কোন্ অনন্তে যে মিশে যাচ্ছে তার নিরাকরণ নেই। এই জগৎটিও মহাসমুদ্র বিশেষ। কত বস্তুর পলে পলে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে যাচ্ছে এবং বিনাশ হয়ে কোথায় যে যাচ্ছে তা মানববুদ্ধির অগম্য। প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ বুঝিয়ে দেয় যে, জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই এবং এক পরমপুরুষই নানাভাবে নানারূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র। প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখ। তার নিরপেক্ষ ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, তাহলে যিনি সকল কারণের বিধাতা তাঁর চিন্তা আপনা হতে জাগ্রত হয়ে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই প্রমাণ করে দেবে। জিহ্বাতে স্বাভাবিত রস আছে,

কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিতো মিঠে কোন জিনিসের সংস্পর্শে এসে না পড়ে ততক্ষণ নীরসই থাকে। আবার আরও চমৎকার দেখ, কটু কষায় এর উপর যখন যা দেবে সেই রসে এ রসবান হয়ে। সেইরকম এই যে দেহখানা দেখছো এতে নেই এমন কিছুই নেই। একে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বললেও চলে। যখন যেভাবে একে রাখতে চাও, সে ভাবেই এ থাকবে। সংসার ভাব চাও, দেখবে কেমন করে তোমাকে হয়রান করে ছাড়বে। আব ধর্মভাবে একে ভাবিত কর, দেখবে, তোমাকে শান্ত ও অটল করে দেবে। দেহের মূল্য আছেও আবার নেইও। দেখো না যতক্ষণ নদীর এপারে রয়েছো ততক্ষণই ওপারে যাবার জন্য নৌকাব উপব মায়া থাকে। যেই ওপারে যাওয়া গেল, আর নৌকার কথাই মনে আসে না। দেহের সার্থকতাও তদ্রূপ। যখন আমিত্ব লোপ হয়ে যাবে, তখন জগতের সঙ্গে সঙ্গে দেহও দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকবে।

মাতার পরিচয় যেমন স্নেহমমতায়, পত্নীর পরিচয় যেমন প্রেম ও অনুরাগে, বন্ধুর পরিচয় যেমন প্রীতি ও আত্মীয়তায়, তেমনি ধার্মিকের পরিচয়ও ধর্মাচরণে। 'ধর্ম মানি'—কেবল এ কথাতে কোন লাভ নেই। ভাবে ও কাজে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। ব্রত উপবাস জাগরণ বা কষ্টের সাধনের দ্বারা কর্মের উপর ভর করে চলা অথচ ভাবের অভাব, তাতে শুধু কর্মসংখ্যারই পূরণ করা হয়। ভিতরে নিজেকে ভাল করে দেখো, যেখানে যে খুঁত দেখতে পাও সেগুলি সারাবার চেষ্টা কর। এইভাবে যে যে স্তরে আছো, তদুপযোগী কাজ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। তাহলে সময়ে কর্ম ও ভাব সংযুক্ত হলে প্রকৃত ধর্মলাভে সমর্থ হবে।

কলকাতার ভক্তরা মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করলেন মায়ের মুখনিসৃত অমৃতময়ী বাণী।

অবশেষে মা আনন্দময়ী কলকাতার লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন জামসেদপুর টাটানগরে। এখানকার ভক্তরা অনেকদিন মাতৃদর্শন না পেয়ে ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। তাই মাকে পেয়ে সকলেই আনন্দকীর্তনে মেতে উঠলেন। মা'কে ঘিরে নাম-যজ্ঞ ও সৎসঙ্গ চলতে লাগলো। তারপর অকস্মাৎ একদিন জামসেদপুরকে পেছনে ফেলে মা চলে এলেন পুরীধামে। শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্রের মহানতীর্থে। মায়ের লীলা চললো মন্দিরে মন্দিরে আর সমুদ্র সৈকতে। আনন্দময়ী মা নন, এ যেন গৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভোর হয়ে লীলা করে চলেছেন শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে। শ্রীক্ষেত্র থেকে মা এলেন ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরে দর্শন করলেন ভুবনের অধিপতি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেবকে।

শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরকে। বিশালমন্দির কিন্তু বিরাটের অহঙ্কার নেই। এমনই অপূর্ব শিল্পকলা। শিল্পীর সফল সাধনার সম্ভার ভুবনদেবরঞ্জন হয়ে উঠেছে। পুরীধাম ও ভুবনেশ্বরে লীলা করে মা আবার একদিন ফিরে এলেন কাশীতে।

আশ্রমে এসে নাম গানে বিভোর হয়ে রইলেন। মা তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন, 'গুরু গোবিন্দ ব্রহ্মনাম,—মা দুর্গা শিব রাম। গুরু গোবিন্দ ব্রজ ধাম, মা দুর্গা শিব রাম।' মায়ের আগমনে কাশীধাম আবার মেতে উঠলো। মহামহোৎসবের আনন্দে।

লীলাময়ী মায়ের কাশীর লীলাও বেশীদিনের নয়। দুদিন না যেতেই যেন অস্থির হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশের টানে ছুটে বের হয়ে পড়লেন।

অকস্মাৎ মা একদিন চলে এলেন ভাগলপুরে। ভাগলপুরে এসে দর্শন করলেন গৈবীনাথ শিবকে। গঙ্গার ঠিক মাঝখানে দ্বীপের মত একটি স্থান। সেখানেই শিব মন্দির। মা ভক্তবৃন্দসহ নৌকা করে গেলেন। মনোরম স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতীব সুন্দর। ভাগলপুর থেকে এলেন হাজারিবাগে। ভক্তেরা একটি নূতন বাড়ীতে মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। মা সেইখানেই অবস্থান করছেন। দলে দলে ভক্তরা এসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে আর চরণধূলি মাথায় নিয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। অভাবনীয় সে দৃশ্য।

এখানেও বেশীদিন নয়। মাত্র চারদিন অবস্থান করে মা উত্তরাখণ্ডের পথে যাত্রা করলেন।

কুলু ভ্যালী, জ্বালামুখী, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান, বোম্বে, আমেদাবাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে মা প্রচার করতে লাগলেন কৃষ্ণ নাম, রাম নাম, হরি নাম। সকলকেই মা বলেন,—'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। যাহা রাম উহা অবিরাম, যাঁহা নহী রাম উঁহাহী বে-আরাম, ব্যারাম।'

এইভাবে ভারতের বহু দেশ বহু তীর্থস্থান পরিদর্শন করে মা আনন্দময়ী আবার একদিন ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে শুনলেন দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অসুস্থ হয়ে পি. জি. হাসপাতালে রয়েছেন। মুক্তিবাবাও তখন পি. জি. হাসপাতালে ছিলেন। মা এসে উভয়কেই দর্শন দিলেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনই আনন্দময়ী মা'কে প্রথম দর্শন করে বলেছিলেন,—'ভারতবর্ষের ইনিই একমাত্র জীবন্ত সন্ন্যাসিনী।'

মা বলেন,—'তোমরা বিশ্বাস হারিয়ো না, কৃপা ত তিনি সর্বদাই করছেন। শুধু বুঝবার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে বসে থাকতে হয়।'

* * *

শীতের সুন্দর প্রভাত! আকাশে নির্মল নীলিমা। পাখীদের কলকাকলি। সোনালী আলো চোখের উপর যেন সুধাবর্ষণ করছে। পথের দুই ধারে গ্রাম শস্যক্ষেত্র, বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। অপূর্ব সে প্রাকৃতিক দৃশ্য!

আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন পণ্ডিচেরীতে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্নস্থানে মন্দিরাদি দর্শন করে মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরীর পথে যাত্রা করলেন। অবশেষে সকাল ৯টায় ভক্তবৃন্দসহ মা এসে পৌছুলেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। উঠলেন এসে অতিথিশালায়। সমুদ্রের তীরে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ।

মা প্রথমে দর্শন করলেন শ্রীঅরবিন্দের সমাধি। সুন্দর স্থানটি। সমাধির উপর ফুল দিয়ে সাজানো। সমাধিটি একটি গাছের নীচে এমনভাবে স্থিত যে মনে হয় যেন বাসুকি শতফণা বিস্তার করে কৃষ্ণকে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র থেকে রক্ষা করছেন। সমাধি স্থানে এসে মায়ের ভাব হলো। ভাব সমাধি। অপ্রাকৃতভাবে বিভোর হলেন মা আনন্দময়ী।

মায়ের সমাধি ভঙ্গ হলে মায়েরই পুরানো ভক্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মা'কে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে নিয়ে এলেন। শ্রীঅরবিন্দ যেখানে বসতেন সেই ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল (Mother) শ্রীমা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী দুই মাতৃমূর্তির সুন্দর দুই জোড়া চোখের মিলন হলো। অনির্বচনীয় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। ভক্তবৃন্দ মুগ্ধচিত্তে সে দৃশ্য নয়নগোচর করে ধন্য হলেন। Mother ও আনন্দময়ী মা'র মধ্যে ফুলের আদান প্রদান হলো। এর পিছনে কি রহস্য আছে তা তাঁরাই জানেন। কথাবার্তা কিছু হলো না, ভাবের আদান প্রদান হলো। তবে উভয়ের মিলনে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় ও শিষ্যা ইন্দিরা দেবী বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানিয়ে মা'কে ওঁদের গৃহে নিয়ে এলেন। উভয়েই আশ্রম বাসী। এবারে শুরু হোল দিলীপ রায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন। মীরার ভজন। ইন্দিরাদেবীও ভজন শোনালেন। অপূর্ব সুমধুর ভাবপূর্ণ সে সঙ্গীত। সে দিব্য সঙ্গীত অন্তর হতে উত্থিত হয়ে অনন্তাভিমুখে কৃষ্ণ সমীপে কোথায় যেন ভেসে

প্রবাদ আছে যে রাবণ বধের পর যখন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসছিলেন, বিভীষণাদি সকলেই সঙ্গে ছিলেন। পরে বিভীষণকে লঙ্কায় ফিরবার আদেশ দিলে বিভীষণ খুব কাঁদতে থাকেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীরঙ্গমের মূর্তি হাতে তুলে দিলেন। এবং ঐ মূর্তি নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যেতে বললেন। বিভীষণ লঙ্কার পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেলেন। এবং ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁর ভালোই লাগলো। সেই ব্রাহ্মণ আর কেউ নন স্বয়ং গণেশজী। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে বিভীষণকে মূর্তির বিষয় জিগগেস করলেন। বিভীষণ সবকিছু বলে তাঁর হাতে কিছুক্ষণের জন্য মূর্তিটি রেখে বিশেষ প্রয়োজনে একটু অন্যদিকে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন সেই ব্রাহ্মণ মূর্তিটিকে মাটির উপর রেখে ভাল করে দেখছেন। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছিলেন সে মূর্তি যেন পথে না রাখা হয়, তবে তিনি সেইখানেই থেকে যাবেন। শর্তভঙ্গ হয়েছে দেখে বিভীষণ ক্রোধান্ধ হয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আঘাত করলেন। সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণ-বেশধারী গণেশজী বিভীষণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলেন। বিভীষণ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই স্থানেই শ্রীরঙ্গনাথের মূর্তি স্থাপন করলেন এবং তারই পার্শ্বে গণেশজীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করলেন।

শ্রীরঙ্গম থেকে মা এলেন, 'রামেশ্বরম্'। রামেশ্বরম্ থেকে ধনুষ্কোডিতে। ধনুষ্কোডিতে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর মিলিত হয়েছে। সমুদ্র এখানে শান্ত ও নীরব। যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এখানে স্নান করলেন।

মা আবার রামেশ্বরম্ এসে মাদুরার পথে যাত্রা করলেন। মাদুরায় এসে দর্শন করলেন মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণগণ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'কে মালাচন্দন ফুল ফল দিয়ে আরতি ও পূজা করলেন। মন্দিরে দলে দলে নারী পুরুষ এসে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে দশ সহস্র লোক এসে একত্রিত হলেন। মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনবেন বলে ঐ মন্দির প্রাঙ্গণেই এক ধর্মসভা বসে গেল। শ্রীশ্রীহরিবাবা কীর্তন করলেন। শ্রীশ্রীমাও 'হে ভগবান, 'হে ভগবান···, বলে নাম কীর্তন শুরু করলেন। সঙ্গীত শেষে মা ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এই শরীরের কথা হচ্ছে,—'হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। জঁহা রাম উহাঁহী আরাম। জঁহা নহী রাম উহাঁহী বে আরাম—ব্যারাম।' একজন ভক্ত তামিল ভাষায় মায়ের

কথার মর্মার্থ বলে দিলেন। সকলেই তৃপ্ত হয়ে মা'কে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

মাদুরাকে পিছনে ফেলে মা এলেন ত্রিচুরীতে, মহর্ষি রমণের জন্মস্থানে। এখানেও কয়েক সহস্র মানুষ একত্রিত হলেন 'মা আনন্দময়ীকে' দর্শন করবেন বলে।

দক্ষিণভারতের সর্বত্রই শ্রীশ্রীমা যেখানেই মন্দির দর্শন করতে গেছেন, সেখানেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য চতুর্দিক থেকে নরনারী ছুটে এসেছেন। মা মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করবেন কি, মাকেই জীবন্ত বিগ্রহরূপে দর্শন করে ধন্য হয়েছে মন্দিরের পূজারী পুরোহিত আর অগণিত সাধারণ মানুষ। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। অনির্বচনীয় পরিবেশ।

এইভাবে মা আনন্দময়ী দক্ষিণভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান মন্দিরাদি দর্শন করে পুণা হয়ে বম্বেতে এসে উপস্থিত হলেন। এসে উঠলেন, ভিলে পার্লে সন্ন্যাস আশ্রমে। স্বামী কৃষ্ণানন্দ পূর্বেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ এখানকার মহামণ্ডলেশ্বর। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব ও বিষ্ণু এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের মূর্তি।

দক্ষিণভারত পরিক্রমা সমাপ্ত করে নিরাভরণা তপস্বিনী মা আনন্দময়ী আবার যাত্রা করলেন গুজরাটের পথে।

তখনও যেন মা'র কানে ভেসে আসছে তামিল-কন্যার কণ্ঠনিঃসৃত আকুলতাপূর্ণ সেই সুললিত সঙ্গীত ধ্বনি :—

প্রেমময়ী মাঈ
আনন্দময়ী মাঈ
অতি অদ্ভুত মধুরময়ী মাতা
মাঈ মাঈ মাঈ····· ॥

ভারত-পথিক আনন্দময়ী মা !

ভারতের বিশাল জনপদ, বিপুল জনতার মধ্য দিয়ে ধর্মভাবের উদ্দীপন করতে করতে ভারত পরিক্রমা করে চলেছেন মা আনন্দময়ী। নিরাভরণা তপস্বিনীর বেশ, মুখে কৃষ্ণ নাম।

মা এখন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরিক লীলাস্থলে।

পূর্ণিমা নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্নালোকে মা দর্শন করলেন দ্বারকানাথকে। দ্বারকাধীশ রুক্মিনী-প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীশ্রীহরিবাবা হরিসংকীর্তনে মুখরিত করে তুললেন দ্বারকাধীশের মন্দিরদ্বার। ভাবানন্দে বিভোর হলেন মা আনন্দময়ী। ভাবে ঢল ঢল। যেন সেই অচিন্ত্য মধুর রসে মগ্ন হয়ে আছেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দরের মত প্রাণজুড়ানো কৃষ্ণনামে মেতে উঠলেন। নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। সেই ভাবপূর্ণ মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন মন্দিরের পূজারী আর উপস্থিত ভক্তজনেরা।

দ্বারকায় এসে মা দর্শন করলেন রুক্মিণী দেবীর মন্দির। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আর দামোদর কুণ্ড।

দ্বারকার লীলা সাঙ্গ করে মা এলেন রাজকোটে। রাজকোট থেকে মোরভিতে। মোরভির' বৃদ্ধ মহারাজার একান্ত প্রার্থনায় মা রাজপ্রাসাদে এলেন। মহারাজা ও মহারাণী পুত্রশোকে কাতর। অল্প কিছুদিন হলো পুত্রকে হারিয়ে পাগল প্রায়। মায়ের মুখনিসৃত সান্ত্বনা বাক্য শুনে তৃপ্ত হলেন। মোরভি থেকে এলেন ভাবনগরে। এখানেও অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড়। ভক্তপ্রবর জয়ন্তীলাল শ্রীশ্রীমা ও মহাত্মাদের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। ভক্তদের একান্ত আগ্রহে ভাবনগরে তিন দিন অবস্থান করে মা যাত্রা করলেন আমেদাবাদের পথে। ভক্ত কান্তিভাই, মুনশা, কুন্দনবেন, লীলাবেন, মুকুন্দভাই ও আরও অন্যান্য ভক্তরা শ্রীশ্রীমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ভক্তপ্রবর কান্তিভাইয়ের পূজার ঘরে মায়ের থাকবার ব্যবস্থা হলো।

আমেদাবাদের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করে, মন্দিরাদি আশ্রম পরিদর্শন করে, মা এলেন চান্দোদে। চান্দোদ থেকে ভীমপুরার আশ্রমে। এই চান্দোদ

থেকে শ্রীশ্রীহরিবাবা যাত্রা করলেন ওঁকারেশ্বরের পথে। আর অবধূতজী আনন্দময়ী আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দসহ যাত্রা করলেন নাথদ্বারা'র পথে।

অবধূতজী হলেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূত। পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বৈদান্তিক সাধু, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র পরম ভক্ত।

গুজরাটের ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মা বলছেন : 'ভাঙাগড়া কালের গতি, কালের উপর যিনি মহাকালরূপে বসে আছেন তিনি অখণ্ডরূপে পূর্ণ, খণ্ডরূপেও পূর্ণ। এই কারণে ভাঙাগড়া তাঁর সর্বত্র সমান, এই সমদর্শিতার জন্য তিনি মঙ্গলময়, এবং সুখী দুঃখী সকলেরই প্রার্থনার বস্তু। না গড়লে ভাঙে না এবং না ভাঙলে গড়ে না। কাজেই জগৎচক্রে ভাঙাগড়া অনিবার্য। সীমার গণ্ডীতে থেকে কয়েদীর মত তোমরা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছ। এ জন্যই 'আমি' ও 'আমার' এই দু' কথার বাইরে যেতে পারো না। পুত্র লাভ করে হাসো আবার পুত্র হারিয়ে কাঁদো। রক্তমাংসের দ্বন্দ্ব ভুলে ক্ষণিক ফিরে দাঁড়ালেই দেখা যায় কে-ই বা কার পুত্র ? কে-ই বা কার পিতা ? অথবা পিতা পুত্র বলে কিছুই নেই। একমাত্র তিনিই সর্বভাবে সর্বত্র মূর্তিমান। তাইতো এ শরীরটা বলে, 'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।'

আবার বলছেন,—'সংসারে থাকলে ধর্মলাভ হয় না, একথা সত্য নয়। গার্হস্থ্য জীবনের ভিতর দিয়ে ধর্মলাভের কত সুযোগ! পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর অনুরাগ, স্বামী স্ত্রীর প্রেম, পুত্রকন্যার ভক্তিশ্রদ্ধা, আত্মীয় বন্ধুর ভালবাসা, আশ্রিত ও দীনদুঃখীর আশীর্বাদ ইত্যাদি ধর্মজীবনের কত সহায়— একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।'

'সংসারের সুখ-দুঃখের আন্দোলনে মনটিতে ঘষামাজা পড়লে কখনো কখনো মানুষকে ত্যাগময় করে তোলে, ভগবানের জন্য আকুলতা জাগায়। সে অবস্থার সুযোগ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় লাভ করতে পারেন না।'

'শুদ্ধভাবে কর্ম করো। হাতে কাজ মনে তাঁরই চিন্তা। কাজ করো, কাজের সঙ্গে সঙ্গেই নাম। তিনি কর্মের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হবেন। চন্দ্র সূর্যের আলোর মত প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে কেমন করে তিনি সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন।' তাইতো এ শরীরটা সর্বদাই বলে,—'হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।'

এইভাবে শ্রীশ্রীমা গুজরাটের লীলা সাঙ্গ করে বরোদা হয়ে আবার ফিরে

চললেন পূর্ব ভারতের দিকে। মা আনন্দময়ীকে বিদায় দিতে গিয়ে গুজরাটের ভক্তদের প্রাণ এক অজানা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জনতার মধ্য থেকে একজন ভক্ত গেয়ে উঠলো :—

—মা তুম্ যাও
রুখ্ না সকো তো যাও,
মা তুম্ যাও!
হাম তো তুম্‌হে ন ভূল সকেঙ্গে॥

* * *

সীমাহীন মহাসমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতন দিন আসে রাত্রি যায়। অনিবার্য ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা। সপ্তাহ শেষ হয়, মাস চলে যায়, বছরও ঘুরে আসে। শ্রীশ্রীমা কলকাতা, পুরীধাম, বিন্ধ্যাচল, ও এলাহাবাদ কুম্ভমেলার লীলা সাঙ্গ করে আবার এসে উপস্থিত হলেন কাশীধামে। গীতা জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। ইংরাজী ১৯৫৪ সন। বহু সাধু মহাত্মাদের সমাগম হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুরও শিষ্যবর্গ নিয়ে এসেছেন। মায়ের উপস্থিতিতে সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হলো গীতা জয়ন্তী উৎসব। গোপাল ঠাকুর বললেন, 'মা'র কৃপাতেই এত সুষ্ঠভাবে উৎসবের কাজ সম্পন্ন হলো।'

ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মা বলছেন,—'ভগবানের নামে ফল হইবেই। ভগবানের সব নামেই যে শক্তি আছে। তবে নিষ্ঠা চাই। তাইতো সর্বদাই এ শরীরটা বলে, তোমরা নাম করে যাও। চিত্তশুদ্ধি মনস্থির এসব নামের দ্বারাই হয়। নামের দ্বারাই তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারো। বেগের কথা, গতির কথা, সেটা নির্ভর করে সাধকের সাধনার ইচ্ছার তীব্রতার উপর। যদি তীব্র সাধনা হয় তবে শীঘ্র পৌঁছানো যায় লক্ষ্যে। আর যদি গতি ধীর হয় তবে পৌঁছুতে দেরী হবে।

মন না লাগলেও ওষুধ খাইবার মত খাওয়া। ফল তাতে ভালই হইবে। ওষুধ খাইলে রোগ সারিয়া যায়। কিন্তু সংসারী বিষয়ে কখনও সমস্যার সমাধান হয়, আবার কখনও হয় না। ভগবানের বিষয়ে তা নয়। সারিবেই। ফল লাভ হইবেই। আবার দেখ, দুঃখের উপশমের জন্য ভগবৎ পথ ছাড়া অন্য পথও ত নাই। শান্তিলাভের জন্য আধ্যাত্মিক পথে আসিতেই হইবে। তাইতো এ শরীরের কথা, এক ত হাসপাতালে ভর্তি হইয়া যাও। ডাক্তারের ওষুধ খাও। নিয়মিত পথ্য খাও। রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করবে। অথবা ডাক্তারের ওষুধ আনিয়া বাসায় বসিয়া খাও। সঙ্গে সঙ্গে পথ্যাদিও

নিয়মিত কর। অর্থাৎ সব ছাড়িয়া তাঁহার নাম নিয়া পড়িয়া থাক। অথবা সংসারে থাকিয়াই গুরুর উপদেশ মত নাম নেও, নিয়মিতভাবে থাক। সংযমী হওয়া। তাহাতেও রোগ আরোগ্য হওয়ার আশা। দেখ না, ছোটবেলা কি পড়িতে ভাল লাগে? কিন্তু পিতামাতা মাষ্টারের সামনে নিয়মিত পড়িয়া সে তো বিদ্বান হইয়া যায়। এটা যেমন অর্থকরী বিদ্যা। আবার ঐদিকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলে পরম ধনের আশা। পরম ধন কি? না, ভগবান স্বয়ং। 'যাঁকে পেলে সবকিছুই পাওয়া হয়ে যায়। যাঁকে ভালবাসতে পারলে আর দুঃখ নাই। তাঁর জন্য যে বিরহ তাহাও সুখই। তাঁকে ভালবাসিতে পারিলে ত তবে তাঁর জন্য বিরহ হইবে। বিরহ মানে কি? না—বি-রহ, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে থাক। মানে ভগবান যাঁহার মধ্যে বিশেষ-ভাবে রহেন তাঁহারই বিরহ হইতে পারে।'

—'যাহা ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় তাহাই মোহ। এই জন্যই বলা হয় যে সংসারে যাহাদের নিয়া থাকিতে হইবে তাহাদের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করা। মনে করিতে হয় তিনিই এইরূপে আমার কাছে আছেন। মনের মধ্যে এমন একটি ভাবস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতে পারিলে, শান্তিলাভের আশা। এইরূপ করিতে পারিলে আর বন্ধনের কারণ হয় না।

মোহটাকে মহান ভাবের দিকে নিয়া যাওয়া। তাঁহার দিকই দিক। অন্য কোনও দিকে শান্তি নাই। হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। হরি মানে যিনি দুঃখ হরণ করেন। অর্থাৎ যাহা অমৃতবাণ মানে অমর বাণ। যাহা অমৃতের পথে নিয়া যায়। সেই হরি কথাই কথা। যাঁহা রাম উঁহা আরাম, যাঁহা নহী রাম উঁহাহী বে-আরাম। ব্যারাম। এই শরীরের ত এই-ই কথা।'

* * *

আবার একদিন পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দেবার প্রাক্ মুহূর্তে উষাভাসের ঈষৎ আলোকে এসে আনন্দময়ী মা দাঁড়ালেন ভাইজীর সমাধির নিকট শিবজীর মন্দিরের সম্মুখে। তাঁর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো একটি ব্যথিত মূর্তি, দেহলীলা সম্বরণের পূর্ব মুহূর্তেও যে মূর্তি মাতৃনামে ছিল বিভোর। জীবনের শেষ মুহূর্তের সেই করুণ দুই চোখের চাহনি আর মা—মা ডাকের করুণ শব্দ আজও যেন অকস্মাৎ মায়ের মনকে বিচলিত করে তুললো। তখন এক করুণ রাগিনী তাঁর অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হতে লাগলো। আর কানে ভেসে আসতে লাগলো ভাইজীর কণ্ঠনিসৃত স্বরচিত সঙ্গীত ধ্বনি :—

বল আর কতদিন আকুল পরাণে কাঁদিতে হইবে জননি ?
কবে হৃদয় যন্ত্রে, তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিবে তোমার রাগিনী ?
কবে সকল দুঃখের, সুখের ভিতর, প্রেমরসপানে হইব বিভোর ?
নয়ন খুলিতে, শ্রবণ ফিরাতে শুনিব তোমার বাণী ?
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা, বুঝি ডুবে যায় এই দেহ ভেলা,
কে আছে আমার তুমি বিনে আর হৃদয়ের ধন পরশমণি।

* * *

ধীরে ধীরে প্রভাতসূর্যের আলোকে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অরণ্য, শিবজীর মন্দির, আলমোড়ার আশ্রম, সবকিছু। শ্রীশ্রীমা'ও আবার ফিরে চললেন ঘরের দিকে। আত্মসমাহিত অবস্থা। ভক্তরাও একে একে এসে উপস্থিত হলেন মা'কে প্রণাম করবে বলে। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মায়ের মুখে-চোখে আবার ফুটে উঠলো স্নিগ্ধ হাসির ছটা। সহসা বিষন্ন মন হয়ে উঠলো প্রসন্নময়ী। বাতাসও মধুরতায় আর্দ্র হয়ে উঠলো। কোথায় তলিয়ে গেল দুঃখের ভার। ফুলের মত হেসে ওঠে অন্তর। মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে মা আবার প্রবেশ করলেন তাঁর ভাবজগতে। গুণ গুণ করে গান করতে লাগলেন, দুই হাতে মৃদু করতালি দিয়ে, ·····গোপাল গোপাল, ব্রজের রাখাল, নন্দদুলাল প্রেম গোপাল॥

আবার একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো ভক্তদের সম্মুখে। ২রা মে। মা আনন্দময়ীর জন্মোৎসব। আলমোড়াতেই। ভক্তপ্রবর হরিরাম যোশীই অগ্রণী হয়ে এই জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। দূর দূরান্ত থেকে এলেন ভক্ত শিষ্যরা। সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা। হিমালয়ের পদতলে আলমোড়া আশ্রমবাড়ী মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো, নেচে উঠলো। অখণ্ড নামকীর্তন শুরু হয়েছে। নারী পুরুষ তরুণ বৃদ্ধ সকলেই নাম সংকীর্তনে বিভোর হলেন। মাঝে মাঝে 'হরি হরি বোল' উচ্চ ধ্বনিতে ভক্তবৃন্দের দেহ মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলো। কীর্তনে এই উচ্চধ্বনি প্রসঙ্গেই একদিন ভক্তপ্রাণ শ্রীঅবনী শর্মা মা'কে জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা মা লোকে যে কীর্তন করতে করতে হঠাৎ জোরে ধ্বনি দেয় এর অর্থ কি ?'

প্রত্যুত্তরে মা বললেন,—'বাইরের ভাবগুলিকে সরিয়ে মনটাকে কীর্তনের মুখে লওয়া আর কি।'

আবার একদিন বললেন, 'মিশ্রি মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার

এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের হবেই। অর্থাৎ নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই।'

ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মমুহূর্তটি এগিয়ে এলো। রাত্রি শেষ প্রহর। তিনটার সময় শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ হলো। পূজা করলেন অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত অগ্নিসত্বা শাস্ত্রী—মন্ত্রাচার্য বাটুদা। সমস্ত পরিবেশটি তখন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহমণ্ডিত হয়ে উঠলো। আনন্দময়ী মা'র অন্তরস্থিত মন্ত্রময়ী তেজোময়ী অমোঘ বাঙ্ময়ী শক্তির প্রভাব আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে মিলে মিশে একাকার হয়ে ভক্তদের মনকে বিভাবিত করে তুললো। যেন প্রাণময় চিন্ময় বেদময় আত্মময় হয়ে উঠলো তারা। কি প্রাচুর্য, কি শক্তি, কি আনন্দ! যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। জীবন যেন কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিনী! অনন্ত আশার অনাদিভাণ্ডার। একটা হাসি, একটা গান বিরামহীন একটা মাদকতা যেন। ভেসে চলেছে অনন্তের বুকে। কি আনন্দ! আনন্দ··· আনন্দ···আনন্দ···ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার!···তাদের সত্ত্বার মধ্যে এমন কিছু নাই যা আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে। সব শক্তি সব অনুরাগ দিয়ে তারা যে আনন্দকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাদের মা যে আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা! পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা!

—'ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া, আর সব মৃত্যুপথের ক্রিয়া। আত্মচিন্তাই স্বগতির দিক। জগতের ক্রিয়ার অপরূপ প্রকাশ। হরিচিন্তা ছাড়া আর যা কিছু সবই বৃথা। অক্রিয়া। স্বক্রিয়াতে স্থিত হওয়াই কর্তব্য।'

'মানুষ অভাব রূপেতেই প্রকাশিত। অভাবের চিন্তাই করে। অভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বভাবের চিন্তাই কর্তব্য। নতুবা অভাব। অক্রিয়া। অগতি। দুর্গতি। মৃত্যু। নিজেতে নিজেই। যাতায়াতরূপে সব রূপে তিনিই। আমিই যে আত্মারাম। জ্ঞানরূপেতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শুধু তুমিই। তুমিই। তুমিই। সমস্ত কিছুতে তুমিই। আবার তুমি স্বয়ংই।

অনন্ত একমাত্র তিনিই। একমাত্র আমিই।'

'আপনিই করে, আপনিই ফল পায়। আপনার ক্রিয়া দ্বারাই অভাব সৃষ্টি হয়। আবার আপন ক্রিয়া দ্বারাই সেই অভাব দূর হয়। নিজেরই করা নিজের প্রকাশের জন্য। নিজেই বিষয় ভোগ করে, নিজেই আবার ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তাইতো বলা হয় অমৃতভোজী হও বাবা! অমরভোজী! অমর পথে চলো যেখানে মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শোক তাপ দুঃখ নাই। নিজেই নির্বিষয়ের দিকে চলো। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া। যে যেখানে আছো সেখান থেকেই চলো। বাসনা-কামনাহীন হয়ে পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যের দিকে চলা। সেবা বুদ্ধি নিয়ে চলে। সেবা বুদ্ধি থাকলে তবেই ভগবৎ সেবায় লাগা যায়। মোহ বুদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্তি। শোক তাপ ব্যাধির সৃষ্টি। তাঁর বিধান বড় ভাল। সেই জন্যই বলা হয়, মহাযাত্রা কর সকলে, যে যাত্রায় যাত্রা বন্ধ হয়। সময় যেন বৃথা নষ্ট না হয়। তাঁর নাম নিয়েই থাকো। যার যে নাম ভাল লাগে। 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'শিব', 'মা'—যে নাম অন্তর থেকে স্বাভাবিক ভাবে আসে।'

'এই জন্যেই এ শরীরটা বলে, যেখানে নেই 'রাম' সেইখানেই ব্যারাম। রাম মানে আত্মারাম। শান্তস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ। আত্মস্বরূপ।' শ্রীশ্রীমা বলছেন ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে, সোলনে। শ্রীশ্রীমা এখন সোলনে। ভক্তপ্রবর রাজা দুর্গাসিংজীর (যোগীভাই) আন্তরিক আহ্বানে, বিশেষ প্রার্থনায় মা এসেছেন। নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ। বিশেষ ভিড়ভাড় নেই। বিকালের দিকেই ভক্তরা আসেন। কথাবার্তাও হয়। মায়ের বিশ্রামও হচ্ছে। একজন বিশিষ্ট ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন,—'দেখ, বাবা! অশান্তি দুই রকম। দুনিয়ার কাজ করিযা অশান্তি, আর পরমপথে অগ্রসর হওয়ার অশান্তি। এই অশান্তিই আবার শান্তির একমাত্র উপায়। তিনি যে শান্ত—আত্মা—ভগবান সেই উপলব্ধি হয়। পরম শান্তির জন্য অশান্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। নিত্য আনন্দও তাহাই।'

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে ভক্তরা এসে মিলিত হচ্ছেন। সাধু সন্ন্যাসী রাজা মহারাজা সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষই আসছেন। টিহরীর মহারাজা মহারাণী, ভক্তিমতী রমণী লীলাবেন। বম্বে থেকে মিঃ মেহতা। শ্রীযুত বি· [illegible]· শাহ সপরিবারে এসেছেন। দিল্লী সিমলা থেকে বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীর দল। ডাঃ বলরাম, শ্রীযুত আগরওয়ালজী, শ্রীপঙ্কজ সেন। শ্রীরাজাগোপালন

শ্রীজিতেন দত্ত, শ্রীঅমল সেন, হিমাচলের গভর্ণর, ভদ্রীর রাজাসাহেবও এসেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা সকলের উপরই সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে।

আজকাল ভক্তপ্রবর বি· কে· শাহ'ই মায়ের আশ্রমের নানা কার্য্যে সহায়তা করছেন! মায়ের জন্য ব্যাকুল তাঁর অন্তর! অশ্রুসিক্ত নয়নে একদিন মাকে বলছেন,—'মা আমি একসময় গরীব ছিলাম। তোমার কৃপায় ধন ঐশ্বর্য মান প্রতিষ্ঠা অনেক পেয়েছি। এখন শুধু প্রার্থনা, তুমি আমার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকো। আমি পূজার ঘরে গেলেই চতুর্দিকে তোমাকেই দেখতে পাই। আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখো মা তাহলেই আমার জীবন ধন্য হবে।'

প্রত্যুত্তরে মা-ও মৃদু হেসে বললেন 'হাঁ বাবা, তাঁর কৃপা ত সর্বদাই সকলের উপর বর্ষিত হচ্ছে। তিনি যে দয়াময়। তাঁকে চিন্তা কর, তাঁকে ডাক। হরি চিন্তনেই মন বশ হয়, শান্ত হয়। সর্বাঙ্গীন দর্শন হয়। সর্বাঙ্গীন দর্শনে ইষ্টের প্রকাশ। যেমন বলে না, 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' মায়ের মুখনিসৃত কথামৃত পান করে বি কে· শাহর মন প্রসন্নতায় ভরে উঠলো।

মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশী থেকে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ একখানি সুন্দর চিঠি লিখেছেন। সে চিঠি মা'কে পড়ে শোনানো হোল। গোপীনাথ লিখছেন,—'সত্যই যে অখণ্ড প্রকাশরূপিনী মা জগতে প্রকট হইয়াছেন, ইহাই যেন তাঁহার জন্মোৎসবের দিন আমরা স্মরণ করি। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম কোথায়? স্বয়ং-প্রকাশ-রূপিনী এবার আড়াল ভাঙিয়া নিজগুণে প্রকাশিত হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।·· চিরপ্রকাশমান সত্য যেন আড়াল ভাঙিয়া নিজ বলেই নিজেকে প্রকাশ করে—ইহারই প্রতীক্ষা। বস্তুতঃ সেখানে আড়াল কোথায়? আবার আড়াল গড়িয়াছেনও তিনি—ভাঙিবেনও তিনি। আবার ভাঙাগড়ার অন্তরালে হাসিয়া খেলা খেলিতেছেনও তিনি। তাহা ছাড়া আড়ালেও তিনিই। এই আড়ালের দ্বারা যে কৃত্রিম গণ্ডি প্রকাশ হইয়াছে তাহা কি তিনি নন? সবই যে তিনি। সবের উর্ধেও তিনি। তিনিই ত তুমি। আবার তুমিই বা কে? আমিই ত। আমি ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আবার সেখানে আমিই বা কোথায়? মা! চোখের ঠুলি খুলিয়া দেও। বুঝার বোঝা সরাইয়া দেও। কথার পালা শেষ করিয়া দেও। মা গুরু নিজে সবই সেই একই স্বয়ং। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আর কতদিন জড়াইয়া থাকিব? তোমার জন্মদিন—সকলে উৎসব করিবে।

আনন্দে জয়গান গাহিবে। কিন্তু একটি চিরবিরহকাতর হৃদয় তোমার সেই মহা আবির্ভাবের দিকে তাকাইয়া আছে। যখন সে তোমাকে আমি বলিয়া চিনিতে পারিবে—চিনিয়া চমকিত হইবে। অতি পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের আড়াল আর কতদিন ?'

মা তখনও আত্মানন্দে বিভোর। মুখমণ্ডলে ফুটে রয়েছে নির্মল পাবন জ্যোতি। দৈবী ভাবের স্বতস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁর দেহসীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠছে।

আবার সোলনের আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। প্যাণ্ডেলের মধ্যে সবকিছু ভিজে একাকার। তার মধ্যেই সৎসঙ্গ চলছে। কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীও আছেন। নানা কথা নানা আলোচনা চলছে। মা বলছেন,—'বৃষ্টিতে তোমাদের নষ্টত কিছুই হয় নাই। শুধু বসিতে কিছু অসুবিধা হইয়াছে।'

প্রত্যুত্তরে রাজাসাহেব বললেন,—'হাঁ মা, সেইটুকুই অপরাধ রহিয়া গিয়াছে।' এই কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। মাও হাসলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্রহ্মচারী কুসুমভাই পূজা আরম্ভ করলেন। অবধূতজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা এসে মণ্ডপে বসলেন। মঞ্চের দুইদিকে চৌকির উপর ১০৮ পদের ভোগ সাজান হয়েছে। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ধারা আঘাত করে চলেছে প্যাণ্ডেলে। কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তবুও সকলে স্থির হয়ে বসে আছেন। শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা দেখছেন। জীবন্ত মায়ের পূজা! অনির্ব্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হোল। সকাল সাড়ে চারটার পর পূজা সমাপ্ত হোল। ভোগ নিবেদন করা হোল। তারপর আরতি হোল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো উষার আলো আকাশের বুকে। তখন বৃষ্টির ধারাও বন্ধ হয়েছে। আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশের রাজ্য। ভক্তদের মন। তাদের মন যেন বলছে, '—সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে—জীবন ও মরণও ভরি।'

*   *   *   *

—'পাথর দেখলে বিগ্রহ নাই। আর বিগ্রহ দেখত পাথর নাই। ভগবৎ বিগ্রহ ভাবনা যেখানে আনবে সেইখানেই ভগবান বিরাজ করেন। যেমন বলে না সমস্তই ভগবানের বিগ্রহ। আর যদি ভগবৎ বিগ্রহ বলা যায় তবে তা প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করাও উচিত।

পাথর বুদ্ধি থাকলে দুর্বুদ্ধি, ভগবৎ বুদ্ধি হলো না। এইজন্য ভগবান কোথায় ?—এই যে অনুসন্ধান। হরেকরূপে এক ভগবানই, ইহা অনুভব

করবার প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দুনিয়ার বিষয়রসে যে বুদ্ধি —বিষয়বুদ্ধি। নিত্যরূপ নয়, অনিত্যরূপ। কিন্তু যেখানে একমাত্র ভগবৎ-প্রকাশ সেখানে অনিত্যের কথা নাই। তোমার দৃষ্টির সৃষ্টির মধ্যে নিত্য নাই। পরিবর্তনশীল। ইহাই জগৎবুদ্ধি। ইহাতে কি প্রকাশ হয়? নাশ। যাহা নাশ হয়, সেখানে স্বপ্রকাশ নাই। সেখানে স্বয়ংরূপ কোথায়? ওখানে ত নাশ—নাশ হয় না। নাশ—নাশ হওয়া চাই।

বিষয় বাসনায় মন থাকলে, তার স্বভাবই মনকে বিকল করা। এইজন্যই চেষ্টা করা। অভ্যাস করা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান জপে মন না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান জপের চেষ্টা করে যাওয়া। পরিমিত নিদ্রা ভোজন ইত্যাদির প্রয়োজন। দেখ, যখন কোথাও যাত্রা কর যতটা প্রয়োজন মাত্র ততটাই সঙ্গে নেও। ঘর হতে সবটাই ত আর নেও না। এইজন্য ভগবৎ পথে যাত্রা করলে ভগবৎমুখী অনুকূলতার জন্য আহার নিদ্রা যতটা প্রয়োজন ততটাই নেওয়া। যেমন বলে না,—'যেমন খাইবে তেমন মন পাইবে।' মন যে বড়ই চঞ্চল। চঞ্চল মন সর্বদাই বাইরের দিকে টেনে নেবে। অন্তর্মুখী হতে দেবে না। তাইতো এ শরীরটা বলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারে বারে চেষ্টা করা তাঁর দিকে লাগাবার জন্য। সময় না পেলেও অন্তত দশমিনিট সময় তাঁর জন্য দেওয়া। প্রতিদিন সেই সময়টা যেখানেই যে অবস্থায়ই থাকো না কেন, তাঁর স্মরণ নেওয়া। মনকে তাঁর দিকে নেওয়ার জন্য, অন্তর্মুখীন করার জন্য, জপ ধ্যান কীর্তন পাঠ সৎসঙ্গ যা ভাল লাগে তাই করা। প্রথম প্রথম মাসে একদিন বা চারদিন কিংবা সপ্তাহে একদিন পরমার্থ চিন্তা করা। তোমার মন একেবারে না লেগে গেলেও, তোমার চেষ্টার ফলে আশা—ঐ দিকে কখনও লাগিয়া যাইতেও পারে। বিষয়ে মন এতটা দিয়াছ, এখন ভগবানের দিকে একটু মন লাগাও। দেখবে ধীরে ধীরে তোমার রাস্তা খুলিয়া যাইতেছে। আবরণ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। উহা নিত্য কিনা! অনিত্য যাহা তাহা বিনাশ হইবেই।'

'যেমন অগ্নির স্বভাব তাপ দেওয়া। অগ্নির নিকট যাইবে আর গরম লাগিবে না, এ তো হয় না। বরফের কাছে যাইবে আর গরম লাগিবে ইহাও হয় না। এইজন্য ভগবানের নাম সর্বনাম সর্বরূপ। ভগবৎ নামেতে পাপ হরণ করে। বলা হয় মানুষ এতপাপ করিতে পারে না যা ভগবৎ নামে দূর হয় না। ঠিক যেমন একটি অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যতটা জ্বালাইতে পারে, ততটা পদার্থ তুমি সংগ্রহও করিতে পার না। ভগবৎ চিন্তন ভগবানের দিকে যাইবার যে

চেষ্টা তাতে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া দিবে। নাশা—নাশ হইবে, স্বরূপ প্রকাশ হইবে। এইজন্য বিষয় বাসনা যাতে তুমি একেবারে ডুবে আছ, তা হতে মুক্ত হবার জন্যই যখন তুমি ভগবানের দিকে লাগিয়া যাইবে তখন তোমার অন্তঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। মন লাগুক আর না লাগুক ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বাঁধিয়া ফেল। মনকে বল, প্রতিদিন এতটা সময় আমি ভগবৎ চিন্তায় দিবই। এবং সেই অনুযায়ী কাজও কর। আশা—যে কখনও মন লাগিয়া যাইবে। আর লাগিয়া থাকেও।

যেমন মহাত্মারা বলে থাকেন, শাস্ত্রও বলে, পরমার্থ চিন্তনের জন্য লাগিয়া যাইবে আর তোমার মিলিবে না এমন কখনও হয় না। চেষ্টা,—অভ্যাস যোগ করে যেতেই হবে। বলে না তাই, 'যতক্ষণ না মিলে চেষ্টা ছাড়া নাই।'

'সত্যস্বরূপ ভগবান ত তোমার মধ্যেই রয়েছেন। তাঁর প্রকাশের জন্যই এইসব ক্রিয়া। আত্মচিন্তা। আপন বস্তু আপনাকে পাওয়ার জন্যই ত সাধন ভজন সবকিছু। আপন চিন্তন, আপন ধ্যান ছাড়া না। আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায় ? ঐ-ই আছেন মাত্র।'

ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন। একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরল ভাষায় মা বলে চলেছেন। সোলনে।

মা আবার বলছেন,—'মানুষ কর্ম পূরণের জন্য জন্ম নেয়। আবার জন্ম পূরণের জন্যও জন্ম নেয়। শক্তিশালী পুরুষ যাঁর মধ্যে ভগবৎ শক্তি প্রকাশিত রয়েছে তিনি নিজের কর্ম নিজেও বদল করতে পারেন। তাইতো এ শরীরটা বলে, ভগবৎ চিন্তা থেকে মনুষ্যজীবনে বড় আর কিছুই নেই।

'কিন্তু এই পথে চলতে হলে যে গুরুর প্রয়োজন ?'

মা বলছেন,—'গুরু ভিতর হতেই হয়। বাইরে কিছুই নেই। সবই অন্তরে। আসল খোঁজ আস্‌লে আসল প্রকাশ হয়। বিনা প্রকাশ ছাড়া যে থাকাই যায় না। তিনিই স্বয়ং গুরুরূপে এসে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দেন। প্রকাশিত হয়ে যান।'

—'আপনার প্রকাশের জন্যই নিজের কল্যাণের দিকে, ভগবানের দিকে যাওয়া। ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজই। তাঁর নাম নিয়ে গুরুশক্তি প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা। গুরুশক্তি থেকেই ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা গুরুশক্তির উপর নির্ভর করে। গুরুশক্তি মহাশক্তি। গুরুশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই দুইক্ষেত্রেই একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ মহাশক্তিই কাজ করে। এই যে ইচ্ছাশক্তি সেটাও বলা যেতে পারে গুরুশক্তি মেনেই। তাহলে

স্বয়ং প্রকাশ দুদিকে। কিন্তু গুরুশক্তি যদি এক হয় তবে আর আলাদা ভাব কোথায়? একজনের কাছে দীক্ষা নিয়ে যে আবার অপরের কাছে কিছু লাভ করলো বলে মনে করে, এখানেও কিন্তু সে একই শক্তির খেলা হতে পারে। কারণ পরে সে যা কিছু লাভ করলো তা যে তার দীক্ষার জন্যই নয় তা কে বলতে পারে? আবার এমনও হয় যে কেউ দীক্ষার পর অপরের নিকট গিয়ে এমন কোনো উপদেশ লাভ করলো যাতে তার গুরু নিষ্ঠাই বেড়ে গেল। এরকম কতই হতে পারে। কাজেই অজ্ঞান অবস্থায় যা ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়, জ্ঞান হলে দেখা যায় তা এক গুরুশক্তিরই কাজ। কাউকে হয়তো দেখলে যে সে সাধন ভজনে উন্নতিলাভ করে এমন একটি অবস্থায় পড়লো, যাতে পরে সে বেশ ঘুরপাক খেতে লাগলো। তখন হয়তো মনে হয় তার জীবনটা বৃথাই গেল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। এই যে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়, তাও কিন্তু গুরুর ইচ্ছায় হচ্ছে। এবং এই অবস্থাও তার দরকার আছে বলেই হচ্ছে। আবার হঠাৎ এক সময় এই অবস্থা থেকেই ইষ্টের সাক্ষাৎকার হয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই বলা হয় যে একবার গুরুর আশ্রয় লাভ করলে তিনি নিরাশ করেন না।

আবার অনেক সময় বলা হয় যে গুরুবাক্য লাভ না করলে কিছু হয় না। সেইজন্য দীক্ষা নেওয়ার অর্থই হোল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। এখানে দীক্ষা নিয়ে সে যে গুরুর আশ্রয় পেয়েছে এই ভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। এবং এই ভাবধারাই তাকে পরমপদ প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে চলে। সাধারণ লোকের মধ্যে জীবভাব প্রবল বলে, সে নিজের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। সে আজ হয়তো মনে করলো যে, সে একটা বিশেষ মন্ত্রলাভ করেছে। এবং তাই তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। কিন্তু কিছুদিন পর তার নিজের উপর অবিশ্বাস আসবে। সে হয়তো তখন মনে করবে যে ঐ মন্ত্র সে নিজেই বেছে নিয়েছে। কাজেই তাতে যে ফল হচ্ছে না তা আর আশ্চর্য কি? এ শরীরটার কাছে এলে এ শরীরটা অনেককে বলে, তাদের—'যে নাম ভাল লাগে সেই নাম যেন তারা করে।' এতে অনেকেই বলে,—'মা, তুমি তো কোন নাম বলিয়া দিতেছ না। আমার নাম যে আমাকেই ঠিক করিতে বলিতেছ। এ থেকেই বুঝা যায় যে, জীবভাবের জন্য লোকের দুর্বলতা সহজে যায় না।'

স্বপ্নের দীক্ষা সম্বন্ধেও কেউ কেউ বলেন যে,—স্বপ্নের দীক্ষা লাভ করলে ঐ দীক্ষা ততক্ষণ কার্যকরী হয় না, যতক্ষণ না ঐ দীক্ষামন্ত্র কোনো জীবিত গুরুর

মুখ থেকে লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গে মা বলছেন: 'এমনও হতে পারে যে, গুরুর নিকটে সাক্ষাৎভাবে দীক্ষা লাভ করলে যে শক্তিলাভ হয়, উহা পূর্ণভাবে স্বপ্নেও হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে কিন্তু একথা বলা চলে না যে, আবার গুরুর মুখ হতে ঐ স্বপ্নের মন্ত্র নিতে হবে। এ দেহ ত কিছুই ফেলতে পারে না। এ দেহ বলি কেন? বাস্তবিক পক্ষে কিছুই মিথ্যা নয়। সবই যে সত্য। সব সত্য বলেই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো নাম জপ করে আবার কেউ কেউ শীঘ্র ফল লাভ করে। আবার কারো বিলম্ব হয়। এই যে শীঘ্র এবং বিলম্ব হওয়া যা কিছু দেখো তা তোমরা কালের মধ্যে আছ বলেই দেখো, তা না হলে শক্তি হিসাবে সবই সমান।'

'তাইতো এ শরীরটা বলে,—লক্ষ্য যখন প্রাণময় হতে থাকবে, যার আবশ্যক আপসে আপ হো যায়েগা। যে যে পথটি ধরে আছো সেই পথেই শুদ্ধভাব পরিপুষ্টি লাভের জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ কর।'

১৮

—'জীব কে? যে বন্ধনে আছে সেই জীব। আর যা গতিমান তাই জগৎ। জীব আর জগৎ মনেরই খেলা। মনকে শুদ্ধ ভোজন দিলে যে স্বাভাবিক গতি আছে, নিজের যে যথার্থ স্বরূপ আছে অর্থাৎ আপনাতে যে আপনি তার প্রকাশ হবে। তুমি গতিতে চল অর্থাৎ স্বভাবে চল। অভাবেত দুঃখ পাচ্ছ। দুনিয়াতে যা কিছু সামগ্রী দেখ—খাওয়া, পান করা, রূপ রস গন্ধ শব্দ ইত্যাদির পিছনে শান্তি পাওয়া যায় না। যদি মন—বাচ্চাকে শান্ত করতে চাও, ত সৎসঙ্গ কর। স্বরূপ প্রকাশের জন্য মহাত্মারা উপদেশ দেন। তাঁকে নিয়েই চল। তা না হলে শান্তি হতে পারে না। যদি এই ছোট্ট মেয়েটার কথা শোনো,—যে দুনিয়ার জিনিসের পিছনে কখনো শান্তি হতে পারে না, তাহলে কি করা উচিত? স্বভাবের গতিতে চলা। অভাবের পূরণ যদি করতে যাও তাহলে অভাব বেড়েই যাবে। মনে কর মোটর গাড়ীর অভাব আছে। মোটর গাড়ীর স্বভাব নষ্ট হওয়া। মোটর গাড়ী পাওয়ার পর থেকে

তুমি পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পার না। কারণ নাশবান জিনিসের থেকে পরম ইষ্টের প্রকাশ হতে পারে না। পরম প্রাপ্তি না হলে পূর্ণ শান্তিও আসতে পারে না। শান্ত না হলে শান্তি আসবে কেমন করে? মন বাচ্চাকে নিয়ে যখন তুমি সেই ভগবৎ গতিতে চলবে, তখনই তুমি স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিত্য নব নব ভগবৎ রস পাবে। কখন পাবে? যখন চলবে তখন। যতটা চলবে ততটা পাবে। ভগবৎ প্রাপ্তিই ত লক্ষ্য। তাঁর স্বভাব, তিনি না দিয়ে থাকতে পারেন না। প্রথম প্রথম ঝাঁকী রূপে দর্শন দেন। তারপর অনুভব রূপেও দর্শন হয়। খণ্ড দর্শনে ব্যাকুলতা বাড়ান। যেমন করবে তেমন পাবে। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ক্রিয়া কর। যতটা করবে ততটাই পাবে। নিরাবরণ দর্শন করার চেষ্টা কর। সাকার আর নিরাকার, জল আর বরফের মত একই। 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়া নাস্তি।' সংযমের বিষযে মানে, ইন্দ্রিয় সংযমের বিষয়ে। যা সংযমিত হলে মন রূপ যে বাচ্চা, সে নিজেকে পাওযার জন্য স্বপ্রকাশে চলবে।'

এবারে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মা বলছেন,—'ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দ ইহা কখনও ত্যাগ হতেই পারে না। পর্দাতে আবরণ রয়েছে শুধুমাত্র। উহা ত স্বয়ং প্রকাশ। নিত্য। কখনও পরিবর্তন হয় না। যা ত্যাগ হবার তাই ত্যাগ হয়।'

প্রথমেই কি সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে, না ভগবৎ অনুরাগের পর এই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়? একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন, 'যেমন যেমন ত্যাগ হতে থাকে অর্থাৎ যতটা ভগবৎ অনুরাগ হয় ততটাই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসে। ভগবানে মন লাগান মানে, ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হওয়া। আর বৈরাগ্য হওয়া মানে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হওয়া আর বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসা এক সঙ্গেই হয়। ত্যাগ হয়ে যায়। ত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না। এই ত্যাগই আসল ত্যাগ। এই ত্যাগে আর অহং বোধই থাকে না। থাকতে পারে না।

এর অর্থ তাহলে প্রথমে আকর্ষণ পরে বৈরাগ্যের উৎপত্তি। তাই নয় কি?—আগে পরে না। ভগবৎ আকর্ষণের সাথে সাথেই বিষয় ত্যাগ হতে থাকে। হয়ে যায়।' প্রত্যুত্তরে মা বললেন। আবার বলছেন মায়া প্রসঙ্গে।

—'যখন হতে ভগবান তখন হতেই মায়া। ভগবান কখন নেই? এই জন্যই বলা হয় মাযাও অনাদি। অন্ত কোথায়? কিসের আকর্ষণ? কার প্রকাশ? বিচার কর। আপন যা তার যখন প্রকাশ হলো, তবে মায়া কার?

নিজেকে পাবার চেষ্টা করা, চাই দাসরূপে। চাই আত্মারূপে। তুমি ত অমৃত। আত্মারাম। জন্ম-মৃত্যুর ভোগ কেন তবে? যেখানে কারো উৎপত্তিই হলো না, ওখানে কি করে বদ্ধ হলো? তাইতো এ শরীরটা বলে, অমৃত, আত্মারামের প্রকাশের জন্য, আবরণ হটাবার জন্য চেষ্টা করা। সাধন করা। নিজের মধ্যেই যে নিজে। এই বোধে আসবার জন্যই ত সাধনা। যেখানে 'আত্মা' সেখানে 'আমি' থাকে কি করে? আবার তোমার মধ্যেই 'আমি' থাকে না। ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্তন রূপে অপরিবর্তন রূপে তিনিই স্বয়ং। আপনাতে সে আপনিই রয়েছে তার প্রকাশের জন্য সব কিছু করা। আবরণ হটাবার চেষ্টা কর। অমরপন্থী হয়ে যাও। অমৃতের পথে চলবার চেষ্টা করা।·· ···তুমি দুর্ব্বল নও, তোমার ভিতরেই সব। ধৈর্য ধরে তাঁর প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা। ঐ লক্ষ্যে নিজেকে জাগ্রত রাখার কেবল চেষ্টা।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন,—প্রার্থনাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কি না?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন,—'যাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, এই প্রার্থনা প্রকাশ হওয়া কঠিন। কারণ প্রারব্ধ ক্ষয় করা সব চাইতে কঠিন।'

যার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে গেছে তারও প্রারব্ধ ভোগ করতে হবে কি?

—'কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে জ্ঞানীরও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। যেমন পাখার সুইচ বন্দ হযে গেলেও খানিকক্ষণ ঘোরে। ঐ পাখা চলাই প্রারব্ধ। আবার কারো কারো মত যে জ্ঞানাগ্নি সব জ্বালাতে পারে আর ঐ প্রারব্ধ জ্বালাতে পারে,না?'

আবার একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন,—আচ্ছা মা মানুষের জীবনের পরম পুরুষার্থ কি?

'—নিজেকে জানবার চেষ্টাই পরম পুরুষার্থ।' মা বললেন! এবারে প্রশ্নকর্তা হাসতে হাসতে বললেন এত বড় প্রশ্নের এত ছোট উত্তর দিলেন মা।

মা'ও হেসে হেসে বললেন,—'দেখ বাবা, বট বৃক্ষটি ত কত বড়। কিন্তু তার বীজ কত বড়? ঐটুর মধ্যেই ত সমস্ত বৃক্ষটি!'

এইভাবে মা ভক্তসনে লীলা করছেন সোলনে। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মা পুরানো দিনের গল্প ও স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। কমলা নেহেরু যখন ডেরাডুনে মা'র কাছে আসতেন, উপাধ্যায়জীও তখন সঙ্গে আসতেন। শ্রীউপাধ্যায়জী এখন পণ্ডিত নেহেরুর

সেক্রেটারী। সেই যুগের ছোটখাট নানা কথা। ঢাকা শাহবাগের নানা লীলাকাহিনী। তারপর অকস্মাৎ একদিন আনন্দময়ী মা সোলনের আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে এলেন কিষণপুর আশ্রমে ১৭ই জুলাই ১৯৫৫ সাল। চতুর্দশীতে গেলেন হরিদ্বার। গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল। মা ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ সহ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন। হরিদ্বার থেকে এলেন দিল্লীর কালকাজীর আশ্রমে। অবস্থান করলেন দুইদিন। মাতৃদর্শন করবান জন্য এলেন দিল্লীর সাধারণ ও বিশিষ্ট ভক্তের দল। সূর্যোদয় থেকে সুরু হোল অখণ্ড নামকীর্তন। লোদী রোড, বিনয় নগর ও গোল মার্কেটের প্রাচীন ভক্তের দল মাতৃনামে বিভোর হয়ে রইলেন।

এইভাবে দিল্লীকে জাগিয়ে মাতিয়ে মা চলে এলেন শ্রীধামবৃন্দাবনে। জন্মাষ্টমীতে গেলেন গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়রের মহারানীর একান্ত আগ্রহে। মহারানী বিজয়ারাজ ভক্তিমতী রমণী। মা অন্ত প্রাণ। গোয়ালিয়রের ভক্তদের নামগানে মাতিয়ে আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবন ধামে। সেখান থেকে শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুরের প্রার্থনায় এসে উপস্থিত হলেন এলাহাবাদে শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুরের আশ্রমে। ওখান থেকে ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে চলে এলেন বারানসী ধামে। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতে শুরু হোল ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব। বৃন্দাবন থেকে পণ্ডিতপ্রবর শুক্রাচার্যজী এসেছেন এই ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। সৎসঙ্গ, ভাগবৎ পাঠ, ধর্মালোচনা চললো সপ্তাহব্যাপী। আধ্যাত্মিক আনন্দ প্রবাহ বয়ে চললো কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমের মধ্য দিয়ে। উৎসবের আলোকমালায় সজ্জিত আনন্দময়ী আশ্রমের প্রতিচ্ছায়া গঙ্গার তরঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগলো। গঙ্গার কলস্বরেও যেন অভিনন্দিত হলো আনন্দময়ী আশ্রমের ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব।

*　　　*　　　*

আগষ্ট মাস ১৯৬০ সাল। শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে আবার কাশীতে এসেছেন। ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় রোজই সন্ধ্যার সময় মায়ের কাছে আসেন। মাঝে মাঝে যোগী শ্রীশ্রীকালিপদ গুহরায়ও আসেন। তিনিও কিছুকাল ধরে কাশীতেই অবস্থান করছেন। গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর বন্ধু। মায়ের সঙ্গে নানা কথা নানা আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত কালীপদ গুহরায় একসময়ে বিপ্লবী ছিলেন। পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হন। বর্তমানে তাঁর অনেক ভক্ত ও শিষ্য আছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ভট্টাচার্যকে তিনিই ভারতের সাধক গ্রন্থ রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন। শ্রীমতী

প্রভাবতী দেবী ও শ্রী রানী চন্দ তাঁর বিশিষ্টা ভক্ত। ভক্তবৃন্দ কালীপদ গুহরায়কে 'দাদা' বলে সম্বোধন করেন। সেদিন ছিল ২২শে আগষ্ট। কালীদা ও লেখিকা রানী চন্দ এসেছেন। আনন্দময়ীমা'র সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। ভাবময়ী আনন্দময়ী মা প্রসঙ্গে কালীপদ গুহরায় বলছেন, —'এই তো কয়েকদিন পূর্বেই মায়ের কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এর মধ্যেই মায়ের ভাবের কত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। মায়ের শরীরের ও ভাবের এমন পরিবর্তন পূর্বে কখনও দেখি নাই।····· মা যেন একখানি 'কবিতা'।

আবার একদিন কথাপ্রসঙ্গে কালীদা বললেন, 'মা বড় সাংঘাতিক— একেবারে বাইন্ধা ফ্যালাইছে।'

যোগীবর শ্রীশ্রীকালীপদ গুহরায় জীবনের শেষভাগে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা'র স্নেহ লাভ করেন। এবং সর্ব্বদাই মায়ের আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই তো দেখা যায় মা কাশীতে এলেই কালীদা মাতৃদর্শনের জন্য ছুটে আসতেন। কাশীর মানসসরোবরের আশ্রম বাড়ীতেই যোগীবর শ্রীশ্রীকালী দাদা অবস্থান করতেন। এখানেই তিনি দেহলীলা সম্বরন করেন।

মা বলেন—'ভগবান-ই তো! সকলের মধ্যেই তো তিনি যেরূপে যখন যাহাকে দর্শন দেন, সবই তো এক।'

১৮

—আমার কান্না কি মায়ের কাছে পৌঁছায় না?

'কেন পৌঁছাবে না বাবা! নিশ্চয়ই পৌঁছায়। এই অশ্রুরূপেও ত তিনিই প্রকাশিত।'

—তবে এ সংসারে এত দুঃখ কেন?

'বাবা! এই সংসারের ত এই-ই রূপ। জগৎ মানেই যা গতিশীল। পরিবর্তনশীল। এই আছে এই নেই—এই-ই ত জগতের রূপ। যার যা স্বরূপ সে তা দেখাবে না? সংসারের স্বরূপই যে দুঃখময়। যা অনিত্য তা ত বিনাশ হবেই। অনিত্যের সংসারে শান্তি কোথায় বাবা? আর মানুষ ত কর্ম-পূরণের জন্যই জন্ম নেয়। তাই তো বলা হয়, বিষয় বাসনার মনকে ভগবৎমুখী

করে তোল। অন্তর্মুখী কর। নাম কর। স্বয়ং তিনিই যে নামরূপে। যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে, সর্বনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ তা প্রকাশ হয়। নিজেকে পাওয়ার জন্যই নিজেকে প্রকাশ করা। সেই বোধে যাওয়া—আমি যে শান্তস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ। এই বোধ না হলে শান্তি কোথায় বাবা!'

শ্রীশ্রীমা সান্তনা দিয়ে বলছেন হাজারীবাগের ভক্ত শ্রীমনোজ রায়ের বৃদ্ধ পিতাকে। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দুইটি উপযুক্ত পুত্রকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছেন। শান্তির জন্য অধীর হয়ে ছুটে এসেছেন মাতৃদর্শনে। রাঁচিতে।

আবার একজন সন্তানহারা জননীকে সান্তনা দিয়ে বলছেন,—'মাগো। মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করতে হয় না। তাতে কখনও কখনও তার অকল্যাণ হয়। এই রকম অনেক ঘটনার কথা শোনা গেছে। তিনিই দেন আবার তিনিই নিয়া নেন। মানুষের আর কি করবার আছে। তাই আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করা।'

আবার বলছেন 'কি আর করবে মা? যাঁর জিনিস তিনিই এই কয়দিন তোমার কাছে রেখে সেবা করিয়ে নিলেন। সেও তোমার কাছ থেকে যে কয়দিন প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করলো। তারপর তিনি নিজের জিনিস নিজেই ফিরিয়ে নিলেন। যখন তোমার কান্না আসবে ভগবানের জন্য কাঁদবে। ইষ্টের জন্য কাঁদবে। তাহলেই শান্তির দিকে যাত্রা।' এই কথা কয়টি বলেই মা নিজের মা থাটি বৃদ্ধা মহিলাটির বুকের মধ্যে রাখলেন।

বৃদ্ধা মা'কে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে হাল্কা হলেন। ধীরে ধীরে মনটিও শান্ত হয়ে এলো।

মা এবারে মাথাটি তুলে বৃদ্ধাকে বোঝাতে লাগলেন।

'দেখ মাগো! আত্মার সদ্‌গতি না হলে সে যে আবার ফিরে আসে এই দুঃখের সংসারে।' এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন।—'বহুদিনের কথা তখন তারাপীঠে থাকা হয়। অনেকেই আসতো। একটি মহিলা তার বছর এগারো বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে রোজই আসতো। তার বড় মেয়েটির বিয়ে স্থির। এমন সময় হঠাৎ মারা গেল। মহিলাটি শোকে কাতর হয়ে শুধুই কান্নাকাটি করতো। পরের বছর আবার যখন তারাপীঠে যাওয়া হোল সেই মহিলাটি কাতর প্রাণে এসে জানালো সেই এগারো বছরের মেয়েটিও মারা গেছে। আর কি কান্না! যেন থামতে চায় না। কোন

সান্ত্বনা বাক্যও যেন শুনতে চায় না। শোক তাপে অধীর।

তার ঠিক এক বৎসর পর আবার যখন তারাপীঠে যাওয়া হয়েছিল, সেই মহিলাটি দেখা করতে এলো কোলে একটি এক মাসের বাচ্চা। তারপর সব ঘটনা বললো। ছোট মেয়েটির জন্য দিন রাত কান্নাকাটি করতে করতে একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো, তার মেয়েটি সমবয়সী অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে মিলে মিশে খেলা করছে। স্থানটি খুব সুন্দর। কিন্তু সে মন দিয়ে খেলা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে। তখন যেন তার কষ্ট বোধ হচ্ছে। আবার একদিন মেয়েটির বাবা স্বপ্ন দেখলো ছোট মেয়েটি বলছে, বাবা! আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। মা ভীষণ কান্নাকাটি করছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। এবার আমি মা'র কোলে চললাম। এই বলেই মেয়েটি শিশুমূর্তিতে রূপান্তরিত হলো। আর সেই শিশুকে তার বাবা মা'র কোলে দিল। ঐ স্বপ্ন দেখবার পরই মহিলাটির গর্ভ সঞ্চার হয়। তার এক বৎসরের মধ্যেই এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হলো। সেই মেয়েকে নিয়েই যে সে এসেছে।'

'তাইতো এ শরীরটা বলে,—মৃত আত্মার জন্য কান্নাকাটি না করতে। তাতে তার আত্মা ব্যথিত হয়, সদ্‌গতি হয় না। স্বস্থানে উঠতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়।'

মায়ের নিকট থেকে অপার শান্তি নিয়ে বউটি ফিরে গেলেন আপন গৃহে।

মা এবারে সমবেত ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন,—'অশান্তি কি? সবই ত মনের ব্যাপার। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি—এই নিয়েই ত সংসার। এসব ত থাকবেই। বিষয় ত বিষ। বিষয়ের মধ্যে থেকে ত আর অখণ্ড শান্তি পাওয়া যায় না। আর মানুষ ত কর্মপূরণের জন্য জন্ম নেয়। জগৎ মানেই ত গতি। আসা-যাওয়া ত আছেই। বুঝ্ ঠিক ঠিক হলে দুঃখই বা কি, আর অশান্তিই বা কোথায়? আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায়?

এই জগতে সবই ত ক্ষণস্থায়ী। এই যে সুখের কথা বলা হয় তাও ত এই আছে এই নেই। তাইতো এই শরীরটা বলে,—নিত্য সুখ অনন্ত সুখ পাওয়ার পথের যাত্রী হও।

আসল কথা নিষ্ঠা চাই। সকল কাজেই ধৈর্য্য সহ্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সাধন ভজন করতে করতে সর্বদাই যদি মনে হয় কি পেলাম? কি হলো?

তাহলে কিছু পাওয়া বা কিছু হওয়া খুবই মুস্কিল। এই দিকে খেয়াল না দিয়ে, সেই দিকে, সেই পথে, নিষ্ঠা নিয়ে চলতে থাকো। তাতে যা পাওয়া, যা হওয়ার ধীরে ধীরে সবই প্রকাশ পাবে।'

এইভাবে মা ভক্তসনে লীলা করে আবার একদিন পথ পরিক্রমায় বের হয়ে পড়লেন। মা'র চরিত্রের বিশেষত্বই হলো মা কোথাও কোনদিন স্থির হয়ে বসেন নি। বসছেনও না। নদীর চলমান জলধারার মত তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভেসে চলেছেন। চির-মুক্ত নিত্য-প্রবহমান যেন! আর বহন করে নিয়ে চলেছেন প্রেম ও শান্তির বাণী। অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ জ্যোতির্ময়ী এই মাতৃমূর্তির মধ্য দিয়ে যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষের মহান অতীতের ধর্ম সাধনার, ত্রিকালদর্শী ঋষিদের প্রবর্তিত নানা যাগযজ্ঞ ধ্যান ধারণা ঈশ্বরানুভূতির সাধনার শেষ বাহক জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। বর্তমানের অবক্ষয়ের যুগের বহির্মুখ জীবের কল্যাণের জন্যই মায়ের এইসব লীলাখেলা। নানা যাগযজ্ঞ উৎসবাদি গীতা ভাগবৎ চণ্ডীপাঠের প্রেরণাদান ছোট বড় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি দুঃখী তাপী মানুষকে অন্তর্মুখীন হওয়ার, সত্যের উপলব্ধিতে পৌছুবার অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন। তিনি যেন দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃস্বরূপ!

মা অবশ্য রহস্য করে বলেন,—'এ শরীরটা কিছুই বলে না। তোমরা যেমন বলাও তেমনি বলে। যা হযে যায়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়ই সব হয়। তা ত জান? যাঁর ভার তিনিই গ্রহণ করেন ত! তবে ইহা মনে করা,— মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে ইষ্টচিন্তায় মন দেওয়া। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য অমৃতগতি নেওয়া। ভগবৎ প্রকাশের জন্যই ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা হয়। যা অক্রিয়া তাই অধর্ম। ধর্ম ত একই।'

৭৫

—'এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এই মুহূর্তে কোন জাগতিক কামনা বাসনা নাই—শুধু এক বাসনা কুম্ভ স্নান। এক লক্ষ্য—যেন কুম্ভে স্নান হয়ে যায় ভালভাবে। এ কি সহজ কথা? এই ভাবনাটুকু লাভ করবার জন্তই সাধনা। স্নান মাহাত্ম্য ও ক্রিয়া মাহাত্ম্যেরও তো একটা ফল আছে। তা ছাড়া যার যার ভাগ্য, কর্মানুসারে ফল প্রাপ্তি। অবশ্য কামনা :বাসনার বীজ ত থেকে যায়ই—পরে প্রকাশ হয়। আবার বারো বছর পর যোগ। কে কী রূপে, কে জানে?'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলছেন ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে হরিদ্বারে। পূর্ণকুম্ভ যোগ উপলক্ষে এসেছেন।

নিরঞ্জনী আখড়ার মোহন্ত এসে মাকে অনুরোধ করলেন তাঁরা মাকে হাতির উপর বসিয়ে শোভাযাত্রা করতে চান। মা সব কিছু শুনে বললেন, —'বাবারা আদর করে ছোট বাচ্চীকে নিয়ে যাবে,—যা হয়ে যায়—এ শরীরটা তো এলোমেলো।'

দেখতে দেখতে চতুর্দ্দিকে মাকে নিয়ে শোভাযাত্রার কথা ছড়িয়ে পড়লো। সকলের মুখেই এক কথা, 'আনন্দময়ী মায়ের জৌলুষ বেরুবে।'

মাকে ঠিক সকাল ৯৷৷০ টায় মোটরে করে আখড়ায় নিয়ে গেল। সম্মুখে সুসজ্জিত বিরাট এক হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতির উপর বসিয়ে এইভাবে আখড়া পদ্ধতিতে মাকে নিয়ে ইতিপূর্বে কোনও শোভাযাত্রা করা হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে হাতির উপরে স্থিত রূপার সিংহাসনে মা বসলেন। সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা অতি সাধারণ সাদা কাপড় পরিহিতা। মাথায় চুলগুলি আলুলায়িতা, গলায় গোলাপ ফুলের মালা। দৃষ্টি শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়। মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা। অপার্থিব সৌন্দর্যের এক প্রতিমূর্তি যেন। ভক্তরা দেখলেন সত্যসত্যই যেন দেবী ভগবতী গজে গমন করছেন।

দেড় মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে সামনের পথে এগিয়ে চললো। মা দুই পাশে সারিবদ্ধ জনতার দিকে হাত জোর করে স্মিত হাসি হাসছিলেন। কুম্ভমেলার হাজার হাজার ভক্ত জনতা আনন্দময়ী মা'র অলৌকিক দেবীমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলো।

আবার এক সময় এই শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটলো নিরঞ্জনী আখড়ার

মহামণ্ডলেশ্বরের আশ্রমে এসে। মা হাতি থেকে নেমে ভক্তপ্রবর মোদীর যজ্ঞস্থানে চলে গেলেন।

আজ কুম্ভের মোক্ষস্নান। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে লক্ষ লক্ষ ভক্ত জনতার ভীড়। স্নানের যোগ আছে বেলা ১২টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। দুপুর বেলা মায়ের অনুমতি নিয়ে অনেকেই স্নানে গেলেন। বিকালে মা হঠাৎ আসন থেকে উঠে বিদ্যুৎবেগে 'বাঘাট-হাউসের' সামনের গঙ্গার ঘাটে নেমে গেলেন। ভক্তরা দেখলেন পাশের শ্মশানঘাটে একটি মৃতদেহ সৎকার হচ্ছে। মৃতদেহটি ছিল সেবক সমিতির প্রধান অধ্যক্ষের স্ত্রীর। গোধূলি বেলা—কুম্ভযোগ—গঙ্গাতট—মায়ের সান্নিধ্য, অপূর্ব সমাবেশ। পুণ্যাত্মা মহিলা তাই মাকে টেনে এনেছেন। মা উপস্থিত সকলকেই 'হরে কৃষ্ণ' নাম করতে বললেন। তাঁরা সকলেই মায়ের আদেশ মত 'হরে কৃষ্ণ' নাম করতে করতে সৎকার কার্য্য সমাপন করলেন। সন্ধ্যা ৭টায়—ভক্তবৃন্দ মায়ের অনুমতি নিয়ে গঙ্গাস্নান করে এলেন। রাত্রি দশটার পূর্বে মা হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন এবং ব্রহ্মকুণ্ডের বিপরীত দিকের ঘাটে এসে গঙ্গার জল স্পর্শ করলেন। এবং ফিরে এসে ভক্তদের মাথায় কুম্ভের জল ছিটিয়ে দিলেন। ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন: -'শ্রেয় গ্রহণ প্রেয় ত্যাগ। নির্ভর করতে পারলেই তো খোলা রাস্তা। যে বন্ধনে, বন্ধন কাটে, সেই বন্ধনই গ্রহণীয়। ভগবান লাভের বাসনাকে বন্ধনের কারণ বলে না। জাগতিক কর্মের অনিচ্ছার ভিতর যদি ভগবৎ প্রাপ্তি কর্ম ইচ্ছা থাকে তবে তা বন্ধনের কারণ হয় না। কাজেই ভগবৎ কর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন।

গায়ত্রী উচ্চারণ, আহুতি, জপধ্যান, সৎসঙ্গ অনুকূল ক্রিয়ায় নিজেদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার কর্মাদি যার যা সঞ্চিত আছে তা ধুয়ে মুছে নিজেতে নিজে যা অন্তর্হিত আছে—প্রজ্জলিত সতেজ স্বরূপ প্রদীপের মত তার নিরাবরণ উদ্‌ঘাটনই যে লক্ষ্য। অর্থাৎ আবরণ সরানো। তাইতো এ শরীরটা বলে, মনকে পবিত্র রাখে যে ক্রিয়া—সেই ক্রিয়া করা। অনাদৃত-ভাবে যেন কোনো ক্রিয়া না হয়, কারণ অনুষ্ঠান রূপে তিনিই স্বয়ং এসেছেন।'

হরিদ্বার কুম্ভমেলার লীলা সমাপন করে মা চলে এলেন ডেরাডুনে। কিষনপুর আশ্রমে। আজ পূর্ণিমা। মা আমগাছের নীচে নূতন বেদীর উপরে বসে আছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশটিও মনোরম। মধুর কণ্ঠে মা গান ধরলেন:

দুর্লভ ভজন হেন
নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্দে।
ছাড অন্য ক্রিয়া কর্ম,
নাহি দেখ বেদ ধর্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ দ্বন্দ্বে॥

*　　　*　　　*

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত। হয়ে মা গানশেষে বলছেন,—'তাঁকে ডাকবার জন্য তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগছে, যদিও তুমি তা বুঝতে পারছো না। এই অবস্থায় মনকে জাগাতে হয়। মনকে জাগানো মানে,—সর্বদাই তাঁর চিন্তা, নামগান, ধ্যান, সৎসঙ্গ করা! মনের খোরাক ভগবৎ চিন্তার মাধ্যমে দেওয়া। তাঁকে ডাকা কেন? নিজের জন্যেই ত। ত্রিতাপের জ্বালায দিন দিন মবে বেঁচে জীব যখন অস্থির হয়ে পড়ে, তখনই তাঁকে ডাকা। সাধ করে কযজনে ভগবানকে ডাকে? প্রথম প্রথম ডাকগুলি দুঃখেই অনেকের বের হয। ডাকতে ডাকতে যখন এক আধটু সাড়া মিলে, তখনই ডাকতে আনন্দ লাগে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সংসার প্রবাহে চলতে চলতে তাঁকে ডাকবার চেষ্টা কর, তাহলে আর নিরানন্দের তাডনায় জীবন ভযাবহ হয়ে উঠবে না।'

এবার মায়ের জন্মোৎসব ডেরাডুন-কিষনপুর আশ্রমেই সম্পন্ন হবে। দূর-দূরান্ত থেকে আসছেন ভক্তবৃন্দ সপরিবারে। আর আসছেন নিমন্ত্রিত সাধু সন্ন্যাসীরা। হরিদ্বার থেকে মহামণ্ডলেশ্বর মহেশ্বরানন্দজী, হৃষীকেশ থেকে স্বামী শরণানন্দজী, চক্রপাণিজী, শুকতাল থেকে বিষ্ণু আশ্রম, তাছাড়া পাঞ্জাবের শ্রীশ্রীহরিবাবা গঙ্গোত্রীর কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীও আসছেন। আনন্দময়ী মা'র জন্মোৎসবকে উপলক্ষ ক'রে ডেরাডুন শহর ধীরে ধীরে মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে লাগলো।

একদিন এলেন জওহরলাল নেহেরুজী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও পদ্মজা নাইডু। একান্তে প্রায কুড়ি পঁচিশ মিনিট মায়ের সঙ্গে কথা হলো।

যোগেশ ব্রহ্মচারী জওহরলালজীর গলায় শিবের প্রসাদী মালা পড়িয়ে দিলেন। মা জওহরলালের হাতে একটি লাল রংয়ের গোলাপ ফুল দিলেন।

আবার একদিন মা আনন্দময়ী ডেরাডুনের লীলা সাঙ্গ করে পথে বের হয়ে পড়লেন।

জন্মাষ্টমীর সময় মা এলেন হরিদ্বার কনখলে। হরিদ্বারে ভোলাগিরি আশ্রমে এসে দর্শন দিলেন শ্রীশ্রীভোলাগিরির শিষ্য শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ গিরিকে। তিনি খুবই অসুস্থ। মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। নিদ্রা ও আহার বন্ধ হয়ে গেছে।

করুণাময়ী মায়ের করুণার ত সীমা নাই। অনেকক্ষণ মহাদেবানন্দ গিরির কাছে রইলেন, তারপর অধিক রাত্রিতেই কনখলের আশ্রমে ফিরলেন।

জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার একটু পরেই, মা ভাবানন্দে বিভোর হযে কৃষ্ণ কীর্তন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ !

*　　　*　　　*

আজ যেন তিনি মহাভাবময়ী রাধাভাবে সেই কৃষ্ণ বিরহে জর জর হচ্ছেন। প্রাণের আবেগ আর যেন চেপে রাখতে পারছেন না। রাধা বিরহের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন আমাদের এই মা আনন্দময়ী। বিরহে অন্তরে অন্তরে যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারছেন না। শুধু তাঁর ভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হচ্ছেন।

আশ্রমের মেয়েরা মা'কে বেনারসী শাড়ী পরিয়ে গলায় ১০৮ শ্বেত পদ্মের মালা দিয়ে পূজার বেদীতে বসিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দ পূজা আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ ও ব্রহ্মচারী ভাস্কর ভাগবৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অধ্যায়টি পাঠ করলেন।

ব্রজধামের সেই মধুর ভাবের এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো। হরির রূপ লীলামাধুরী বর্ণনাতীত ও মধুর। হরি ব্রজধামে পূর্ণতম রূপে বিরাজ করছেন। ভাবানন্দে বিভোর নয়, মা যেন শ্রীহরির সেই লীলারসমাধুর্য্যে মগ্ন হয়ে রয়েছেন আর মনে মনে বলছেন,

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ　　তাহে মন সতৃষ্ণ
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লইয়া।
রসিক ভকত সঙ্গে,　　রহিব পিরীতি রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া॥

*　　　*　　　*

১৮

শ্রীশ্রীমা এখন দিল্লীতে। কালকাজীর আশ্রমে। জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি বিদেশ সফর করে ফিরেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর হাত দিয়ে কিছু ফল পাঠিয়েছেন মা'কে দেবার জন্য। ইন্দিরা গান্ধী ফল নিয়ে এসেছেন, মায়ের ঘরে দোতলায় একান্তে কথা বলছেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা হলো।*

পরে কথা প্রসঙ্গে মা ভক্তদের ইন্দিরার জননী কমলা নেহেরুর কথা বললেন। ডেরাডুনে যখন মা প্রথম ঢাকা হতে আসেন ও আনন্দচকে থাকতেন তখন কমলা নেহেরু মায়ের কাছে খুবই যাতয়াত করতেন। মায়ের ভাষায়,—'তাঁহার ধ্যান খুব জমিয়া যাইত এবং এ শরীরকে বলিয়াছিলেন যে ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। এ শরীরের কাছে বসেও ধ্যান করতেন। এক একদিন ধ্যান এমন জমিয়া যাইত যে বৃষ্টি পড়িতেছে হুঁস্ নাই। রাত্রে এ শরীরের কাছেই মাটিতে শুইতেন। হাতে ঘড়ি থাকিত, ঠিক ভোর পাঁচটায় উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। আবার এক একদিন নেহেরুর জন্য টিফিন কেরিয়ারে খাবারও নিয়া আসিতেন। পণ্ডিত নেহেরু তখন ডেরাডুন জেলে ছিলেন। ঠিক সময়ে চলিয়া যাইতেন নেহেরুকে খাওয়াইতে।

অসুস্থ অবস্থায় ভাওয়ালীতে ছিলেন। এ শরীর আলমোড়া যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নামে। নার্স শরীরের দুর্বলতার জন্য দেখা করতে বাধা দেওয়ায় কমলা নেহেরু বলেছিলেন,—'মায়ের সঙ্গে দেখা না হইলে আমার শরীর আরও খারাপ হইবে।'

আলমোড়া থেকে ফিরবার সময়ও এ শরীর ভাওয়ালী হইয়া আসিল। সে বার-ই শেষ দেখা। মৃত্যুর পূর্বে, এ শরীরের দেওয়া হাতের বালা ইন্দিরাকে দিয়া যান।'

ভক্তপ্রবর মোদী'র স্ত্রীর গোপাল বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আশ্রমে হোল। সেই উপলক্ষে বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। দুপুরে ইন্দিরা গান্ধীও এসেছেন।

* লেখক ঐ সময় দিল্লী কালকাজী আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের কথোপকথন জানা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালেও মা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল প্রকাশ করেন নি।

যত কিছু মান অভিমান ॥
যদি দেখা দাও মোরে ভালবেসে
এসো গহনতম ঘন দুখের বেশে
ব্যথার কাজলে আঁখি ভরিয়া দিও
সকল ভুবন মোর হরিয়া নিও,
নিবিড় করিয়া মোরে বাঁধিয়ো প্রিয়
তব প্রাণ সাথে মম প্রাণ ॥

*　　　●　　　*

শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত ভাবপূর্ণ আকুল প্রাণের সঙ্গীত শুনে সকলেই মুগ্ধ হলেন। অসুস্থ গুরুপ্রিয়া দেবীর মনও প্রসন্ন হলো। গুরুপ্রিয়া দেবীর বিমল আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করে শ্রীশ্রীমা'ও আনন্দিত হলেন।

অবশেষে শুরু হোল সান্ধ্যকীর্তন। কন্যাপীঠের মেয়েরাও যোগ দিল। ভজন কীর্তন ও শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে অনির্বচনীয় অধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হোল।

অধিক রাত্রিতেই মা আবার ফিরে গেলেন কিষণপুর আশ্রমে। কিষণপুর আশ্রমে ভক্তদের ভীড়, তাই মায়ের নির্দেশে অসুস্থ গুরুপ্রিয়া দেবীকে কল্যাণ-বনের নির্জন স্থানে শান্তভাবে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরুপ্রিয়া দেবীর অসুস্থ শরীরও মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। হরিদ্বার-হৃষিকেষ যাওয়ার সময় মা গুরুপ্রিয়া দেবীকে কিশনপুর আশ্রমে স্বামী পরমানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে রেখে গেলেন। মা গুরুপ্রিয়া দেবীকেসুস্থ হয়ে উঠবার কৌশল সম্বন্ধে বললেন, '—দিদি, ডাক্তাররা যা করিতেছে করুক। তোমার এখন থেকে এই এই করিতে হইবে' বলেই আঙ্গুলে কর গুণে গুণে বললেন : 'এক: হাওয়া। দুই : খাওয়া। তিন : ফল। চার : জল। পাঁচ : মৌন। ছয় : বিশ্রাম। এই ছয়টা কাজ করিতে হইবে। দরজা খোলা থাকিবে। হাওয়া খাইবে। আর কিছু খাইতে পারি না বলিলে চলিবে না। জোর করিয়া যা পার খাইতেই হইবে। ফল খাইবে। মৌন থাকিবে। যতটা পার বারে বারে জল খাওয়া। মধ্যাহ্নে খাওয়ার পর ও রাত্রিতে দশটার পর ঘর খালি করিয়া বিশ্রাম করিবে। এই নিয়মে চলিলে ঔষধে কাজ হইবে। বিশ্রাম ও সংযম একান্ত দরকার। বিশ্রাম ও সংযম না করিয়া শুধু ঔষধ খাইলেই কি কাজ হয়?'

মা এইভাবে ভক্তসনে লীলা করে হরিদ্বারের পথে যাত্রা করলেন। মায়ের প্রতিটি ব্যাপারেই লক্ষ্য আছে। এবং ছোট বড় প্রতিটি ভক্তের প্রতি করুণার কথা চিন্তা করে গুরুপ্রিয়া দেবীর চোখের পাতা দুটি বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটায় ভিজে উঠলো। মা সম্মুখে নেই কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠলো আনন্দময়ী মা'র করুণা মাখা মুখচ্ছবি। আর ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সেই কথাগুলি ঃ

*   *   *

যদি দেখা দাও মোরে ভালবেসে
এসো গহণতম ঘন দুখের বেশে
ব্যথার কাজলে আঁখি ভরিয়া দিও
সকল ভুবন মোর হরিয়া নিও,
নিবিড় করিয়া মোরে বাঁধিয়ো প্রিয়
তব প্রাণ সাথে মম প্রাণ॥

সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। ইংরাজী ১৯৭৫ সাল। শ্রীশ্রীমা এখন আশী বৎসরে পদার্পণ করেছেন। কলকাতা আগরপাড়া আশ্রমে ভক্ত-বৃন্দরা মিলিত হয়ে মায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব পালনের উৎসাহে মেতে উঠেছেন। এই মহোৎসব পরিচালনার দায়িত্ব যিনি হাসিমুখে গ্রহণ করে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করলেন তিনি হলেন আশ্রমেরই সন্ন্যাসী স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ। আর মায়ের স্নেহধন্য পণ্ডিতপ্রবর যোগী পুরুষ শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ধর্মীয় যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করছেন। হাজার হাজার মানুষের মেলায় সকাল সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠেছে। আলো ঝলমল করে বিশাল প্যাণ্ডেলে, আশ্রম বাড়ীতে আর জল টলমল করে গঙ্গা নদীতে। আগড়পাড়া গঙ্গার তীরেই আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম বাড়ী। আনন্দময়ী জয়ন্তী মহোৎসবকে উপলক্ষ করে বসে গেছে আনন্দের হাট। ভক্তকণ্ঠের হরিনাম গানে ও শতশত

মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। শুরু হোল কৃষ্ণকীর্তন। ভক্তিমতী পুষ্প সুমিষ্ট কণ্ঠে গান করলেন। গান শুনে সকলেই তৃপ্ত হলেন। ইন্দিরা গান্ধীও মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর নিজ ভবনে পুষ্পর কণ্ঠনিসৃত ভজন গান শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা'ও সম্মতি জানালেন। সেই কথা অনুসারে ভক্তিমতী পুষ্প, শান্তা ও কমল একদিন ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ীতে গিয়ে গান শুনিয়ে এলেন। পুষ্পর সুমিষ্ট কণ্ঠের ভজন শুনে পরিতৃপ্ত হলেন ইন্দিরা গান্ধী। আবার একদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ভবনে মা'কে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত। তাঁর অনুরোধ রক্ষার জন্য মা এলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। বেলা ১১টায়। সঙ্গে এলেন গুরুপ্রিয়া দেবী, পুষ্প ও কমল। মায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ নিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল। অবশেষে পুষ্প মধুর কণ্ঠে দু'খানি ভজন করলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে ও ভজন গান শুনে তৃপ্ত হলেন।

বৈকালে 'রেহানা মা'—আশ্রমে এলেন। রেহানা মা মুসলমান, কিন্তু কৃষ্ণ সাধিকা। তাঁর লেখা গ্রন্থ হলো 'Heart of Gopi'। সঙ্গীত সাধক দিলীপ রায়ের 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' গানটি এই গ্রন্থের ভাবমূর্তিরই একটি গীতচ্ছবি।

ইনি মুসলমান হয়েও ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণকীর্তন, ভজন করতে ভালবাসতেন। গানের গলাও মিষ্টি। বিবাহের পর এসব হিন্দু ভজন কীর্তন বন্ধ করতে হবে। এই শর্ত মানতে ইনি রাজী হলেন না। এবং জীবনে বিবাহই করলেন না। এখন বয়স হয়েছে। গান্ধীজীর সঙ্গে সাত আট বৎসর অতিবাহিত করেন। কমলা নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু, যমুনালাল বাজাজ, গান্ধীজী এঁকে যেমন স্নেহ করতেন আবার আদর্শের জন্য শ্রদ্ধাও করতেন। পণ্ডিত নেহেরুর পরিবারের ইনি একজন হিতৈষী। মায়ের সঙ্গে রেহানা মা'র দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয় পূর্বেই হয়েছে। আজ এসেছেন জওহরলালজী ও ইন্দিরার শরীর রক্ষার জন্য—'মহামৃত্যুঞ্জয়-জপ' করবার অনুমতি প্রার্থনা করতে। মা বললেন, 'এ তো ভাল কথা, তবে এর প্রেরণা এসেছে স্বর্গগতা কমলা নেহেরুর নিকট থেকে। পণ্ডিতজীর ঘরেই মহামৃত্যুঞ্জয় জপ হওয়া দরকার। তবে পিতাজী কি বলেন? প্রত্যুত্তরে রেহানা মা বললেন,—'মা'কা আদেশ পণ্ডিতজী জরুর মানলেঙ্গে।' আবার বললেন,—

'মা, তোমার উপর এই মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইবার ভার দিয়া আমি মুক্ত। কারণ কমলার খাস্ মা তো তুমি। তুমি যা বল্‌বে তাই হবে।'

প্রত্যুত্তরে মা বললেন,—'এ শরীর তো সৎ ও শুভ অনুষ্ঠান যদি কেউ করতে চায় তা করতেই বলে। আদেশের আবার কি প্রশ্ন?'

এই মহামৃত্যুঞ্জয় জপের প্রসঙ্গ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী আবার আশ্রমে এলেন। মায়ের সঙ্গে একান্তে অনেক কথা হোল। পণ্ডিত নেহেরুর শরীর ভাল যাচ্ছে না, খুবই পরিশ্রম করেন, বিশ্রাম নিতে চান না। এ অনুযোগও মায়ের কাছে করলেন ইন্দিরা গান্ধী।

• • •

অকস্মাৎ মায়ের যাত্রা হোল শুরু জয়পুরের পথে। জয়পুরের ভক্ত শ্রীযুত মদমমোহন বর্মার একান্ত অনুরোধে জয়পুরে পদার্পণ করলেন। এখানে এসে প্রথমেই গেলেন বিখ্যাত গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনে। গোবিন্দজীর মন্দিরে গোবিন্দজীকে দর্শন করতে করতে ভক্তদের বললেন,—'বহুবৎসর পূর্বে প্রথমবার স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে এ শরীরটা গোবিন্দজীকে দেখলো, গোবিন্দজী মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাধা, সখীবৃন্দ এসব কিছুই নেই। গোবিন্দের এমন রাজবেশ ছিল না, সাধারণ মানুষের মত কাপড় পরা।' মা সে সময় সূক্ষ্মে গোবিন্দজীর ঐ মূর্তিই নয়নগোচর করেছিলেন।

জয়পুরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে মা ভক্তবৃন্দসহ এলেন ইন্দিরা গান্ধীর মাসী শ্রীমতী কাটজুর গৃহে। মহীশূরের প্রথমা রাণীর ভবনে ও আছরোলের রাজবাড়ীতে। এইভাবে জয়পুরে বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গে লীলা করে মা আবার ফিরে এলেন দিল্লীতে।

কালকাজীর আশ্রমে মা এসেছেন শুনে ইন্দিরা গান্ধী মাকে টেলিফোনে জানালেন তিনি আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করবেন। তারপর ছোটছেলে সঞ্জয়কে নিয়ে আশ্রমে এলেন। সঙ্গে আরও এলেন বিমলা সিন্ধী, উপাধ্যায়জী ও ইন্দিরার এক বন্ধু। সকলেই আনন্দ করে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ক্ষীর প্রসাদ ও বাঙ্গালী রান্না ইন্দিরাজীর এখন খুবই প্রিয়। আনন্দময়ী মা'র কাছে ইন্দিরা গান্ধীর ত ঘরোয়া ভাব। যেন মা আর মেয়ে।

আবার একদিন পণ্ডিত নেহেরুর অনুরোধে মা আনন্দময়ী গেলেন তাঁর ভবনে। বিমলা সিন্ধী এসে মা'কে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন গুরুপ্রিয়া-দেবী, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, পুষ্প ও চিত্রা। নেহেরুজীর ভবনের সৌম্য শান্ত এক পরিবেশে, ফুল বাগিচায় মায়ের বসবার ব্যবস্থা হোল। পণ্ডিত নেহেরু

ও ইন্দিরা গান্ধী মায়ের পদতলে এসে বসলেন। সে এক অনির্বচনীয় পরিবেশ। ভারতমাতার প্রতীক শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পদতলে বসে, ভারত-মাতার সন্তান—ভারতের কর্ণধার জওহরলাল নেহেরু আধ্যাত্মিক গুরুর মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করছেন। মা'র গলায় একটি চন্দনের মালা ছিল মা সেটি জওহরলালজীর গলায় পরিয়ে দিলেন। মায়ের কাছে সে সময় জওহরলালজী ও ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। একান্তে প্রায় আধঘন্টা কথা হোল। (মায়ের সঙ্গে জওহরলালজীর কি কথা হোল মা কাউকে বললেন না। পরবর্তী কালেও বলেন নি।) তবে একথা সত্য জওহরলাল নেহেরু জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন এবং একান্তে মায়ের সঙ্গে কথা বলে পরমতৃপ্তি ও প্রশান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন। শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে জওহরলালজীর পরিচয়ের মাধ্যম ছিলেন কমলা নেহেরু। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র আধ্যাত্মিক জীবনের লীলা-কথা কমলা নেহেরুই প্রথম মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নিকট বলেন। জওহরলাল নেহেরুর মাতা স্বরূপরাণীও আনন্দময়ী মাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ইন্দিরা গান্ধীকেও শ্রীশ্রীমা নিজ কন্যার মতই স্নেহ করেন। এবং সর্বাঙ্গীন কল্যানের জন্য মা তাঁকে একটি রুদ্রাক্ষের মালাও দিয়েছেন।

স্বরূপরাণী প্রসঙ্গে মা বলেন,'স্বরূপরাণী এ শরীরের কাছে ডেরাডুনে আসত। প্রণাম করতে মাথা নোয়াইলে সে বহুক্ষণ ঐ ভাবেই থাকিত। একেবারে স্থির অটল পাথরের মত। নাড়াইলেও নড়িত না। খুব ভক্তিভাব ছিল।'

সকাল গেল দুপুর গেল ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। কালকাজী আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে শুরু হোল নাম-যজ্ঞ। কৃষ্ণগুণগান, নাম-গান।

গোপাল বল, গোবিন্দ বল,
রাধা রমণ হরি, গোবিন্দ বল॥

* * *

'হরি হরি বলি' দাও করতালি
বাসনা বিহঙ্গ সব যাবে চলি।
নিশ্চল মনে মাত বিভূ ধ্যানে
পাইবে পরমানন্দ হরি গুণ গানে॥

৫৫

'সংসার যাত্রায় সকলেরই মর্মান্তিক বেদনা স্বাভাবিক ! বিধির বিধান যাহা। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে স্থির ধীর ভাবে সন্তানের কর্তব্য যাহা সৎপরিবেশে করার চেষ্টা। পরমার্থ রাস্তা বিনা মানুষের শান্তি নাই।'

একজন বিশিষ্ট ভক্তের মৃত্যু প্রসঙ্গে মা তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। বৃন্দাবন ধামে। মা দোল-উৎসব উপলক্ষে বৃন্দাবন ধামে এসেছেন। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ। ১লা মার্চ থেকে শুরু হোল ভাগবৎ সপ্তাহ। চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা অর্পণাদেবী স্বর্গগত স্বামীর কল্যাণার্থে এই ভাগবৎ সপ্তাহ করাচ্ছেন। মা'র শরীর বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু ভাগবৎ পাঠের সময় ও সৎসঙ্গে মা যথারীতি উপস্থিত থাকছেন। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন। দিল্লী থেকে এসেছেন প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ রায়। তিনি বৈদ্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিজেই কালীপূজা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মা মত দিলেন না। মা বললেন, 'কালীপূজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী করতে হলে ব্রাহ্মণ শরীর দিয়ে করানোই ভাল'।*

মা'র শরীর ভাল না থাকাতে মা এবার হোলিতে রং খেললেন না। তবে বাইরে থেকে অনেক মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ এসেছিলেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা সকাল ৭টায় আশ্রমে এসে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে মা'র নির্দেশমত তুলসী-বেদিতে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর কীর্তন শুরু হোল হলঘরে। গৌর কীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন।

জয় গোবিন্দ জয় গোপাল
কেশব মাধব দীন দয়াল।
প্রাণ গোবিন্দ প্রাণ গোপাল,
কেশব মাধব দীন দয়াল।

*　　　*　　　*

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম মদন মোহন ॥

*　　　•

---

* লেখক ঐ সময় বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন।

গুরু কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥

*   *   *

এই ভাবে মা বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন কসৌলীতে। ভক্তবৃন্দ ও কসৌলীর রাজার বিশেষ আগ্রহে মা এসেছেন। অবস্থান করছেন মদনমোহনের স্থানে। সঙ্গে শ্রীশ্রীহরিবাবাও রয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে কসৌলীর আকাশ বাতাস নাম-গানে মেতে উঠলো। মা যেখানেই যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে হরি নাম বিলোচ্ছেন। বলছেন, 'সর্বাবস্থায়ই নাম স্মরণীয়। সংসারের ত এই রূপ, শোক দুঃখ ছাড়া কই। জীবজগতে মানুষের এই দুর্ভোগে সহ্য-ধৈর্যের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় কি! তাইতো এ শরীরটা বলে 'নাম করা', 'নাম'কেই সার কর। মানুষেরই কর্ম ভগবানকে চিন্তনীয়।' আবার বলছেন,

'বেলা যে গেল! একটা কিছু করো। অনেক রাস্তা যেতে হবে। নাম কর। নাম কর। নামেই সব কিছু। যে নাম ভাল লাগে সেই নামই কর। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকো। নাম কীর্তন মানেই তাঁকে ডাকা। ভগবানে ডুবে যাওয়া।'

মন্‌মে হরিকা নাম
হাতমে দুনিয়াকা কাম
ইসসেই মিলেগি পরমাত্মা রাম ॥

সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা'র কথামৃত পান করে রাজাসাহেব ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হলেন। মা শুধু বাণী দিচ্ছেন না, সকলের সঙ্গেই শিশুর মত মা, বাবা ডেকে কথা বলছেন, আনন্দ দিচ্ছেন। মা এখানে হিন্দী ভাষাতেই কথা বলছেন। মা শুদ্ধ হিন্দী ও উর্দু মিশ্রিত হিন্দীতেও পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারেন। পাঞ্জাবী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবার সময় মা উর্দুমিশ্রিত হিন্দীতে কথা বলেন। মা কসৌলীতে পাঁচদিন অবস্থান করে আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবন ধামে।

আবার শুরু হোল মায়ের পথ পরিক্রমা।

মা বৃন্দাবন ধাম থেকে দিল্লী হয়ে হরিদ্বারের পথে যাত্রা করলেন। ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৩ সন। দিল্লীতে এসে জওহরলালজীর অনুরোধে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ। মায়ের সঙ্গে জওহরলালজীর একান্তে অনেকক্ষণ কথা হলো। জওহরলাল নেহেরু এখন ভারতের প্রধান-

মন্ত্রী। স্বাধীনচেতা মানুষ, মনের সব কথা খোলাখুলিভাবে কাউকে বলতে পারেন না। কিন্তু তিনি আনন্দময়ী মায়ের উপর খুবই নির্ভরশীল। মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলে তিনি আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে কথা বলে শান্তি লাভ করেন। মনে হয় আত্যন্তিক শান্তিলাভের জন্যই তিনি আনন্দময়ী মা'র নিকট আসেন। কথা বলেন। মাকে তিনি গুরুর মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন,—'আপকো দেখনেসে মেরা মন্ বড়া খুশ হোতা হয়।'

হরিদ্বারে মা'র সঙ্গে গেলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ, পুষ্প, ক্ষমা ও শান্তা। মা হরিদ্বারে এসেই প্রথমে কংখলে গেলেন, পরে সেখান থেকে 'বাঘাট হাউসে' আসেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত (I. C. S) মা'কে দর্শন করবার জন্য হরিদ্বারে এসেছেন। আরও কলকাতার বিশিষ্ট ভক্ত এ্যাডভোকেট শ্রীঅনিল গাঙ্গুলী ও তাঁর স্ত্রী সতীদেবীও এসেছেন। ডেনিস ও তাঁর কন্যা ত অনেকদিন ধরেই মা'র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন।

মা হরিদ্বার কনখলের লীলা সাঙ্গ করে ডেরাডুন হয়ে আবার যাত্রা করলেন দিল্লীর পথে। আবার একদিন কলকাতার ভক্তদের অনুরোধে দিল্লী থেকে কলকাতার পথে চললেন। কলকাতা থেকে এলেন রাঁচীতে। ৭ই জুন রাঁচীতে শিবমন্দির ও গোপাল প্রতিষ্ঠা হবে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে ঘিরে রাঁচীতে বসে গেল আনন্দের হাট। জামসেদপুর থেকে এলো কীর্তনের পার্টি। নাম-গানে কৃষ্ণকীর্তনে রাঁচীর আকাশ বাতাস মেতে উঠলো। ভক্তবৃন্দের হৃদয় নেচে উঠলো। মা'ও কীর্তনে মেতে রইলেন। ৭ই জুন মেয়েরা সমস্ত রাত্রি ধরে কীর্তন করলো। অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী তিন দিন ধরে রামায়ণ পাঠ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। শ্রীশ্রীহরিবাবাও এই আনন্দ উৎসবে মেতে রয়েছেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা পাঞ্জাবের সাধু। গৌরাঙ্গ ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীমা'কে গৌরাঙ্গের ছদ্মরূপ বলে মনে করেন। শ্রীগৌরসুন্দরই আনন্দময়ী মা'র দেহ ধারণ করে দুঃখী তাপী মানুষের মধ্যে হরিনাম বিলোচ্ছেন। মা'কে তিনি খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। সুমধুর কণ্ঠে কীর্তন করছেন কলকাতার শ্রীমতী ছবি ব্যানার্জি। মা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গান ধরলেন,

ধর লও ধর লও লও হে কিশোরী রাই,
নিতাই ডাকে আয় আয়

গৌর ডাকে আয় আয়
পার ভাঙ্গিয়া ঢেউ লাগিল
গোরাচাঁদের গায়
প্রকট হয়ে প্রকট লীলা করে
গোরা রায় রে,
অভিমানে সুন্দর
নিমাই ঘুরে নদীয়ায় রে ॥

তখন মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গায়িকা মেয়েরাও গান করতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সেই মধুর সঙ্গীত মুগ্ধ চিত্তে শুনতে লাগলেন।

এই ভাবে মা সমস্ত রাত্রি ধরে ভক্তসনে লীলা করলেন। সকালে শত শত দর্শনার্থীর ভিড়। মাকে শুধু দর্শন করেই ভক্তরা শান্তিলাভ করছে। মাতৃদর্শনে তাদের মনে যেন এক অপূর্ব মধুর প্রশান্তি এনে দিচ্ছে। মা ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন,—'এ সংসারে সকলেই ত শান্তি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু একথা খুব কম লোকেই ভাবে 'তিনি' হৃদয়ে না জাগলে পূর্ণ শান্তি কিছুতেই পাওয়া যায় না। ধনে, পুত্র-পরিজনে, প্রতিষ্ঠালাভেও শান্তি হয় না। কারণ সংসারিক ভোগমাত্রই পরিবর্তনশীল। আসতে আসতে চলে যায়। তাইতো এ শরীরটা বলে. যে ধন পেলে সকল আকাঙ্ক্ষা একেবারেই মিটে যায়, সে ধন প্রাপ্তির চেষ্টা করা। সে ধন হোল ভগবান। যিনি সকলের হৃদযে থেকেও অপরিচিত রয়েছেন। তাঁকেই জানা। চিত্তের অন্ধকার দূর না হলে ত তাঁর মোহনরূপ ফুটে উঠবে না। তার জন্যই চাই সাধন ভজন প্রার্থনা। নামকীর্তন, নাম ভজনও ত সাধনা। নাম কর। নাম কর। নাম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। হেলায় শ্রদ্ধায় নাম কর। নামে রুচি হবেই। তখন নাম নিয়মিত করতে পারবে। নামই তোমায় নাম করবার শক্তি দেবে। তাঁর কৃপালাভ করে অখণ্ড শান্তিলাভ করবে।'

মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতনিস্যন্দী বাণী শুনে ভক্তবৃন্দ তৃপ্ত হলেন। আনন্দদায়িনী মা আনন্দময়ী আধ্যাত্মিক আনন্দ বিতরণের জন্যই যেন দেশে দেশে নগরে নগরে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভেসে চলেছেন।

রাঁচী থেকে মা এলেন পাটনায়। ভক্তপ্রবর শম্ভুবাবুর বাড়ীতে উঠলেন। পাটনায়ও ভক্তসমাগম হলো। সেখান থেকে এলেন রাজগীরে। সঙ্গে শ্রীশ্রীহরিবাবাও রয়েছেন। রাজগীর থেকে পাটনা হয়ে আবার হরিদ্বারের পথে যাত্রা করলেন।

গুরু পূর্ণিমা'র উৎসব হরিদ্বারে সম্পন্ন হবে। তাইতো ভক্তদের অনুরোধে মা এলেন হরিদ্বারে।

সকালবেলা আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিণীরা মা'কে একান্তে ঘরের মধ্যেই পূজা করলেন। বেলা ১১টায় মা নীচে নেমে এলে আশ্রমের ব্রহ্মচারী নির্বানানন্দ শ্রীশ্রীমা'কে ও দিদিমাকে বিধিমত পূজা করলেন। পূজা শেষে মা পুরুষ ও কুমারীদের ললাটে স্বহস্তে ভস্মের টীকা পড়িয়ে দিলেন।

মা আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে বলছেন, 'পরম পথের যাত্রীর লক্ষ্য পূরণের যাত্রায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করা। এক লক্ষ্যে'র জন্য এই মনের দ্বারাই একত্বে পৌঁছবার যাত্রী হওয়া। সেই লক্ষ্য কি? নিজের স্বরূপ জানাই হলো লক্ষ্য। আবরণ না সরালে স্বরূপ জানবে কি করে? গুরুর উপর নির্ভর করা। গুরু কৃপাতেই সব সম্ভব। অহং বোধ ত্যাগ করে কর্ম করে যাওয়া। সব কর্মই ভগবৎ কর্ম এই ভাব রেখে করা।'

'ভগবানের উপর নির্ভরতা কি ভাবে আসবে?

'লক্ষ্য এক হলেই গুরুর উপর নির্ভর এসে পড়ে। ঠিক সময়ে সেই অনুভূতি লাভ হবেই। 'তিনিই সব করাচ্ছেন,' নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে এই অনুভূতি আসবেই। করুণাসাগর তিনি। তোমাদের শূন্য ঘট পূর্ণ করবার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। সাধনার পথে চাই ধৈর্য ও সহ্য। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সব সহ্য করে তাঁরই নাম নিয়ে, তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকা। ফললাভ হইবেই।'

এমন সময় পতিতপাবন, জগতজীবন
ত্যাজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভবন
আইলেন ধরায়।

* * *

সুমিষ্ট কণ্ঠে গান করছেন ভক্তিমতী পুষ্প কাশীতে। জন্মাষ্টমী উৎসবে। কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমের গোপাল বিগ্রহের সামনে। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উপস্থিত রয়েছেন। মা গোপাল ভাবে বিভোর।

গোপালের জন্য চন্দন কাঠের বিরাট সিংহাসন তৈরী করে আনা হয়েছে। আর আনা হয়েছে ভেলভেটের বিছানা, গদি। গোপালকে সেখানে বসানো হোল। অনির্বচনীয় সেই পরিবেশে পূজা শুরু করলেন অতুল ব্রহ্মচারী। রাত্রি আড়াইটার সময় পূজা শেষ হলো। ভাবানন্দময়ী মা ধীরে ধীরে উঠে কন্যাপীঠের ঠাকুরঘরে গেলেন। সেখানে কন্যাপীঠের মেয়ে কুমারী জয়া শ্রীশ্রীমা'কে পূজা করলেন। তখন সুধা-জ্যোৎস্নায় চারিদিক অলৌকিক ভাবে বিভাসিত হয়ে উঠলো। মায়ের মধুর ভাবের মূর্তি নয়নগোচর করে কন্যাপীঠের মেয়েরা ও ভক্তবৃন্দ অভিভূত হলেন। মা যেন তাঁর মধুর প্রেম-সুধার-ধারা প্রবাহিত করে দিলেন ভক্তদের তাপিত প্রাণে। অনির্বচনীয় শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোতি মায়ের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এইভাবে গোপাল বিগ্রহের পূজা ও জ্যান্ত মায়ের আরাধনার মধ্য দিয়েই রাত্রির অবসান হলো। ঊষাদেবী জগতের অন্ধকার দূর করে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলেন।

এই কাশীধামে ও উত্তরকাশীতে আনন্দময়ী মা'র কৃপালাভ করেন, কালিকানন্দ অবধূত। ইনিই 'অবধূত' নামে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থ রচনা করে বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে বিরাট আলোড়ন এনেছিলেন।

কাশীধামের লীলা সমাপণ করে মা আবার যাত্রা করলেন দিল্লীর পথে।

দিল্লীর কালকাজীতে আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দুই পুত্র রাজীব আর সঞ্জয়কে নিয়ে এলেন মায়ের কাছে। একান্তে কথা হোল প্রায় আধঘণ্টা ধরে। মা ইন্দিরার দুই পুত্র ও ইন্দিরা গান্ধীর হাতে পরিয়ে দিলেন রাখী। আর নেহেরুজীর জন্যে একটি রাখী দিয়ে দিলেন। সকলেই মুখে প্রসন্ন হাসি নিয়ে মায়ের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। ১৯শে আগষ্ট ১৯৬৩ সন।

দিল্লীর আশ্রম মায়ের উপস্থিতিতে আবার নামগানে মেতে উঠলো। মধুর কণ্ঠে মা গান ধরলেন,

সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন।

* * *

গোপাল বল, গোবিন্দ বল
রাধা রমণ হরি, গোবিন্দ বল ॥

* * *

মাতৃকণ্ঠের মধুর ভাবের সঙ্গীত শুনে ভক্তদের প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠলো।

সৎসঙ্গে মা বললেন, 'সেই একেরই ধ্যানে থাকতে চেষ্টা করা। মূলে না গেলে ফল পাওয়া যায় না। আর ফল একদিন পাবেই।……এক চিন্তায়, এক লক্ষ্যে যত সময় দিতে পারো, দেবে। দিনগুলি বৃথা কাটাইও না। যখন যা করা মন প্রাণ দিয়ে করা।'

'এ শরীরটা সর্বদাই বলে,—ক্ষুদ্র নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ীকে ভালবেসে আনন্দ নেই। যে ভালবাসা অসীম, শাশ্বত সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত,যা মানুষকে দেবদেবী বা ভগবানের প্রতি ভক্তিমান ও অনুরক্ত করে তোলে, সেই ভালবাসাই চিরস্থায়ী হয়। সংসারের দাবানলে শান্তি কোথায়? ভোগাসক্ত মন বিভ্রান্ত হয়, কারণ ভোগাসক্তের প্রকৃতি সহজ নয়, বুদ্ধিও সরল নয। পরিণাম বিমূঢ়বুদ্ধি সর্বজ্ঞান হনন। সর্বজ্ঞান অর্থে ভালমন্দ জ্ঞান। অর্থাৎ মন্দে ভাল বোধ, আর ভালোতে মন্দ বোধ। তাইতো এ শরীরটা বলে—'মনকে আসক্তিশূন্য করে ভগবানের দিকে অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত করে দাও। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে ফেলা। অযাচিতভাবে শুধু সেই চিরন্তন প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের প্রীতি ও আনন্দ সাধনেই নিরত হওয়া। যখন তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে সেই অসীম পরম প্রেমাস্পদের মধ্যে হারিয়ে ফেলবে, তখনই তুমি অখণ্ড আনন্দের আস্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। ব্রজগোপিনীদের মত কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে যাওয়া। তবেই ত ঈশ্বরের ধারণা জন্মাবে। তাঁকে জানবে। দেখবে। তাঁর অপার্থিব দিব্য জ্যোতি তোমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।'

'আবার দেখ মনটা এই,—সর্ব বিষয়ে জ্ঞানবান হয়েও কর্মফলের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, জীব নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে। তাহলে জ্ঞানের তাৎপর্য কি রইল? কারণ জ্ঞানীরাও ত আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করে। তাইতো বলা হয়, সবকিছুই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করছে। তাঁর কৃপা অর্থ গুরু কৃপা।—'কর্মে শুধু তাঁরই সেবা হচ্ছে,' এই বুদ্ধিতে স্থিতিলাভ করা। কর্মের আরম্ভে মধ্যে ও শেষে তাঁর স্মৃতি চোখের সামনে রাখা, তাহলে সকল কর্ম তাঁকেই অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।'

'সকলই কেবল একই শক্তিমায়ের খেলা'—এই অনুভূতি লাভ গুরুশক্তিরই

ক্রিয়া। আর এই অনুভূতি লাভ না হলে জ্ঞানী অজ্ঞানীর কোন তারতম্য থাকছে না। গুরুকৃপাতেই দৃষ্টিভ্রম, বুদ্ধিভ্রম বিদূরিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে। তখন জ্ঞানী মানুষ অধ্যাত্মপ্রকৃতির অনুসরণ করে। তাইতো গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে গুরুদত্ত বীজ জপ করা, ইষ্ট ধ্যান করা। ইষ্ট নিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশের দিকে যাওয়া।'

আনন্দময়ী মা'র মুখনিঃসৃত এই অমৃতরসধারা পান করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন অমিয় সৌভাগ্যবান দিল্লীর ভক্ত মানুষেরা।

১৭

'—নিষ্কামভাবে কাজ করলে ভগবান সাহায্য করেন।' বলছেন শ্রীশ্রীমা। কলকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে। সৎসঙ্গে। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে মা কলকাতায় এসেছেন। ভক্তসনে লীলা করছেন। আবার একজন ভক্তকে লক্ষ্য করে বলছেন,—'বাবা, আগে নিজের চিন্তা কর। নিজেকে চিন্তে চেষ্টা করো। এ শরীরটা সব সময়ই বলে, তাঁর দিকে বেশী সময় মন দিলে ভগবৎবুদ্ধি হওয়ার আশা থাকে। চিত্ত দর্পণ নির্মল হলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। স্বরূপ প্রকাশের দিক। সংসারে থেকে নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হওয়া। মুখে নাম হাতে কাম।'

'যেখানে থাকা হয় সেখান থেকেই ভগবানকে স্মরণ করা। সকলেই ভগবানের, এইটি মনে রাখা। ভগবৎ প্রেম জাগ্রত হওয়ার জন্য সর্বদা জপ ধ্যান সৎকথায় মনকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করা। ভগবৎ প্রেম জাগৃতীর জন্য মানুষেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া। আবার দেখ, এই যে আকাঙ্ক্ষা হওয়া, এও ভগবৎ কৃপা। শুভ সৎ আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির দিক।'

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা যায়:

সংসারে থেকে কর্মত্যাগ হয় না। কর্ম ত্যাগ করবার প্রয়োজনও নেই। একেবারে কর্ম না করলে শরীর যাত্রাও নির্বাহ হয় না। অহংভাব পরিত্যাগ করে কামনাশূন্য হয়ে শাস্ত্রসম্মত কর্ম করলে প্রকৃতি সত্ত্বগুণান্বিত হয়ে পুরুষের বশীভূত হয়। প্রকৃতি শান্ত হলেই সৃষ্টির বিলোম। শান্ত পুরুষের দৃষ্টিতে

সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁরা ব্রহ্মই দেখেন।

প্রকৃতিগত পুরুষ কর্ম না করে কর্মশূন্যতারূপ জ্ঞানলাভ করতে পারে না। এবং কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের কর্মযোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গীতা বলছে, একটি জ্ঞান, অপরটি নিষ্কাম কর্মের পথ। যাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী, তাঁরাই জ্ঞানপথের অধিকারী। এতে কঠোর যোগসাধনার প্রয়োজন। অতি অল্প লোকেই এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। সেইজন্য সাধারণ গৃহীদের নিষ্কাম কর্মের পথে গমনই শ্রেয়। নিষ্কাম কর্মে মন পবিত্র হয়। মনের পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। যাঁরা নিষ্কাম কর্মী তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত সে যে কার্য্যে ব্রতী তা তার নিজের কাজ নয়। শ্রীভগবানের কাজ। সে শুধু ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে কর্ম সম্পাদন করছে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনাসক্তভাবে কর্তব্য পালনের কথা বললেন। 'জয়-পরাজয়, হিংসা বা হত্যার কথা ভুলে যুদ্ধ করবে, যেহেতু ক্ষাত্রধর্ম যুদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তারা ঘোরতর পাপী। নিজ ধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন,—'হে কৃষ্ণ! তোমার কথা কিছু বুঝেও বুঝতে পারছি না।' প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অগ্নি যেমন ধূম্রাচ্ছন্ন থাকে মানুষের জ্ঞানও সেইরূপ রাগ দ্বেষ হিংসারূপ ধূম্রজালে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং তুমি হিংসা লোভ মোহকে দূরীভূত করে আগে নিজেকে চিনে নাও। নিজের স্বরূপ জানো, তাহলেই সবকিছু বুঝতে পারবে।'

মা যেন সেই গীতার কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। কথা শেষে মা মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন ঃ

গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ
জয় গোবিন্দ বল মন—

মায়ের কণ্ঠনিসৃত মধুর গোবিন্দ নাম ভক্তহৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয় এক মাধুরিমা। দুঃখ বেদনা ও ক্ষুদ্রতার কোন ভার আর নাই··· নাই নাই। কোথাও কিছু গ্লানি আর পড়ে নেই। শুধু আছে আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ। ওগো মহানন্দ! আনন্দ···অপার!

* * *

আঠারোটি থালায় আঠারো রকমের ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে। ১৮টি তেপায়ার উপরে থালাগুলি পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হোল। গীতা পূজা করলেন নির্বানানন্দ। মায়ের উপস্থিতিতে অনির্বচনীয় ভগবৎভাবের এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গীতা পূজা সম্পন্ন হোল।

সৎসঙ্গ, কীর্তন ভজন মহা-মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছেন ভক্তবৃন্দ। মা'কে ঘিরে ধর্মকথা, মাতৃসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক আনন্দের অপূর্ব অনির্বচনীয় এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আগরপাড়া আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে। প্রতি-দিন সন্ধ্যেবেলা সৎসঙ্গে বলছেন ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, অধ্যাপক দীনেশ শাস্ত্রী আরও নানা পণ্ডিত ও ভক্তজনেরা। সকলেই গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে গীতা তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করছেন, আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে।

আবার একদিন বিখ্যাত গায়ক শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমা'কে মাতৃ-সঙ্গীত শোনালেন। পান্নালালের মধুর কণ্ঠনিসৃত অপূর্ব ভাবপূর্ণ মাতৃসঙ্গীত শুনে আনন্দময়ী মা ভাবানন্দে বিভোর হলেন। আরও কয়েকজন সুগায়িকা মা'কে গান শোনালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মায়েরই ভক্ত ছবি ব্যানার্জি ও শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রিতা শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। পবিত্র ও মধুর সে সঙ্গীতাঞ্জলী ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রাণে অনির্ব্বচনীয় এক ভাবের শিহরণ জাগিয়ে তুললো।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩ সাল।

আগরপাড়া আনন্দময়ী আশ্রমে নাম-যজ্ঞ শুরু হোল।

ভোর ৬টা থেকেই কৃষ্ণ কীর্তনে মেতে উঠলেন ভক্তবৃন্দ। গান ধরলেন,—

'আবার বল হরি নাম আবার বল,
মধুর হরে কৃষ্ণ নাম আবার বল।'

* * *

আমার গৌর সুন্দর নেচে যায়!
তোরা দেখবি যদি আয় নাগরি॥
নেচে যায় প্রাণ গৌর হরি,
দেখবি যদি আয় নাগরি।
গৃহ কাজ তো সদাই আছে,
গৌর নটন দেখবি আয়।
গৃহ কাজে পড়ুক বাজ,
দেখবি গোরা রসরাজ।

এইভাবে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কীর্তন চললো। দশটার পর ভক্তিময়ী সুগায়িকা ছবি ব্যানার্জি অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে কীর্তন শুরু করলেন। মা'ও মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে কীর্তন চললো। অনির্বচনীয় সাত্ত্বিকভাবের প্রবাহ আশ্রম বাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চললো। ধীরে ধীরে উষার আলো উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো। কীর্তন শেষ হোল। এবারে ভক্তবৃন্দ নগরকীর্তনে বের হলেন। কৃষ্ণ কীর্তনে মুখরিত করে তুললো আগরপাড়ার ভোরের আকাশ। নগর পরিক্রমা সমাপ্ত হলে, আনন্দময়ীমা মধুর কণ্ঠে গান করলেন,

—'ধর লও ধর লও লও হে কিশোরী রাই।'

মাতৃকণ্ঠের মধুর নামগানের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাম যজ্ঞেরও পরিসমাপ্তি হলো। মা ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ, ভক্তি ও সাধনার দ্বারা যদি উন্নত হতে চাও, তবে অখণ্ডভাবে কীর্তন করা চাই। নাম! নামেই সব কিছু হয়।' সুরেলা কণ্ঠে মা আবার বললেন,

হরিনামের তরী বাঁধ ভাই,
দেখ গগনে আর বেলা নাই।

শ্রীশ্রীমা কয়েকদিনের জন্য পুরীধামে এসেছেন। পুরী আশ্রমে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মা জগন্নাথদেবের গল্প বলছেন। ইতিমধ্যে একজন ভক্ত এসে মা'কে দু'খানি ধুতি দিয়ে প্রণাম করলেন। মা ধুতি দেখেই হাসতে হাসতে বলে উঠলেন,—'দেখো, দেখো জগন্নাথ দর্শনের নামেই এ শরীর দুটো কাপড় পেয়ে গেল। সৎ ইচ্ছার কি ফল।' পরমুহূর্তেই কাপড় দু'খানি মাথার উপর রেখে বললেন, 'এ কাপড় মাথায় রাখবো না কোথায় রাখবো?' মায়ের এইরূপ সরল শিশুর মত ভাব দেখে সকলেই আনন্দ লাভ করলেন।

এই আনন্দলীলার মাঝেই মন্দিরের পাণ্ডা মা'কে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য এলেন। মা'ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শনের জন্য চললেন।

মন্দিরে খুবই ভীড়। ঐ ভীড়ের মধ্যেই মা জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে ভাবানন্দে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভক্তদের বললেন, 'দর্শন ত হয়ে গেছে, এখন চল। যদি আবার ভিতরে গিয়ে দর্শন হবার থাকে তবে হবে।' আশ্রমে এসে বললেন,—'এ শরীরকে জগন্নাথ দেব খুব কাছে এসে দর্শন দিলেন।'

ভক্তরা পুরীর বিভিন্ন স্থানে রয়েছেন। মা পুরীতে এসেছেন জেনেই তাঁরা এসেছেন। কলকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দ এসে মিলিত হয়েছেন। প্রতিদিন বৈকাল ৬টায় মা'র দর্শনের সময়। ঐ সময় মা নীচে সমুদ্রের ধারে, কিংবা প্রশস্ত চাতালে পদচরণা করেন। মা'কে কেন্দ্র করে সৎসঙ্গ, নামগান-কীর্তন চলছে দিনের পর দিন। আনন্দ মহোৎসবে মেতে রয়েছেন সকলে। একদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘের একজন ব্রহ্মচারী এসে মা'কে মধুর কণ্ঠের কীর্তন শোনালেন।

আবার একদিন হঠাৎ মাতৃদর্শনে এলেন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাওয়ৎ। তিনি মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে প্রার্থনা জানালেন তাঁর সঙ্গে জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করবার। মা সম্মতি জানালে, শ্রীযুক্ত রাওয়ৎ তাঁর গাড়ীতে করে মা'কে নিয়ে গেলেন। আজ আবার একাদশী মন্দিরে ভীড় বেশী। তবুও শ্রীযুক্ত রাওয়তের চেষ্টায় শ্রীশ্রীমা, দিদিমা ও কয়েকজন ভক্ত মহিলা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে খুব ভালভাবেই জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন। তারপর মা মন্দির দর্শন করে আশ্রমে ফিরে এলে শুরু হোল নামগান কীর্তন।

আবার কবে বলবে বলো দিন থাকিতে হরি বলো
পারের কড়ি লাগবে নারে বলো হরে কৃষ্ণ হরে হরে,
নিতাই ডাকেন দ্বারে দ্বারে বলো হরে কৃষ্ণ হরে হরে
নাম এনেছি তোদের তরে বলো হরে কৃষ্ণ হরে হরে।

* * *

সৎসঙ্গে মা বলছেন,—'সংসারে তাপ ভোগ করতে যেরূপ কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নেওয়াতেও সেইরূপ কষ্টবোধ মনে হয়ে থাকে। কিন্তু কষ্টবোধ হলেও, এই কষ্ট দিয়েই ত্রিতাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কাজেই চাই চেষ্টা, চাই অভ্যাস, চাই কর্ম। পশুদের এইভাবে কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে চির-সুন্দর চির আনন্দস্বরূপ ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোনও গরজ নেই। ইহা শুধু মানুষের মধ্যেই আছে।' আবার বলছেন,—'যে বন্ধনে আছে সে জীব, আর যার গতি তা জগৎ। অভাববোধ এই জগতেরই। তাপিত হাহাকার

আকুলি বিকুলি ইহা জীব জগতেই। জীব-জগতের অভাবের দিকগুলিই ত্রিতাপের জ্বালা। যতক্ষণ বন্ধনের জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে ততক্ষণ বন্ধন আছে। এই বুদ্ধি চলে গেলে কর্মবন্ধনও দূর হয়। সবই তো ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে। তা অনুভব করতে পারলেই মুক্তি।

ভগবানকে দুর্গাই বল রামই বল, সত্তা বল, আত্মা বল, সব একই। কেউ ভগবৎ বিগ্রহ মানে, কেউ মানে না। কারো বিশ্বাস সাকারে, কারো নিরাকারে। তাইতো বলা হয় যত মত তত পথ। যত মুনি তত মত। অনন্ত রাস্তা। তবে সাধন ভজন করা চাই। তোমরা অমৃতের সন্তান হয়ে নিজের স্বরূপ ভুলে বসে আছো যে! সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে সংযম অভ্যাস হয়ে যায়। নিদ্রা, বসা, বলা, খাওয়া, এ সবেরও সংযম অভ্যাস করা দরকার। এজন্যই এ শরীরটা সংযম ব্রত পালনের কথা বলে। সবকিছুই মন শুদ্ধ হওয়ার জন্য করা। মন শুদ্ধ হওয়া পরমার্থ গ্রহণের দিক। এইজন্যই পৃথক পৃথক ক্রিয়া হয়ে থাকে। সুখ দুঃখের অতীতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। সর্বরূপ ভগবানেরই। তাঁর চরণে নিজেকে অর্পণ করে দেওয়া। সাকার নিরাকার সবই ত তিনি। যেরূপ তোমার ভাল লাগে সেই রূপেই তুমি তাঁকে পাও। সর্বনাম সর্বরূপ ভগবানের। ওই এক। গ্রন্থিভেদ না হলে প্রকাশ হয় না। জগতের সমস্ত জিনিসই এক মূল থেকে উৎপন্ন। গ্রন্থিভেদ হলেই এসব বুঝতে পারা যায়। যার সমস্ত গ্রন্থিভেদ হয়েছে কেবল সেই বুঝতে পারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ।

জগতে কোনোটাই স্থির নয়। একমাত্র স্থির বস্তু ভগবান। তাঁকে পেতে হলে চিত্ত স্থির হওয়া দরকার। লক্ষ্য স্থির না হলে চিত্ত স্থির হয় না। আর আমিত্ব বোধ লুপ্ত না হলে ধ্যান হয় না। 'প্রণব' উচ্চারণও হয় না। 'আমি প্রণব উচ্চারণ করছি'—এই বোধ নিয়ে প্রণব উচ্চারণ করা যায় না। প্রণবের উচ্চারণ অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়। করতে হয় না। সেই আদি শব্দ ব্রহ্ম যখন চিত্তে জেগে ওঠেন তখন তিনি নিজে থেকে উচ্চারিত হন। তিনি যে স্বয়ং প্রকাশ।'

অহং বোধই সর্বনাশের মূল। সবকিছু সুকৃতি অহঙ্কারে নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মলাভ হয় না। তাইতো আনন্দময়ী মা বলছেন, '—সাধন ভজনের লক্ষ্যই হচ্ছে অহঙ্কারকে চুরমার করে দেওয়া। 'আমি', 'আমার' এই বোধকে উৎপাটিত করা। উন্মূলিত করা। 'আমার কুণ্ডলিনী' এই বোধ যতদিন থাকবে ততদিন কুলকুণ্ডলিনী ত জাগবে না। ধ্যানও হবে না।

মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে আগরপাড়ার আকাশ বাতাস। অখণ্ড নাম কীর্তন চলেছে। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা, সৎসঙ্গ সবকিছুই যে আনন্দময়ী মা'কে কেন্দ্র করে। ২০শে মে থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত চলেছে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান। মা এলেন ২০শে মে সকালে।

একদিকে চলছে অখণ্ড নামকীর্তন অপর দিকে চলেছে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ দেশের কল্যাণে। বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ আহুতি দিলেন এক লক্ষবার। আবার শতাবৃত্তি সম্পুট চণ্ডীপাঠও সম্পন্ন হলো।

মা'র কিন্তু বিশ্রাম নেই। মা'র ঘরে বাইরে সর্বত্রই সর্বক্ষণই ভক্তরা ঘিরে আছে। মা'র সন্তান যে সকলেই। তখন অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। প্যাণ্ডেলে ভক্ত জনতার ভিড়। গঙ্গার এপার আর ওপার হতে দূরের আর বহুদূরের জনপদ থেকে ছুটে এসেছে নরনারী বৃদ্ধ বৃদ্ধা বালক কিশোর যুবক যুবতী মাতৃদর্শন মানসে। মঞ্চে চলছে বৃন্দাবন দাস বণিক সম্প্রদায়ের পদাবলী কীর্তন। 'মা আসবেন!' 'মা আসবেন!' প্রতি-মুহূর্তেই আশা করছে ভক্ত জনতা। কিন্তু মা এলেন না। পরিবর্তে আগড়-পাড়ার আকাশে নেমে এলো একখণ্ড ভয়ংকর কালো মেঘ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুরু হোল প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। ঝড় একটু শান্ত হলে দূর জনপদের মানুষেরা একে একে চলে গেলেন। রয়ে গেলেন কিছু কিছু ভক্তের দল। তখনো পূর্ণোদ্যমে চলছে পদাবলী কীর্তন।·· ধৈরয ধর শ্যামপিয়ারী······। যারা ধৈর্য্য ধরে তখনও ছিল মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়, মাতৃহৃদয় তাদের জন্য বোধ হয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তখনও বৃষ্টি পড়ছিলো টিপ্ টিপ্ করে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো তীব্র বেগে। কিন্তু মা সবকিছুকে তুচ্ছ করে রাত্রি ৯টায় ছুটে এলেন প্যাণ্ডেলে। মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে 'মা' নাম কীর্তন করে মা'কে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর মঞ্চে মা'কে ঘিরে শুরু হোল কীর্তন। এ যেন গোপিনী পরিবেষ্টিতা হয়ে 'নাম' খেলারত পরমেশ্বর—পুরুষোত্তম! তাই প্রকৃতিরাজ্যেও তার দোল লেগেছে—আর আন্দোলিত হচ্ছে মানুষের অন্তর। এ যেন ভাগীরথীর কূলে কীর্তন মাতোয়ারা—নদীয়া নগরীতে নয় আগড়পাড়ায় অবতীর্ণা হয়েছেন রাধাভাবদ্যুতি সুবলা, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নন, স্বয়ং রাধারাণী জীবদেহে আনন্দময়ী মা'র স্বরূপে, মা আনন্দময়ী রূপে। মা দু হাত তুলে নেচে নেচে ভক্তসনে নাম করতে লাগলেন। নাট-মন্দিরে এসে যখন হরির লুট দিলেন তখন ভোর পাঁচটা। এইভাবে আনন্দময়ী মা অশীতি বর্ষ বয়সেও সারারাত্রি ধরে ভক্তসনে লীলা করলেন,

ভক্তদের সঙ্গ দিলেন।

মায়ের জন্মোৎসবকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন এসেছেন ভক্তবৃন্দ তেমনি আবার এসেছেন সাধু সন্ত সাধক যোগী মহাপুরুষ। এসেছেন হরিদ্বার জগৎগুরু আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দ গিরি, কংখল থেকে এসেছেন গিরিধারী নারায়ণ পুরীজী, এসেছেন পূর্ব্বাঞ্চল থেকে সন্ন্যাসী শিবআত্মনন্দজী মহারাজ।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সেই আনন্দতম মুহূর্ত্তটি। আনন্দময়ী মা'র আবির্ভাব তিথি। পূজার দিনটি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল এই দিনটিতে। সারাটি দিন উৎসব চললো নাটমন্দিরে। ভক্ত কণ্ঠের ভজন হরিনাম গান। স্বামী কৃষ্ণানন্দ, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর কণ্ঠের ভক্তিগীতি, 'মা'—'মা' কীর্তন আর সুধাস্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে উৎসব জেগে উঠলো। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো আনন্দময়ী আশ্রম। ক্রমে ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো আগড়-পাড়ার আনন্দময়ী আশ্রমে, প্যাণ্ডেলে, মঞ্চে। নাটমন্দিরের উৎসব এবার বৃহৎ প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। রাত্রিও হয়ে এলো গভীর থেকে গভীরতর। প্যাণ্ডেলে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। মঞ্চে পুষ্পসজ্জিত বেদিকায় শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর অর্ধশায়িত হলেন। সমস্ত উপচার দিয়ে জীবন্ত কালিকাদেবী রূপে পূজা করলেন পুরোহিত ব্রহ্মচারী নির্ব্বানানন্দ। তন্ত্রধার হলেন শৈলেশ ব্রহ্মচারী। মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু সন্ন্যাসী যোগী মহাপুরুষরা। অপূর্ব ভাবগম্ভীর অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ নারীপুরুষ সকলেই নীরবতার মধ্য দিয়ে সেই অভিনব পূজাকে শুধু দেখা নয় অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন বলেই মনে হোল। ধীরে ধীরে মা সমাধিস্থ হলেন। পূজা শেষ হতে হতে ভোরের আলো ফুটে উঠলো আকাশে। মায়ের সমাধি ভঙ্গ হোল অনেক পরে। পূর্ণ নীরবতার মধ্য দিয়ে ভাষা-বিহীন মায়ের বাণী যেন ভক্ত প্রাণে প্রাণে এনে দিলো অপার এক প্রশান্তি। অন্তর অনুভূতিকে জাগ্রত করলো আন্তর বাণীতে। এক অপরূপ সকরুণ মমতায় ভক্তদের অন্তর ভরে উঠলো। জীবনের সকল অশান্তি ব্যর্থতা অপূর্ণতা মায়ের উপস্থিতিতে যেন পূর্ণতা লাভ করলো। হৃদয় মনকে প্লাবিত করে তুললো। ক্ষণিকের জন্য মনের সব দ্বন্দ্ব আর চাঞ্চল্য যেন শান্ত হয়ে গেল। আর কোন সংশয় নেই মনে।

*   *   *

আবার রাত্রি প্রভাত ! নব-উষা।

মা শুয়ে শুয়ে জিগগেস করছেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে, 'দিদি—কয়দিন হলো এখানে আসা হয়েছে।'

—'২০শে মে। দশদিন হয়ে গেল।' মা মুখে আর কিছু বললেন না। ধ্যানস্থ হলেন।

*   *   *

ভক্তপ্রবর শ্রীসুরেন দত্তের একান্ত প্রার্থনায় মা এবারে যাত্রা করলেন উত্তর পুর্ব ভারতের দিকে। ইংরাজী ১৯৭৫ সালের জুন মাস।

উত্তর বঙ্গকে পিছনে ফেলে মা এলেন আসাম প্রদেশে। ডিব্রুগড়ে। আসাম প্রদেশের বাঙ্গালীরা বহুকাল পরে আপন দেশে আনন্দময়ী মা'কে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। মাতৃদর্শনের জন্য সকল শ্রেণীর সকল স্তরের ভক্ত মানুষেরা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা মায়ের শ্রীচরণ কমলে প্রণাম করবে আর কথামৃত পান করবে। মা বললেন,—'ভগবান ভক্তের জন্য সাকার হন। সাকার স্ব-আকার। স্ব-রূপ। যেমন জল আর বরফ। বরফে জল আছে। বরফ সাকার। যে পাত্রে থাকে সেই আকার ধারণ করে। ভগবান সর্বরূপে রয়েছেন। যে যে পথে যায়। অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি।

অনেক ঘুরে, অনেক ভোগের পর, মনুষ্য রূপ পায়। মানুষই ভগবানকে পেতে পারে। তার যেমন অজ্ঞান রয়েছে, তেমন জ্ঞানের জানালাও আছে। ডাক্তার—ডাক তাঁর। ইচ্ছা আসা যাওয়া করছে। ইচ্ছা একেতে এলে প্রকাশ হবেই। সেই ধারা সেই গতি আসা চাই। তুমি যখন ভগবানের যন্ত্র, তাঁতেই লাগাতে হবে নিজেকে। শুধু টাইম টেবিল দেখলেই হবে না। ষ্টেশনে যেতে হবে। টিকিট কাটতে হবে। ঋষিপন্থায় মন প্রাণ হওয়ার চেষ্টা করা।

পত্নী গৃহলক্ষ্মী, সেবা করবো—এই ভাব। সন্তান বাল গোপাল। এই ভাব। এই সব ভাব নিয়েই গৃহাস্থাশ্রমে চলা। ঠাকুর ঘর রাখা। সকাল সন্ধ্যা একটু সময় করে ভগবানের চিন্তা করা। ভগবান কোথায় নেই ? যেখানে আছ সেখান থেকেই আত্মচিন্তন। নিজেকে জানা, পাওয়ার চেষ্টা। তুমি যে ঋষি সন্তান ! তাইতো তাঁকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা। তাঁকে পাওয়া মানে নিজেকে জানা, নিজেকে পাওয়া। এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি।'

কয়েকদিন ডিব্রুগড় আসাম প্রদেশে ভক্তসনে লীলা করে অকস্মাৎ একদিন

ডিব্রুগড়ের আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন উত্তর পশ্চিম ভারতের দিকে। চলা চলা আর চলা মায়ের পথ চলার যেন শেষ নেই।

৫৮

—'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আত্মা একই। যেমন তোমাদের পুত্র আত্মারূপেই তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করছে। এ শরীর তো ক্ষণস্থায়ী। মাতৃজঠরের ভ্রূণ থেকে শিশু। শিশু হতে বালক। বালক হতে কিশোর। এইভাবে পর পর সর্বস্তরেই জীবদেহের ক্ষয় হচ্ছে। এ সংসার যে গতিময়। নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্যে শান্তি কোথায়? এ সংসারের তো এ-ই রূপ।

অসুস্থ শরীরে তোমাদের পুত্র যে কষ্ট পাচ্ছিল, সেও তো ঈশ্বরের দান। তিনি রোগ ভোগের দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। নিজের কাছেই নিয়ে নিয়েছেন। যেখানে সে ছিল এখনও সে সেখানেই আছে। ভগবানের সঙ্গেই আছে। তোমরা তো তাকে হারাও নাই। আত্মারূপে সে তোমাদের সঙ্গেই আছে। তবে শোক করা কেন? তাইতো এ শরীরটা সর্বদাই বলে, এ সংসারের দিকে তোমাদের যে ভালবাসা আছে তাকে ঘুরাইয়া তাঁর দিকে দাও। ভগবানকে ভালবাস। দেখবে সংসারমায়া ছুটিয়া যাইবে। ভগবানের উপর নির্ভর করা। তিনিই শান্তি দেবেন। তাঁর ইচ্ছাতেই যে সব হয়।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন পুত্রহারা শোকার্ত এক দম্পতিকে, কংখল আশ্রমে। মা আজকাল ঘুরে ফিরে (হরিদ্বার) কংখলে এসেই বেশীদিন অবস্থান করছেন। শোকার্ত দম্পতি মায়ের মুখনিসৃত অমৃতময় বাণী শুনে মনে শান্তি নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসব উপলক্ষে কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমবাড়ীতে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করলেন। আবার ঐ দিনই রাত্রিতে ট্রেনে দিল্লী হয়ে বৃন্দাবন ধামের পথে যাত্রা করলেন।

আনন্দময়ী মা'র স্নেহধন্যা ইন্দু—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখন ভারতের

প্রধানমন্ত্রী। তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই আনন্দময়ী মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, একান্তে কথা বলেন। মা দিল্লীতে কালকাজীর আশ্রমে উপস্থিত হলেই, ইন্দিরা গান্ধী মায়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আসেন। এবারেও সংবাদ পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী মায়ের কাছে কালকাজী আশ্রমে এলেন। একান্তে কিছুক্ষণ কথা হলো। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেন,—'আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে কথা বলে আমি প্রাণশক্তি পাই। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমি আমার কর্তব্য পালনে জোর পাই।'

আনন্দময়ী মা'ও ইন্দিরা গান্ধীকে স্নেহভরে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছেন। এই মালাটির প্রতি ইন্দিরার খুব বিশ্বাস। এটি পরিধান করলে তিনি মনে শক্তি পান। এক সময়ে এই মালাটি আনন্দময়ী মা কমলা নেহেরুকে দিয়েছিলেন। কমলা নেহেরু খুব অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য যখন বিদেশে যান। কমলা নেহেরু ছিলেন মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। আনন্দময়ী মা'কে অনুরোধ করেছিলেন একটি নূতন রুদ্রাক্ষের মালা দেবার জন্য। কারণ পূর্বের দেওয়া মালাটি ছিঁড়ে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীমা তখন ছেঁড়া মালাটি নিজের কাছে রেখে নূতন একটি মালা দিয়েছিলেন কমলা নেহেরুকে। সেই ছেঁড়া মালাটি এতদিন পড়ে ছিল ডেরাডুন আশ্রমের এক আলমারির মধ্যে। জহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধী যখন নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছিলেন, এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী প্রধান মন্ত্রী হয়ে তাঁকে মন্ত্রীসভায় যোগদানের জন্য যখন অনুরোধ করলেন, তখন তিনি প্রেরণা লাভের জন্য ছুটে এসেছিলেন আনন্দময়ী মা'র কাছে। ডেরাডুন আশ্রমে। মা তখন সেই ছেঁড়া মালাটিতে কয়েকটি নূতন রুদ্রাক্ষ গেঁথে মালাটি শোধন করে তাঁর স্নেহের ইন্দুর গলায় পড়িয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন,—'তোমার কর্মময় জীবন সফল হোক।' সত্যসত্যই আনন্দময়ী মা'র আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে ধীরে ধীরে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব রাজনীতির আঙ্গিনায় এক বিস্ময়কর রাজনীতি-বিদ মহিলারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনে এই রুদ্রাক্ষের মালাটি এক অমূল্য সম্পদ স্বরূপ। মালাটি তাঁর জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

* * *

সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর চলে যায়। আবার আসে নূতন বছর, নূতন দিন।

আনন্দময়ী মা এখন বৃদ্ধা অসুস্থ। বয়স ৮৬ বৎসর। কিন্তু চলার শেষ

নেই। আরাম-বিরামের সংকীর্ণ শয্যা ছেড়ে মুক্তদীপ্ত আকাশের নিচে তাঁর চলার পথ। দীর্ঘ জটিল উপলবন্ধুর সে পথ। এই সংসার নিকেতনেই দুঃখী তাপী মানুষের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। মানুষের সংসার জীবনের ঘোরতম দুর্দিনেও তাঁর উপস্থিতি, তাঁর স্পর্শ, তাঁর প্রেমমুখের প্রসন্নতা স্বর্গ রচনা করে এবং তাদের নিয়ে যায় অমৃতের নিত্যধামে। তার প্রাণ-ঢালা প্রেম ঢালা সরলতা, তাঁর অমোঘ-সন্তোষ যা রাজৈশ্বর্যকেও ম্লান করে দেয়। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সাধারণ মানুষের দেহ-মনে, সমস্ত অস্তিত্বে সঞ্চারিত করে পরমানন্দের আভাষ।

মা বলেন,—'যে যেখানেই উপস্থিত থাকুক না কেন, এ শরীরটা সব সময়ই তাঁহাদের কাছে। ভগবানের কাছেই হৃদয়ের সমগ্র প্রার্থনা যা আসে। তাঁহার কাছেই প্রাণের নিবেদন সর্বক্ষণ হওয়া। যিনি প্রার্থনা করান, তিনিই শোনেন।'

শ্রীশ্রীমা'র পার্ষদ ও বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে একে একে অনেকেই আজ ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, মহারাজা শ্রীদুর্গা সিং—ভক্তদের 'যোগীভাই', শ্রীশ্রীহরিবাবা, স্বামী নারায়ণানন্দ, স্বামী শাশ্বতানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। সকলেই মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন,—'যখন যা হইবার তাহাই হইয়া যাইতেছে। কোন কষ্ট বুঝি না। তাঁর ইচ্ছাতেই ত সব হয়। এ শরীরের ইচ্ছা অনিচ্ছা নিজস্ব বলিয়া তো কিছু নাই। নিজস্ব বলিয়া যদি কিছু বলিতে চাও, তবে জগৎময় সবই নিজস্ব। এ শরীরের কিছু করিবার, বলিবার প্রয়োজন নাই। আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের জন্য।'

দোলযাত্রা মা বৃন্দাবনেই উদ্‌যাপন করলেন। ১৯৮২ সাল ২৬শে মার্চ মা মটরযোগে বৃন্দাবনধাম থেকে দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। আবার ঐদিনই দিল্লী থেকে ট্রেনযোগে আগরতলা (ত্রিপুরা) অভিমুখে রওনা হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় চারদিনের কষ্টকর যাত্রার পর আনন্দময়ী মা আগরতলা পৌছালেন। সেখানে ভক্তদের প্রার্থনায় একটি শিবলিঙ্গ ও সরস্বতী মূর্তির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভক্ত মানুষ মাতৃদর্শনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

১লা এপ্রিল ১৯৮২ শ্রীশ্রীমা ট্রেনে আগরতলা থেকে কলকাতার পথে পা

বাড়ালেন! কলকাতায় আগরপাড়া আনন্দময়ী আশ্রমে মায়ের উপস্থিতিতে দিদিমা'র (শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরি) প্রস্তরময় মূর্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হলো। মা কলকাতার সন্নিকটে ভাগা গ্রামে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বিভূতি চক্রবর্তীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। শরীরের অসুস্থতা নিয়েই ভক্তদের একান্ত প্রার্থনায় মা একের পর এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার জন্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে চলেছেন। মা তো নিজের ইচ্ছা বলে কিছুই বলেন না। ভক্তরা অনুরোধ করলে বলেন,—'তোমাদের ইচ্ছা। এ শরীরটার সঙ্কল্প-বিকল্প বলিয়া কিছু নাই। এ শরীরের নিজস্ব বলিয়াও কিছু নাই। এ শরীরটা আগেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। পরেও তাহাই থাকিবে। আগে পরে কোথায়? আসা যাওয়াই বা কোথায়? আসা যাওয়া নাই। পথের সহায়ক যাহার যতটুকু দরকার এ শরীরটা দিয়া তাহা হইয়া যাইতেছে।'

শ্রীশ্রীমা কনখলে অবস্থান করছেন। শরীরের কোনরূপ উন্নতি হোল না। দিদিমা'র সন্ন্যাস উৎসবে উপস্থিত হতে পারলেন না। মে মাসের জন্মোৎসবের কোন অনুষ্ঠানেও উপস্থিতি সম্ভব হোল না। শ্রীশ্রীমা তাঁর কুঠিরের বারান্দায় অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা আরতির সময় ভক্তদের জন্য মায়ের দর্শনের সময় নির্দিষ্ট করা আছে। ২৬শে জুন শ্রীশ্রীমা কনখল থেকে ডেরাডুনে কিষণপুর আশ্রমে এলেন ভাগবত সপ্তাহ উপলক্ষে। ৪ঠা জুলাই খুব ভালভাবে ভাগবত সপ্তাহ শেষ হলো। ঐ দিনই মা কল্যাণবনে শ্রী ও শ্রীমতী খৈতানের আবাস সন্নিহিত পঞ্চবটিতে চলে এলেন। নির্জন ও মনোরম পরিবেশেও মায়ের স্বাস্থ্যের কোনরূপ পরিবর্তন হোল না। এই কিষণপুর আশ্রমেই একদিন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন শৃঙ্গেরী মঠাধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করাচার্যজী। তিনি মা'কে সুস্থ হয়ে উঠবার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রত্যুত্তরে মা বললেন,—'বাবা, এ শরীর কা কোই বীমার নহিঁ হ্যায়, এ অব্যক্ত কা তরপ্ খিঁচ রহা হ্যা। যো কুছ দেখ রহে হো উসিকী অনুকূল

ক্রিয়া।' বাবা এ শরীরের আদৌ কোন অসুখ নাই। যা কিছু দেখিতেছ সবই অব্যক্তের ক্রিয়া। অবশেষে শঙ্করাচার্যজী দুর্গাপূজাপলক্ষ্যে শৃঙ্গেরী মঠে আসবার জন্ত মাকে অনুরোধ করলে, মা বললেন, '—বাবা, অগর এ শরীর রহে তো ইস্ সাল কনখল মে রহনে কা বচন দিয়া।' বাবা, এ বৎসর যদি শরীর থাকে দুর্গাপূজায় কনখলে থাকবার জন্য এ শরীর স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার ও অনুরোধ করলে মা বললেন,—'এ্যা শরীর আত্মা রূপ সে হামেশা তুম্হারে সাথ রহে গা।' আত্মারূপে এ শরীর সব সময়ই তোমার সঙ্গে আছে।

৩রা জুলাই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথজী। তিনিও মা'কে শরীরের দিকে খেয়াল করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ১১ই জুলাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মায়ের অসুস্থতার সংবাদে ব্যাকুল চিত্তে মাতৃদর্শনে এলেন ডেরাডুনে। মা কিছুক্ষণের জন্য উঠে বসেন এবং সামান্য কথাবার্তা বলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিজে থেকে উঠে বসা ও দর্শন দেওয়ার পর্ব এখানেই সমাপ্ত হয়।

করুণাময়ী মা আনন্দময়ী ধীরে ধীরে ভক্তদের চাক্ষুস দর্শন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। গুরুপূর্ণিমার উৎসবে ব্রহ্মচারী ভাস্করানন্দজী মায়ের পূজায় অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রীমুখ হতে একটি বাণী প্রাপ্ত হন।— 'শ্রীগুরুদেবের কৃপাবর্ষণে পূর্ণ হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী হও।'

২০শে জুলাই আমেরিকা থেকে মা যোগশক্তি তাঁর দুইজন শিষ্য সহ আনন্দময়ী মা'কে দর্শন করতে আসেন। মায়ের অসুস্থতার সংবাদ তিনি স্বপ্নে জানতে পারেন।

২৪শে জুলাই মা'কে পঞ্চবটি থেকে কিষণপুর আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। একদিন একান্তে পানু ব্রহ্মচারীকে মা বললেন,—'এই শরীরের কি অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছ। এই শরীরকে এখন রাখা ঠিক হবে না।' ২৬শে জুলাই অখণ্ড রামায়ণ (তুলসীদাসী) পাঠ আরম্ভ হয়। ২৭শে জুলাই দুপুর পর্যন্ত রামায়ণ পাঠ চলতে থাকে। ঐ দিন দিদিমার মহাসমাধি দিবস। এই উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান মাতৃমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে জুলাই বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ উড়ুপা মা'কে দেখবার জন্য এলেন। ডিভাইন লাইফ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট (হৃষিকেষ) স্বামী চিদানন্দ মায়ের অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্রান্স থেকে ডাক্তার উড়ুপাকে পাঠিয়েছেন। তিনি মা'কে পরীক্ষা করে পথ্যের কথা বললেন! কারণ আনন্দময়ী মা কখনও ঔষধ গ্রহণ করেন না। অপরদিকে ভক্তপ্রবর শ্রী বি. কে. শাহ

বোম্বাইয়ের নানাবতি হস্‌পিটালের ডাক্তার এম· সি· শেঠিকে মায়ের চিকিৎসার জন্ম পাঠালেন। তিনি মায়ের শরীর পরীক্ষা করে ভক্তদের আশ্চর্যান্বিত করে বললেন, 'মায়ের শরীরে কোন রোগ নেই।' ২৬শে আগষ্ট আবার পরীক্ষা করে মাকে অনুরোধ করলেন, 'মা আপনি শরীরের প্রতি খেয়াল করুন।' প্রত্যুত্তরে মা বললেন, 'পরমানন্দকে দেখ।'

এই সময়ে ডেরাডুন কিষণপুর আশ্রমে চলছিল ভক্তবৃন্দ কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন জপ, অহোরাত্র তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ আর কীর্তন। শ্রীশ্রীমা আশ্রম-বাড়ীর দোতলার ঘরে শায়িত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। মায়েরর শরীর ছিল অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ খুব কমই ছিল। মা একসময় ভক্তদের বলেছিলেন, তাঁর শরীরে বিন্দুমাত্র রোগ নেই। তিনি শুধু নির্লিপ্ত দ্রষ্টারূপে ইহাকে দেখিতেছেন।

২৩শে আগষ্ট অপরাহ্নে হৃষিকেশের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী দুইজন সন্ন্যাসী এবং ডাঃ মোদলকা সহ শ্রীশ্রীমা'কে দর্শন করতে এলেন। স্বামীজী মা'কে আরতি করে বার বার বললেন,—'মা আমরা আপনার জন্ম কি করতে পারি।' মা শুধু তিনবার 'নারায়ণ' বললেন। তারপর বললেন,—'জো আন্দর সে আয়ে—'। ভেতর থেকে যা আসে। ২৫শে আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ মা বলে উঠলেন, নমঃ শিবায়, তারপর বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার বলে তিনবার উচ্চারণ করলেন।

২৬শে আগষ্ট সকালবেলা আনন্দময়ী মাকে ভালই দেখাচ্ছিল। রাত্রিতে আবার শ্বাসকষ্ট তীব্রভাবে দেখা গেল। দুপুরবেলা মায়ের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো। আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে ডাকা হোল। তাঁর নির্দেশে ২৭শে আগষ্ট দিনভর মায়ের শরীরে ম্যাসেজ করা হোল। হাত-পায়ের উষ্ণতা ফিরে এলো। শ্বাসপ্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হলো।

এই সময়ে সেবিকা কন্যারা মায়ের মুখ নিসৃত নারায়ণ—হরি, নারায়ণ—হরি অস্ফুট ধ্বনি শুনতে পান। বেলা ৩-৩০ মিনিটে মা হঠাৎ চোখ খুললেন। কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীমা আবার চোখ খুললেন, উপরের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হোল। ১৯৮২ সালের ২৭শে আগষ্ট, ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ডেরাডুন—কিশণপুর আশ্রমে মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হলেন। এই কিশনপুর আশ্রমেই আনন্দময়ী মা'র স্বামী শ্রীশ্রীভোলানাথ ও জননী ভক্তদের দিদিমা

শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরি দেহরক্ষা করেছিলেন। ২৮শে আগষ্ট মায়ের দেহকে হরিদ্বার-কনখল আশ্রমে নিয়ে আসা হোল। বিভিন্ন আখড়ার মহাত্মাদের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর বসা অবস্থায় রাখা হয় এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মানুষ এসে শ্রীশ্রীমা'কে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। বিভিন্ন আশ্রম ও আখড়ার সাধু-সন্ন্যাসীরাও পুষ্পমাল্য অর্পন করে শ্রীশ্রীমা'কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত জনতার ভীড় ঠেলে শোক-বিহ্বল ইন্দিরা গান্ধী মা আনন্দময়ীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লী থেকে ছুটে এলেন কনখলে : মায়ের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভরে রাখলেন পুষ্পস্তবক। তারপর মায়ের পা দুটি দু হাতে জড়িয়ে ধরে অসহায় শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। সজল চোখে বললেন,—'আমার জীবনে মা আনন্দময়ীর আশীর্বাদ ছিল প্রধান শক্তি ও ভরসা। আজ আমার মর্মবেদনা জানাবার ভাষা নেই।'

২৯শে আগষ্ট রবিবা'র শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র জীবদেহকে কনখল গঙ্গাতীরে সমাধিস্থ করা হোল।

ভক্তপ্রাণ গেয়ে উঠলো :

মা, তুই যখন চলে গেলি
শূন্য হইল পূর্ণ হৃদয়, পুণ্য ভবন খানি।
চাঁদের প্রতিভা-প্রদীপ নিভিল
মেঘে শত মেঘ গগণ ঘিরিল,
নক্ষত্র-কুসুম নয়ন মুদিল
তিমিরে তিমির ঢালি।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা সংসারী মানুষের মধ্যে অবস্থান করে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে লব্ধ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের বিভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান সংসার তাপক্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে, তাদের শান্তি ও ঈশ্বরানুরাগে প্রেরণা দান করে, অনন্ত-লোকের পথে যাত্রা করলেন।

গুরু প্রসঙ্গে বলে গেলেন,—'গুরু চলে গেলেও তুমি যদি দেহেতে তাঁকে না ও দেখ, সর্বদা সর্বক্ষণ, যতক্ষণ তোমার লক্ষ্য পূর্ণ না হবে ততক্ষণ তোমার যা প্রয়োজন তোমাকে তিনি সে রাস্তা ধরে দেবেন। দেবেন মানে কি? তিনি যাবেন কোথায়? যাওয়ার প্রশ্ন নেই, প্রকাশিত হবেন। তোমাদের গুরু যিনি, জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি, তোমাদের গুরু তিনি। তাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ।'